1

কণিকায়

প্রাউট

(নবম, দশম ও একাদশ খণ্ড)

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

কণিকায় প্রাউট

নবম, দশম ও একাদশ খণ্ড

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

সূচীপত্র

© ২০১৫ আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয় কার্যালয়)

কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

রেজিঃ অফিস: আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘচ আনন্দনগর, পোঃ–বাগলতাচ জেলা–পুরুলিয়া, পঃ বঃ

যোগাযোগ অফিস: ৫২৭, ভি. আই. পি. নগর

কলকাতা–৭০০ ১০০

প্রথম সংস্করণ: ১৯৮৮

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ: আনন্দ পূর্ণিমা, ২০১৬

প্রকাশক: আচার্য মন্ত্রেশ্বরানন্দ অবধূত (কেন্দ্রীয় প্রকাশন সচিব) আনন্দমার্গ প্রকাশন বিভাগ ৫২৭, ভি. আই. পি. নগর

কলকাতা–৭০০ ১০০

মুদ্রাকর: আচার্য অভিব্রতানন্দ অবধূত

আনন্দ প্রিন্টার্স

সূচীপত্র

৩/১সি, মোহনবাগান লেন

কলকাতা–৭০০ ০০৪

ISBN: 978-81-7252-337-4

মূল্য: ১৫০.০০ টাকা মাত্র

প্রকাশকের বিনা অনুমতিতে এই পুস্তকের কোন অংশ অর্থকরী কিংবা উপাধিগত কিংবা গবেষণা সংক্রান্ত কার্যে ব্যবহার করা অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং কেহ যেন তাহা না করেন।

–প্রকাশক

রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা

বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ যথার্থ ভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ও দ্রুত - লিখনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা প্রবর্তিত হল:

সূচীপত্র

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ	औ	अं	अः
a	á	i	ii	u	ú	r	rr	lr	lrr	e	ae	o	ao	aḿ	ah

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ka	kha	ga	gha	uṋa	ca	cha	ja	jha	iṋa

ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
t́a	t́ha	d́a	d́ha	ńa	ta	tha	da	dha	na

প	ফ	ৰ	ভ	ম
प	फ	ब	भ	म
Pa	pha	ba	bha	ma

য	র	ল	ব
य	र	ल	व
ya	ra	la	va

শ	ষ	স	হ	ক্ষ
श	ष	स	ह	क्ष
sha	śa	sa	ha	kśa

অঁ	জ্ঞ	ঋষি	ছায়া	জ্ঞান	সংস্কৃত	ততোঽহং
अँ	ज्ञ	ऋषि	छाया	ज्ञान	संस्कृत	ततोऽहं
an̯	jin̯a	rśi	cháyá	jin̯ána	saḿskrta	tato’haḿ

a á b c d d́ e g h i j k l m ḿ
n ń n̯ o p r s ś t t́ u ú v y

সমগ্র বিশ্বে বহুল প্রচারিত রোমকলিপির মাত্র ২৯ টি অক্ষরেই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। এতে

সূচীপত্র

যুক্তাক্ষরেরও ঝামেলা নেই। আরবী, ফারসী ও অন্যান্য কোন কোন ভাষার f, q, qh, z প্রভৃতি অক্ষরগুলোর প্রয়োজন আছে, সংস্কৃতের নেই।

শব্দের মধ্যে বা শেষে ' ড ' ও ঢ ' থাকলে যথাক্রমে ড় ওঢ় রূপে উচ্চারিত হয়, ' য় ' - এর মত তারাও কোন স্বতন্ত্র বর্ণ নয়।

অসংস্কৃত শব্দ লিখবার প্রয়োজনে সংযোজিত আরো দশটি বর্ণ:

ক়	খ়	জ়	ড়	ঢ়	ফ়	য়	ল়	ৎ	অঁ
क़	ख़	ज़	ड़	ढ़	फ़	य़	ल़	त्	अँ
qua	qhua	za	ŕ	ŕha	fa	ya	lra	t	an̯

।। সূচীপত্র।।

নবম খণ্ড

১। সমাজের তাৎপর্য্য　　২। ভাবজড়তা থেকে সাবধান

৩। নদী ও সভ্যতা　　৪। মানবতা নবচিন্তাধারার চউকাঠে

৫। মানব ইতিহাস ও সামূহিক মনস্তত্ত্ব

৬। জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন পুনর্জাগরণ

৭। প্রমা-(১)　　৮। প্রমা-(২)

৯। সর্বাত্মক বিমুক্তির নব্য-নীতিচেতসা

দশম খণ্ড

১। মানুষের সাহিত্য ও শিল্প–সাধনা

২। নৃত্য–বাদ্য–গীত তিনে সঙ্গীত

৩। নন্দন বিজ্ঞান ও সঙ্গীত

৪। সঙ্গীত ও মোহনবিজ্ঞান কি অচ্ছেদ্য?

৫। শিল্প ও বিজ্ঞান ৬। শিবোপদেশ

একাদশ খণ্ড

১। আনন্দমার্গ– এক বিপ্লব ২। ধর্ম কী১৪৪

৩। অহিংসা ও সত্য   ৪। বৃহতের আকর্ষণ ও সাধনা

৫। অভিপ্রকাশ ও প্রতীকীকরণ   ৬। সংগচ্ছধ্বম্

৭। অর্থ ও পরমার্থ

৮। সমাজ ব্যবস্থা ও মহামন্যতা–হীনম্মন্যতা রোগ

৯। চতুর্বর্গ ও ভক্তি

১০। আধ্যাত্মিক, মানসিক ও জাগতিক ভূমি

নবম খণ্ড

সমাজের তাৎপর্য্য

'সমাজ' শব্দটির ভাবগত অর্থ হচ্ছে যেখানে বহু মানুষ একসঙ্গে এগিয়ে চলছে। এদের সকলেরই বুদ্ধি ও শক্তি এক নয়। তাই একজনের অপূর্ণতা অন্যজনকে দিয়ে পূরণ করে নিতে হয়। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরণের যোগ্যতা ও ক্ষমতা রয়েছে। কারও শারীরিক ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু কোন বুদ্ধি নেই, কারও বুদ্ধি আছে কিন্তু কাজ করার ক্ষমতা নেই। কারও বা ক্ষমতা–বুদ্ধি কিছুই নেই, অথচ তারা ঊর্ধ্বতনের নির্দেশে ধীরস্থির ভাবে খুব সুন্দর কাজ করে যায়। এইভাবে নানান ধরণের নানান গুণসম্পন্ন মানুষ আমরা আমাদের চারপাশে দেখতে পাই। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলতে হয়, এ–পৃথিবীতে পুরোপুরি স্ব–নির্ভর কেউ নয়। প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকেই নিজের নিজের অপূর্ণতা অন্যের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে পূরণ করে নেয়। যখনই কোন

বিরাট জনগোষ্ঠী এইভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিজেদের অপূর্ণতা পূরণ করার চেষ্টা করে তখনই তাকে আমরা 'সমাজ' বলে থাকি।

'সমাজটা' কেমন? এ যেন একদল পথচারী যারা তীর্থযাত্রায় চলেছে। সেই দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা কর। মনে করো তীর্থযাত্রীদের একজনের কলেরা হয়েছে। বাকীরা সৰাই কি তাকে পিছে ফেলে এগিয়ে যাৰে? –না, এটা তাদের পক্ষে ধারণারও অতীত। বরং তারা দু-একদিনের জন্যে তাদের যাত্রা স্থগিত রেখে তাকে সুস্থ করে তুলৰে। যদি সে দুর্বলতার জন্যে চলতে অক্ষম হয় তবে তারা তাকে কাঁধে বয়ে নিয়েই চলতে শুরু করবে। যদি কারোর পথের কড়ি ফুরিয়ে যায় তবে অন্যেরা নিজেদের অংশ দিয়ে তাকে সাহায্য করৰে। সৰাই মিলে সৰ কিছু ভাগ করে সমবেত কণ্ঠে যাত্রাপথের গান গাইতে গাইতে একসঙ্গে এগিয়ে চলৰে। এইভাবে একসঙ্গে চলার আগ্রহে তারা তাদের জীবনের ছোটখাট বিভেদকে ভুলে যায়; যে মতপার্থক্যগুলি হয়তো তাদের পরিবারগুলোকে তিন পুরুষ ধরে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে রেখেছিল সেগুলো ভুলে যায়। অথচ এই ধরণের মামলা-মোকদ্দমায় বাদী-বিবাদী এত দূর জেদী হয়ে ওঠে যে

জমিটার জন্যে তাদের মধ্যে এত মামলা–মোকদ্দমা তার যে দাম তার চেয়ে দশ বা বিশগুণ বেশী টাকাও খরচ করতে পেছপা হয় না। এইভাবে একসঙ্গে চলতে গিয়ে মানুষের মধ্যে সহযোগিতামূলক মানসিকতা জাগে তা মানুষের মনকে ব্যাপ্তির পথে নিয়ে যায়, তাদের মনের নীচতা–হীনতার ৰাধাগুলি ভেঙ্গে চূর্ণ করে দেয়। আমি আবার বলছি, সমাজ এমনই এক গোষ্ঠীৰদ্ধ মানুষের তীর্থযাত্রা যেখানে একসঙ্গে চলতে গিয়ে সকলেই বিস্ময়কর ব্যষ্টিত্বের অধিকারী হয়, যা তাদের বৈয়ষ্ঠিক ও সামূহিক জীবনের সমস্ত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।

'সমাজ' শব্দটার প্রকৃত অর্থ ৰলতে গেলে এটা স্পষ্ট হবে যে এখনও মানুষ যথার্থ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। যদি ভারত কেবল ভারতীয়দের জন্যে একটা সমাজ গড়ে তোলে, পাকিস্তান পাকিস্তানীদের জন্যে ও ইংল্যাণ্ড কেবল ইংরেজদের জন্যে তাহলে হয়তো তিনটি পৃথক সমাজ গড়ে উঠতে পারে কিন্তু তাকে আমরা মানব সমাজ বলতে পারি না। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত একটা সমাজ স্বাভাবিক ভাবে চাইবে অপরের প্রাণরসকে শোষণ করে নিজেকে পুষ্ট করতে। একটু নজর দিলেই দেখবে, এই পৃথিবীর কোন কোন অংশে

যে তথাকথিত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলছে তা একান্তভাবেই কিছু মতবাদ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে, ও কেবল তা নগণ্য সংখ্যক লোকের জন্যেই। এই ধরণের সামাজিক চেতনা সৰ ধরণের গোষ্ঠীর মধ্যেই সুপ্ত হয়ে রয়েছে, তা সে ভারতীয়ই হোক বা পাকিস্তানীই হোক অথবা ইংরেজই হোক। তারা তাদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর চিন্তাতেই মগ্ন থাকে। এটা বাস্তবিক কিছু বাইরের প্রভাবের জন্যে এধরণের ভারতীয়, পাকিস্তানী বা ইংরেজ চেতনার রূপ নিচ্ছে। একটা পরাধীন জাতির সামাজিক চেতনা এত তীব্রভাবে অনুভব করা যায় না। যেমনটি হয় কোন স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়। স্বাধীনতার পর আবার এই সামাজিক চেতনাও মিলিয়ে যায়। সমাজবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রয়াস কিন্তু এখানেই থেমে থাকে না। এমনকি একই দেশের জনগণ বিভিন্ন এলাকাতে একই সামাজিক গোষ্ঠীৰদ্ধতার মধ্যেও বাস করে না। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কায়স্থ ও অন্যান্য বিভিন্ন বর্ণের মানুষেরা তাদের নিজ নিজ জাতির অন্তর্ভুক্ত ৰলেই মনে করে।

ভেদ-ভাবমূলক সামজবিরোধী মানসিকতার এখানেই শেষ নয়। এমনকি রাজপুত জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বুন্দেলি, রাঠোর, সিসোদিয়া, চৌহান প্রভৃতি ছোট ছোট গোষ্ঠী রয়েছে।

সূচীপত্র

সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের মধ্যে পঞ্চগৌড়ীয় ও পঞ্চদ্রাবিড়ী গোষ্ঠীরাও পারস্পরিক প্রাধান্য লাভের প্রচেষ্টায় অসামাজিক আচরণে লিপ্ত হয়। ভেবে দেখ সমাজটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই জোর দিয়েই বলছি যে. মানুষ এখনও প্রকৃত মানব সমাজ তৈরী করতে সমর্থ হয়নি–তীর্থযাত্রীর মত যথার্থ মানসিকতা নিয়ে একসঙ্গে চলতে শেখেনি। যদিও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা প্রেষিত হয়ে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এক সঙ্গে কাজে করছে তবুও বৃহত্তর সামাজিক লক্ষ্য নিয়ে সামান্যতম কাজও তারা একসঙ্গে করছে না। তবে কি সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা এক একটি ক্ষুদ্র পরিবারকেই সমাজ বলে ঘোষণা করব? সঙ্কীর্ণ আত্মস্বার্থের ভিত্তিতে পারস্পরিক বোঝাপড়া নিয়ে এগিয়ে চলাকে যদি সমাজ নাম দিতে হয় তাহলে এ ধরণের সমাজে পঙ্গু, রোগগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের কোন সুব্যবস্থাই করা যাবে না। কেননা প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাদের কাছ থেকে কেউই কোন উপকার পেতে পারে না। তাই একথা বললেই যথেষ্ট হয় না যে এই ধরণের এগিয়ে চলা বিচ্ছিন্নতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর আপাতঃ সামূহিক রূপ, কারণ এতে সমষ্টি থেকে ব্যষ্টির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা পূর্ণ মাত্রায় থেকে যাচ্ছে। সমস্ত মানুষ যখন পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হাতে হাত মিলিয়ে

সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, কেবল তখনই আমরা তাকে 'সমাজ' বলে ঘোষণা করতে পারি। তোমরা কিছু দাম্ভিক ও উদ্ধত মানুষদের বলতে শুণৰে–'আমি কারও সাহায্য চাই না, আমি নিজেই নিজেকে চালাতে পারি। আমি কারও ব্যাপারে নাক গলাই না, আর অন্য কেউ আমার ব্যাপারে নাক গলাক–এও পছন্দ করি না"। এ ধরণের মন্তব্যের চেয়ে বোকামি আর কিছুই হতে পারে না। রোগ সারানোর জন্যে ঔষধ ও সেবা–শুশ্রূষার প্রয়োজন, মৃতদেহ সৎকারের জন্যে প্রতিবেশীর সাহায্য প্রয়োজন ও নিয়মিত খাদ্য–বস্ত্র যোগানোর জন্যে কর্ষক ও তন্তুবায়দের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। মনে রেখো, এ বিশ্বে কোন সৃষ্ট সত্তাই স্বনির্ভর নয়–একক ভাবে কেউ কখনো বাঁচতে পারে না। একে অন্যের সঙ্গে এক অতিজাগতিক অচ্ছেদ্য ৰন্ধনে আৰদ্ধ; কোথাও ৰন্ধনটা সুস্পষ্ট, কোথাও বা অস্পষ্ট। পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ভুল ও মতানৈক্য বিশ্বে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনৰে। এই মহান সৃষ্টিতে অত্যুজ্জ্বল সূর্য থেকে শুরু করে একটা ক্ষুদ্র পিঁপড়ে পর্যন্ত আস্তিত্বিক মূল্য রয়েছে–সৰে মিলেই সৃষ্ট হয়েছে বিশ্ব–পরিবার। সেরকম মানব সমাজে একটা পঙ্গু ও মুমুর্ষু রোগীর মূল্য একজন প্রভাবশালী বিশিষ্ট ব্যষ্টি তুলনায় কম নয়। কেউই উপেক্ষণীয় নয়। কারও প্রতি সামান্যতম

অবিচারও পুরোপুরিভাবে সামাজিক সংরচনাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারে।

এই জীবজগতে এমন কতকগুলি মৌল সিদ্ধান্ত রয়েছে যা প্রতিটি জীবের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য ও যার সমাধান সবাইকে মিলে করতে হবে। এগুলিকে জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেৰে ও জীবিত প্রাণীর ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই সৰ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের ওপর নির্ভর করছে জীবজগতের সামগ্রিক স্বাস্থ্য। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যতখানি সমস্যার সমাধান করা হৰে, সমাজের পক্ষে ততখানিই তা কল্যাণকর। মনে রাখতে হবে এ ব্যাপারে অধিকার ও দায়িত্ব সকলের সমান। অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে চেতনার অভাব সামাজিক জীবনে মানুষকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। এর ফলশ্রুতিতে জীবজগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার গোষ্ঠীবিশেষের হাতে চলে যায়। সেই গোষ্ঠীবিশেষের শোষণের চাপে সমাজের প্রাণরস শুকিয়ে যেতে শুরু করে। প্রকৃতি–দত্ত সম্পদে জীবকুলের সমান অধিকার রয়েছে। আর যা এই পৃথিবীর বোঝা তা সমস্ত জীবেরই সমস্যা। এই চরম সত্যের প্রতি অবহেলা কালক্রমে সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে, সমাজের সমস্ত সম্ভাবনা

উন্নতির পথে চালিত না হয়ে শেষ পর্যন্ত ধ্বংসকে ডেকে আনে।

সমাজে কেন স্কুল-কলেজ খোলা হয়; ছেলেমেয়েরা যাতে পড়াশোণা করতে পারে তার জন্যে নয় কি? সমস্ত ৰাপ-মাই চান তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা জ্ঞান-বুদ্ধিতে উন্নত হোক। তবুও আজকের দিনেও অনেক ৰাপ্-মা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারেন না। কেন তা হৰে। যে কোন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত। এটা সকলেরই জন্মগত অধিকার। কেউ কেউ প্রকাশ্যে তথাকথিত সংস্কৃতির মুখোস পড়লেও গোপনে ব্যষ্টিস্বার্থ ও দলীয় স্বার্থকেই সমর্থন করে। মানব সমাজে এ ধরণের কপটতার কোন স্থান নেই। এটি আজকের পৃথিবীর শিক্ষার একটা বেদনাদায়ক ফলশ্রুতি। একথা খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। সামবায়িক প্রচেষ্টার দ্বারা সমস্ত সমস্যার সমাধানের মধ্যেই রয়েছে যথার্থ সমাজ প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য।

এমন কিছু প্রবণতা ও প্রবৃত্তি রয়েছে যা মানুষ ও পশু উভয়ের মধ্যেই প্রকাশ পায়। প্রকৃতপক্ষে এই প্রবণতাগুলি মানুষের মধ্যে পশুত্বের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। এই

প্রবণতাগুলিকে বাজাল বিস্তার করে হয়তো চেপে রাখা যেতে পারে কিন্তু দীর্ঘদিন তা করা কেবল অবাঞ্ছনীয়ই নয়, অসম্ভবও। কারণ সেগুলি অস্তিত্বের প্রধান সংরচনাগুলিকেই সমর্থন করে। মানুষ ও জীবজন্তু উভয়েরই প্রবণতার দিক থেকে কিছুটা মিল থাকায় তাদের প্রাণী পর্যায়ভুক্ত করা হয়। পার্থক্যের মধ্যে মানুষের ভেতর যে পশুটা লুকিয়ে রয়েছে সে প্রবৃত্তিগুলিকে মার্জিত রূপ দিয়ে সূক্ষ্মতর ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম। এই যে মার্জিত রূপ একেই বলে 'সভ্যতা'। খাদ্য গ্রহণ সকলের পক্ষেই অত্যাবশ্যক। কিন্তু মানুষ যখন খুব ক্ষুধার্ত্তও থাকে তখনও চারপাশের পরিবেশকে উপেক্ষা করে ক্ষুধার্ত কুকুরের মত সে খাবার টেবিলে ছুটে গিয়ে খেতে শুরু করে না। যদি বিচার-বুদ্ধির চেয়েও তাদের ক্ষুধার তাড়না অধিকতর না হয় তাহলে তারা খাবার আগে হাত-মুখ ভাল করে ধুয়ে নিয়ে খেতে বসবে। এটিই হচ্ছে সংস্কৃতির অঙ্গ।

সভ্যতাও পরিবর্তনীয়। এ পৃথিবীতে কোন কিছুই স্থির নয়-সৰ কিছুই গতিশীল। সভ্যতাও তেমনি প্রগতিশীল ভাবধারা যা ভাল থেকে আরও ভাল-র দিকে, অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে অর্থাৎ চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে-আর সেই লক্ষ্য হচ্ছে পরম ব্রহ্ম। যাদের মধ্যে এই

সূক্ষ্ম শিষ্টাচার ৰোধ যত বেশী থাকে তারা তত বেশী সংস্কৃতিবান। আমাদের মনে রাখা উচিত যে সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি ও কপটতা এক নয়। কপটাচারীর বাইরের আচরণ ও ভেতরের উদ্দেশ্যের মধ্যে থাকে স্বর্গ–মর্তের পার্থক্য। কিন্তু শিষ্ট ব্যষ্টির ভেতরে ও বাইরে কোন তফাৎ থাকে না। যেখানে মার্জিত রূপের অভিব্যক্তি ঘটছে সেখানে কাজ করছে মানুষের বিচারবুদ্ধি ও ঔচিত্যবোধ। ঔচিত্যৰোধ তাই সমাজে ভাঙ্গন না এনে আনৰে সামাজিক কল্যাণ। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। জলপান করা প্রতিটি প্রাণীর একটা সহজাত বৃত্তি। এখন জলতেষ্টা পেয়েছে ৰলেই কেউ যদি নর্দমার নোংরা জল পান করতে শুরু করে তৰে ৰলতে হৰে যে তার সংস্কৃতির ৰোধই নেই। জলপানের আগে জেনে নিতে হৰে জলটা পানের যোগ্য বিশুদ্ধ কিনা, দেখতে হবে সমস্ত শহরে ও গ্রামগুলিতে প্রতিদিন বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে কিনা–এ সবই সভ্য সমাজের লক্ষণ। লুকিয়ে জল পান করে যদি কেউ বলে "আমি নির্জলা উপোষ করছি" তবে তা চূড়ান্ত কপটতা ছাড়া কিছুই নয়। আপেক্ষিক দৃষ্টিতে দেখলে দেখৰ একজন মানুষ যত বেশী সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যষ্টিজীবনে সে তত অসহায়। একটি নবজাত শিশু সম্পূর্ণ অসহায়। আতুর–ঘরে সদ্য জন্ম নিয়ে যে এই সমাজে এসেছে সেই অসহায়

সূচীপত্র

শিশুটির কথা চিন্তা করতো! সামাজিক পরিবেশে একজন সভ্য মানুষ আরও বেশী পরিশীলিত মন নিয়ে তার শিশুর প্রতি বেশী কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দেন। ঠিক এই কারণেই তাদের শিশুরা নিজের শক্তিতে কোন কিছু করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে মায়ের স্নেহ ও বুদ্ধি যত বেশী হৰে ততই শিশু তার মায়ের উপর নির্ভরশীল হবে। পশুদের জগতে মায়ের স্নেহ যত কম ততই তাদের সন্তানেরা স্বয়ংনির্ভর ও সমর্থ হতে কম সময় নেয়। প্রকৃতি সেই সব অবহেলিত বাচ্চাদের রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে তাদের বাঁচবার প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেয়। একটা বানর শিশু খুব তাড়াতাড়ি তার মা'কে আঁকড়ে ধরতে শিখে নেয় কেননা ৰানর–মা তাকে বনে জঙ্গলে এখানে–ওখানে লাফালাফি করতে সৰ কটি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গকেই কাজে লাগাতে হয়। তাই বানর–মা তার সন্তানকে ঘাড়ে নিয়ে চলতে পারে না। কারণ ঘাড় বেঁকে গিয়ে শিশুর মৃত্যু হতে পারে। একটা বিড়াল–ছানা অন্ধ হয়ে জন্মায়। তাই সে তার মা'কে দেখতে পায় না–আঁকড়ে ধরা তো দূরের কথা। তাই বিড়াল–মাকে মুখে ক'রে তার শিশুকে বইতেই হৰে। গণ্ডার–শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার মায়ের কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। সে ঠিকই করে কেননা গণ্ডার মাতার জিব এত খস্খসে যে সে যদি

কয়েকবার আদর করে তার শিশুসন্তানের শরীর চেটে দেয় তবে শিশুর মৃত্যু অবধারিত। তাই মায়ের কাছ থেকে সরে গিয়ে গণ্ডার শিশু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যাতে তার দেহের চামড়া একটু শক্ত হয়, তারপর সে মায়ের কাছে ফিরে আসে।

সমাজকে দেখতে হবে যাতে মানবশিশুর যথোপযুক্ত যত্ন নেওয়া হয় কারণ তাদের অস্তিত্বের জন্যে পিতা–মাতার স্নেহ ও যত্নের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এসমস্ত অসহায় শিশুরা শুধু চোখের জলে তাদের সুবিধা–অসুবিধা জানিয়ে দেয়। শিশুকে শৈশব থেকে যৌবনে পৌঁছে দেওয়া একটা বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ। আমি ইতোপূর্বেই বলেছি যে, সমাজের সদস্যদের একসঙ্গে এগিয়ে চলতে হবে। একটি নবজাত শিশুও এই চলার পথে একজন যাত্রী। শিশুকে আমাদের সঙ্গী হিসেবে নেওয়া আমাদের সমাজ–সংহিতায় জাতকর্ম বলে চিহ্নিত হয়েছে।

বুদ্ধিগত বিচারে জীবকুলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যারা অপরের মধ্য নিজের জ্ঞানকে বিতরণ করতে চায় ও যারা তা চায় না। যারা জ্ঞান বিনিময় করার পক্ষে, বুঝতে হবে তারাই অধিকতর সামাজিক চেতনাসম্পন্ন। আর যারা তার

সূচীপত্র

বিরোধিতা করে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে কখনই যৌথ সমাজ-মানসিকতা গড়ে তুলতে পারবে না। মানুষ হ'ল মুখ্যতঃ সামাজিক প্রবণতাসম্পন্ন জীব। তাই মানুষকে সৰ সময় মনে রাখতে হবে যে যাদের শক্তি-সামর্থ্য কম, যাদের প্রকৃতি জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা সহ্য করার মত শক্তি দেয়নি, তাদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। যারা নিরাশ্রয়কে বা অসহায়কে সাহায্য করে তাদের ধরে নিতে হৰে অধিকতর সভ্য সমাজ-চেতনা সম্পন্ন। যারা বঞ্চিত-অবহেলিত ও উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেন তাঁরাই হলেন সামাজিক-মানসিকতা সম্পন্ন জীব। তাই প্রতিটি নারী-পুরুষের জন্যেই আনন্দমার্গের দ্বার অবারিত। যে কেউ চাইলে আনন্দমার্গে যোগ দান করতে পারেন ও অন্যের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যাত্রাপথের গান গাইতে পারেন। একসঙ্গে এগিয়ে চলা মানেই বিজয়ের পথে যাত্রা, আনন্দমার্গ এই কথাটাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাতে চায়।

সূচীপত্র

ভাবজড়তা থেকে সাবধান

সংরচনাগত অখণ্ডতার ব্যাপারে বলা যেতে পারে, সর্বোৎকৃষ্ট আকৃতি হচ্ছে ডিম্বাকৃতি। লাতিন 'ওবাম' শব্দটির অর্থ হচ্ছে ডিম। তাই 'ওবাল' শব্দের অর্থ ডিমের মত অর্থাৎ পুরোপুরি না হলেও কিছুটা ডিমের মত। পুরোপুরি ডিম্বাকৃতি নয়, তৰে প্রায় ডিম্বাকৃতি। সকল জ্যোতিষ্কই এই আকৃতির। সংস্কৃতে তাই বিশ্বকে বলা হয় ব্রহ্মাণ্ড। 'অণ্ড' মানে ডিম। সংস্কৃত 'অণ্ড' শব্দ থেকে উর্দু 'অণ্ডা' শব্দটি এসেছে। এখন, আমাদের এই বিশ্বটা খুৰই ৰড় কিন্তু অনন্ত নয় ও এর আকৃতিটা দেখতে ডিম্বাকার, অর্থাৎ এর একটা সীমারেখা আছে।

হ্যাঁ, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা খুৰই ৰড় ও বাস্তবিক এত বড় যে আমরা তার পরিমাপ করতে পারি না। কিন্তু তত্ত্বগত ভাবে পরিমাপ করা যায়। এইমাত্র আমি বললুম যে সবচেয়ে সুবিধাজনক সংরচনা হচ্ছে এই ডিম্বাকৃতি। একটা অণুর উদাহরণ নেওয়া যাক্। একটা আণবিক সংরচনা হচ্ছে কী–

সূচীপত্র

তার একটা কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে যা সংরচনাটির মধ্যেকার সবচেয়ে ভারী বস্তু ও যার চারিপাশে বিদ্যুতণুগুলি ঘুরে চলেছে। ঠিক তেমনি হ'ল আমাদের এই পার্থিব সংরচনা। পৃথিবী হচ্ছে তার কেন্দ্রবিন্দু ও চন্দ্র সেই কেন্দ্রবিন্দুর চারিদিকে ঘুরে চলেছে। এর চেয়ে বড় হচ্ছে সৌর-সংরচনা। সূর্য হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু আর বহু গ্রহ তাকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে। সবচেয়ে বড় সংরচনা হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-পরমপুরুষ, পুরুষোত্তম যার মধ্যমণি। সেই পুরুষোত্তমকে ঘিরেই সমস্ত জৈব-অজৈব সত্তাসমূহ ঘুরে চলেছে।

বিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই জানে; দু'টো কারণে গতি বজায় থাকে-কেন্দ্রানুগা ও কেন্দ্রাতীগা। কেন্দ্রানুগা শক্তি ব্যাসার্ধের দূরত্ব কমিয়ে আনবার চেষ্টা করে আর কেন্দ্রাতীগা শক্তি সেই দূরত্বকে কেন্দ্রৰিন্দু থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। সংস্কৃতে এই কেন্দ্রানুগ শক্তিকে বলে 'বিদ্যা' আর কেন্দ্রাতীগা শক্তিকে বলে 'অবিদ্যা'। সাধারণ ভাষায় আমরা অবিদ্যার জন্যে ইংরেজীতে 'শয়তান' শব্দটি ব্যবহার করি। এখন জেনে বা না-জেনে, জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক বিশ্বের প্রতিটি ভৌতিক তথা মানসিক সত্তা সেই পরমপুরুষের চারিপাশে ঘুরে চলেছে।

সীমিত বস্তু তথা সীমিত সংরচনার ক্ষেত্রে হয় কি–যখন কোন ঘূর্ণায়মাণ সত্তা কেন্দ্রৰিন্দুর থেকে অনেকটা দূরে সরে যায় তখন তা' অন্য একটি কেন্দ্রবিন্দুর দ্বারা আকর্ষিত হয়ে থাকে। এরই ফলে বিভিন্ন কেন্দ্রৰিন্দুর মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে একটি মাত্রই কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দুর সীমার বাইরে চলে যাবার কোন প্রশ্নই আসে না। যেমন যখন কোন মানুষ বেশী পরিমাণে অবিদ্যার বশীভূত হয়ে যায় তখন কেন্দ্রবিন্দু থেকে তার ব্যাসার্ধের দূরত্ব বাড়তে থাকে, কিন্তু ব্যাসার্ধ থেকেই যায়। মানুষ, পশুপক্ষী, উদ্ভিদ তথা অজৈব সত্তাকেও গতিশীল থাকতেই হবে। আর সে কারণেই আমি বলছিলুম, চলমান–তাই জীবন, থেমে থাকাটাই মৃত্যু।

যখন মানুষ জড়তার দ্বারা পরিচালিত হয়, ঠিক পরিচালিত নয় নিয়ন্ত্রিত হয় তখন তার আভ্যন্তরীণ চলমানতা নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সে তখন প্রাণহীন হয়ে পড়ে। তার অবস্থা তখন মৃতের চেয়েও খারাপ হয়ে যায়। তাই তোমরা মার্গের ছেলে–মেয়েরা জেনে রাখো, তোমরা কখনই কোন ভাবজড়তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিশ্বের চক্রবিন্দু থেকে দূরে

সরে যেওনা – সেই মধ্যমণি থেকে তোমাদের ব্যাসার্ধের দূরত্বকে বাড়তে দিও না। সব সময় তোমরা তোমাদের ব্যাসার্ধের দূরত্ব কমানোর চেষ্টা কর। যাতে তোমরা চক্রনাভির অধিক থেকে অধিকতর কাছটিতে পৌঁছে যেতে পার। তোমরা হয়তো জিজ্ঞেস করতে পার– ভাবজড়তা জিনিসটা কী? তোমরা সকলেই শিক্ষিত ছেলে–মেয়ে। তোমাদের মনে রাখা উচিত জড়তা এক বিশেষ ধরণের মানসিক সংরচনা। অবশ্য ধারণা মাত্রেই এক একটা মানসিক সংরচনা কিন্তু এদের সীমারেখার ব্যাপারে অবশ্যই তারতম্য থেকে যায়। আমার মনে হয় তোমরা কেউ কেউ 'প্রাউট'– এর কথা শুণেছ। আমি মনে করি তোমরা সেগুলো পড়েছও। সেখানে প্রাউটের পঞ্চম তত্ত্বে বলা হয়েছে যে দেশ কাল–পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পদের উপযোগিতা গ্রহণের পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমি কী তা বলিনি? হ্যাঁ, এমনটাই বলেছি, আর তারই ফলে পরিবর্তনের সুযোগ সেখানে রয়ে গেছে। মানুষের মন কখনই বাঁধাধরা কোন কিছুকে নিয়ে থাকতে চায় না। সে গতি চায়। আর শুধু গতিই নয়, সে গতির মধ্যে দ্রুতিও আনতে চায়। কিন্তু ভাবজড়তা কী! ভাবজড়তা হচ্ছে এমন এক ধরণের ভাব যার চারিদিকে একটা গণ্ডী টেনে দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে

এর বাইরে যাওয়া চলবে না। অর্থাৎ ভাবজড়তা মানুষকে কৃত্রিম গণ্ডীর বাইরে যেতে দেয় না। সুতরাং ভাবজড়তা একান্তভাবেই মানবমনের মৌলিক গতিপ্রগাহের পরিপন্থী।

জেনে অথবা না জেনে প্রত্যেক সত্তাকেই পরম কেন্দ্রবিন্দুর চারিপাশে ঘুরতে হৰেই। এর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু ভাবজড়তার ক্ষেত্রে কী হয়! যখন কেউ কেন্দ্রবিন্দুর কাছে আসতে থাকে তখন সে ভূমা মনের দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত হয়ে যায় যে সে তখন সেদিকে ছুটে যায়–কেবল তার সঙ্গে মিলেমিশে একাত্ম হবার জন্যেই। বস্তুতঃ যখন তা' হয়ে থাকে তখন অণু মন ভূমা মনের সঙ্গে মিলে এক হয়ে যায় আর ভূমা মন সৰ সময়েই ভাবজড়তার ঊর্ধ্বে। তাই প্রথম থেকেই ভাবজড়তার প্রভাব মুক্ত হতে তোমাদের সংগ্রামমুখর হতে হৰে। এই ভাবজড়তার জন্যেই মানব সমাজের যথার্থ প্রগতি হয়নি। গত পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে মানব–মনীষার যথেষ্ট বিকাশ হয়েছে, গত দু'শো বছরের মধ্যে উন্নতি আরও দ্রুতগতিতে হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অর্থাৎ গত কয়েক দশকে উন্নতি তার চেয়েও বেশী হয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে ৰৌদ্ধিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও সভ্যতার সঙ্কট রয়েই গেছে। এই সঙ্কটের উৎসস্থলটা কী? সঙ্কটই বা কী? এটা ঠিকই যে মানুষ খুব চালাক-চতুর জীব। তবু বিপদের সৃষ্টি হয়েছে এই ভাবজড়তা থেকেই। মানস-স্তরে এই ভাবজড়তাই মানুষের মনোজগতে বিপদ ডেকে এনেছে। ভৌতিক ক্ষেত্রে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্মুক্ত হতেও পারে, নাও পারে, কিন্তু মানসিক ক্ষেত্রে বিপদ অবশ্যই রয়ে গেছে। জাগতিক ক্ষেত্রে খাদ্য-পানীয়-বাসস্থানের নিশ্চিততা হয়তো তোমরা পেয়েও থাক। তবে তাই সৰ কিছু নয়। মনোজাগতিক ক্ষেত্রে- ৰৌদ্ধিক স্তরে তোমরা বিপন্মুক্ত হয়ে থাকতে চাও-চাও মানসিক উন্নতি, নিরঙ্কুশ ৰৌদ্ধিক প্রগতি। কিন্তু কতকগুলি ভাবজড়তা যেন তোমাদের গ্রাস করছে। উদাহরণস্বরূপ মার্কসবাদের কথা বলতে পারি। মার্কসবাদ এই ধরণেরই একটি ভাবজড়তা। তাই মার্কসবাদ তার সীমিত গণ্ডীর বাইরে তোমাকে কিছুতেই চিন্তা করতে দেবে না। সুতরাং সমস্ত বুদ্ধিজীবীদেরই কর্তব্য হচ্ছে জনগণের বর্তমান-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়া ও ভাবজড়তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে সাবধান করে দেওয়া।

তোমাদের পথ পরমাপ্রশান্তিরই পথ। তাই তোমাদের অবশ্যই বিশ্বের চক্রনাভির দিকে এগিয়ে চলতে হবে। এখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত শত জীব রয়েছে–কত মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, লতাপাতা প্রভৃতি, আর তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে একটি করে মন। আমি তোমাদের ইতোপূর্বে ৰলেছি যে, অনুন্নত জীবের মন হ'ল একটা সহজাত বৃত্তি মাত্র। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মন হচ্ছে ক্রমঃবিকাশশীল সত্তা। সমস্ত সত্তাই জেনে বা না জেনে অজস্র ভাব–ভাবনা, অনুভূতি, বৃত্তি, বাসনা, কামনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সাধক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক–এদের প্রত্যেকের মনে সেই পরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবার একটা আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে রয়েছে–অণুমানসকে ভূমামানসের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে। ভূমামানসের কেন্দ্রগুলির দিকে এগিয়ে যাবার পথে কোন ৰাধাই মেনে চলা উচিত নয়, কোন প্রতিকূলতাকেই প্রোৎসাহিত করা উচিত নয়। এইভাবেই মানবতার অবারিত অগ্রগতি ঘটুক, যা কোন জাতি, বর্ণ, পোষাক–পরিচ্ছদ, ঐতিহাসিক বা প্রথাগত ৰাধাকে স্বীকার করে না। মানবজাতির রয়েছে এক ও অভিন্ন উত্তরাধিকার। আর সকলে সমষ্টিগতভাবে সেই উত্তরাধিকারকে পাথেয় করে বিশ্ব–মানবতাবাদের পতাকা হাতে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলুক।

সূচীপত্র

এ বিশ্বে সৱাই সুখী হউক। সৱাই সমস্ত রকম রোগমুক্ত হউক। সৱাই সবকিছুর ভাল দিকটা দেখুক। অবস্থার চাপে পড়ে কাউকে যেন কোন কষ্ট ভোগ করতে না হয়।

ইসতাম্বুল, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯

নদী ও সভ্যতা

মানুষের জীবন হচ্ছে পশুজীবনেরই উন্নতির চরম স্তর। মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য হ'ল–তার ধর্ম রয়েছে, কিন্তু পশুজীবনের কোন ধর্ম নেই।

রীতি–নীতি আচার–আচরণ, সৌজন্য, আদর্শ, প্রেম–প্রীতি ইত্যাদির সমাহারকেই বলা হয় সভ্যতা। সমস্ত মানুষজাতির সংস্কৃতি একটাই কিন্তু সভ্যতা সমাজভেদে পৃথক পৃথক হয়ে থাকে।

সূচীপত্র

মানব সভ্যতার উন্মেষ তথা প্রসার নদী উপত্যকা ধরেই ঘটে থাকে। নদীর মতই মানুষের সভ্যতারও তিনটি স্তর। সেগুলি হ'ল–পার্বত্য স্তর (Hill phase), সমভূমির স্তর (Plane phase) ও ব–দ্বীপীয় (Delta phase) স্তর। পার্বত্য স্তর থেকে সভ্যতা এগিয়ে চলে সমভূমির স্তরের দিকে ও তা শেষপর্যন্ত ব–দ্বীপীয় স্তরে উপনীত হয়। সভ্যতার সূত্রপাত পার্বত্য স্তরে, সমভূমির স্তরে ঘটে তার বিকাশলাভ ও ব–দ্বীপীয় স্তরে ঘটে চরম পরিণতি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সভ্যতার উৎপত্তি নদী–উপত্যকায় কেন হয় আর তা নদী–উপত্যকা বেয়েই বা যায় কেন? প্রাচীনকালে প্রস্তর যুগ পর্যন্ত মানুষ কুঁয়ো খুঁড়তে পারত না। আর তাই তারা জল সরবরাহের জন্যে প্রাকৃতিক উৎসের ওপর নির্ভর করত। তাই নির্ঝরিণী, ঝর্ণা, জলপ্রপাত, নদী ইত্যাদির ধারেই জনবসতি গড়ে উঠেছিল। এমনকি জীবজন্তুরাও বাসস্থানের জন্যে এই ধরণের স্থানকে বেছে নেয়। কেবল পাখীদের ক্ষেত্রেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। এইভাবেই উপত্যকা, ঝর্ণা, নির্ঝরিণী, জলপ্রপাত বিশেষ করে নদীতীরবর্তী স্থানেই মনুষ্য–বসতি গড়ে উঠেছিল। নদী–

উপত্যকায় মনুষ্য-বসতি গড়ে উঠেছিল বলে সভ্যতার প্রথম সূত্রপাত এখানেই হয়েছিল।

সমাজে মানুষদের পারস্পরিক সম্পর্ক, নারী-পুরুষের সম্পর্ক। মানুষের সামূহিক প্রয়োজন, বৈয়ষ্টিক ও সামূহিক দায়দায়িত্ব, ব্যষ্টিগত অগ্রগতির ধারা-এসব কিছু নিয়েই সভ্যতা। আগেই বলা হয়েছে যে, সভ্যতার সূত্রপাত পার্বত্য স্তরে, আর তার পরিণতি ব-দ্বীপীয় স্তরে। স্বভাবতই ব-দ্বীপীয় স্তরইই হচ্ছে সভ্যতার চরম ও সর্বোচ্চ স্তর।

ভারতবর্ষের গঙ্গানদী-উপত্যকা-সভ্যতার পার্বত্য-স্তর শুরু হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের গাড়োয়াল ও কুমায়ুন পর্বতমালায়। উত্তর প্রদেশের অবশিষ্টাংশ ও বিহার পড়ে সমভূমি স্তরে, আর তার ব-দ্বীপীয় স্তর শুরু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ থেকে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা-সভ্যতার পার্বত্য-স্তর শুরু হচ্ছে তিব্বত ও অরুণাচলে। এর সমভূমি স্তরটা রয়েছে অসম ভূমিতে আর এর ব-দ্বীপীয় স্তরটা রয়েছে গোয়ালপাড়া, মৈমনসিং ও রংপুর জেলায় (শেষোক্ত জেলা দু'টি বর্ত্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত)।

ব-দ্বীপ (Delta) বলতে বোঝায় নদী যেখানে সংক্ষিপ্ততম গতিপথ ধরে সমুদ্রে 'গিয়ে মিশেছে। এই স্তরে উপ-নদীগুলির

কোন মুখ্য ভূমিকা থাকে না। অবশ্য পার্বত্যস্তরে এই উপ-নদীগুলি এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সেখানে শাখানদী নেই ৰললেই চলে। দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ সমভূমি স্তরও সভ্যতার বিকাশ তথা প্রসারের ব্যাপারে বড় রকম ভূমিকা নিয়ে থাকে, তবে সেই সঙ্গে শাখানদীগুলির কিছুটা গুরুত্ব থাকে। যাই হোক ব-দ্বীপ স্তরে উপনদীগুলির চেয়ে শাখানদীগুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

মূল বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সভ্যতাকে মুখ্যতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়-মৌলিক সভ্যতা ও বিমিশ্র সভ্যতা। নদী যেমন যেমন এগিয়ে যায় ও অন্য নদীতে গিয়ে মেশে, বিশেষ বিশেষ সভ্যতারও তেমন তেমন পরিবর্তন হয়ে থাকে। আর এই ভাবেই জন্ম নেয় খণ্ড সভ্যতা (Sub-civilization) ।

মন্দাকিনী ও অলকানন্দা নদী-সভ্যতার উৎপত্তি হয়ে ছিল পার্বত্য স্তরেই এই দুই সভ্যতার একটা সমন্বয় ঘটেছিল। অনেক পাহাড়-পর্বত-ঝর্ণা, নির্ঝরিণীর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার পর মন্দাকিনী ও অলকানন্দা নদী দুইটি পার্বত্য স্তরে পরস্পরের কাছে আসে। হরিদ্বারের কাছে নদী দু'টি মিলিত হয়ে দুইটি মৌলিক সভ্যতা - গাঢ়োয়ালী ও কুমায়নী-মিলিত

ভাবে এক বিমিশ্র গাঙ্গেয় সভ্যতার সূত্রপাত করে যার অধিক্ষেত্র প্রয়াগ পর্যন্ত বিস্তৃত।

এখন আরেকটি নদী উপত্যকা–সভ্যতা যমুনা–সভ্যতা (যমুনা–নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল তাই একে আমরা যমুনা–সভ্যতা নাম দিতে পারি) কয়েকটি খণ্ডসভ্যতার সমবায়ে গড়ে উঠেছিল যেখানে বহুতর রীতি–নীতি, পোষাক–পরিচ্ছদ, আচার–ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। এই সভ্যতাও প্রয়াগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিমিশ্র গাঙ্গেয়–সভ্যতা ও বিমিশ্র যমুনা–সভ্যতা প্রয়াগের সন্নিকটে পরস্পরে মিলিত হয়ে এক বিমিশ্র গঙ্গা–যমুনা সভ্যতার সূত্রপাত করে, যা প্রয়াগ–সঙ্গমের পর থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনা সভ্যতার আচার–আচরণ রীতি–নীতির দ্বিতীয় সংমিশ্রণ ঘটে।

প্রয়াগের পর থেকে আমরা সভ্যতার আরেকটা বিমিশ্রণ দেখতে পাই। তাই রীতি–নীতি, আচার–আচারণ, ব্যবহার, সামাজিক বিধিনিষেধ, ভাষা, উচ্চারণরীতি, মানুষের দেহ সংস্থানেও পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী বিমিশ্রণ ঘটে যখন গোমতী, রাপ্তী, শোণ ও সরযূ নদী হিমালয়ের উত্তরাংশ থেকে নূতন ধারা নিয়ে এগিয়ে এল ও চম্বল–ঘাগরা নিয়ে এল

বিন্ধ্যপর্বতের ধারাকে। এই ভাবেই সভ্যতায় পার্থক্য সূচিত হয় বিভিন্ন নদীর গতি পথের বিভিন্ন স্তরে ও অন্য নদী–সভ্যতার সঙ্গে বিমিশ্রণের ফলে উপ–সভ্যতা ও শাখা–সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করে।

যমুনা ও চম্বল–সভ্যতার সমন্বয়ে বুন্দেল–উপসভ্যতার সৃষ্টি হয় আর যমুনা ও শোণ–সভ্যতার বিমিশ্রণে বাঘেলী–সভ্যতার উদ্ভব হয়।

কাশীর পর অন্য কয়েকটি নদীর মিলনের ফলে সভ্যতার আরেকটা বিমিশ্রণ ঘটে। এইভাবে সমভূমি স্তরে শাখানদী ও উপনদীগুলি নোতুন নোতুন সভ্যতার উদ্ভবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পশ্চিমবঙ্গে মালদহের পর গঙ্গা ব–দ্বীপ (delta) স্তরে প্রবেশ করে ও বিমিশ্রিত গাঙ্গেয় সভ্যতাও ব–দ্বীপ স্তরে উপনীত হয়, যে স্তরে শাখানদীগুলির প্রধান ভূমিকা রয়েছে। বিমিশ্র গাঙ্গেয় সভ্যতার পরিণতি ঘটে ৰাঙলায় এসে। মালদহের কাছে এসে গঙ্গা দক্ষিণ–মুখী হয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। ('দহ' শব্দের অর্থ নদীর জলধারার চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান অবস্থা। এই সন্নিহিত জনপদটির নামকরণ হয়

মালদহ)। গাঙ্গেয় বিমিশ্র সভ্যতা ৰাঙলায় এসে উৎকর্ষ লাভ করে।

তাহলে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চল হচ্ছে সভ্যতার প্রথম স্তর আর উত্তরপ্রদেশের অবশিষ্টাংশ ও বিহার হচ্ছে দ্বিতীয় স্তর–যেখানে বাঘেলী, বুন্দেলী, অবধী, ভোজপুরী, মগহী, মৈথিলী ও অঙ্গিকা উপসভ্যতাগুলির উদ্ভব হয়েছিল।

ব্রহ্মপুত্র সভ্যতা হচ্ছে প্রাক্সমচৈনিক (Proto–Chinese) সভ্যতা ও ইন্দো–তিব্বতীয় সভ্যতার বিমিশ্রিত রূপ। অসম সভ্যতা হচ্ছে তিব্বত–চীন সভ্যতা ও গাঙ্গেয় সভ্যতার বিমিশ্র ধারা। অসমের ভূমি যেহেতু গাঙ্গেয় সভ্যতার অতি নিকটবর্ত্তী তাই এমনটা সম্ভব হয়েছিল। এরপর ব্রহ্মপুত্র বাঁদিকে মোড় নিয়ে ৰাঙলায় প্রবেশ করে ও এই অবস্থাটাই হচ্ছে তার ব–দ্বীপ স্তর। ব–দ্বীপ অবস্থাটাই হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র সভ্যতার চূড়ান্ত অবস্থা। ৰাঙালী হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র সভ্যতার সর্বশেষ পরিণাম।

বাঙলায় রয়েছে আরেকটি সভ্যতার ধারা–রাঢ় সভ্যতা। এই সভ্যতার পার্বত্য স্তর, সমভূমি স্তর ও ব–দ্বীপীয় স্তর–এই তিনটি স্তরই রয়েছে বাঙলাতে। রাঢ়ের সব ক'টি নদী

সূচীপত্র

বাঙলার নিম্নাঞ্চলে এসে মিলিত হয়ে নূতন নূতন বিমিশ্র উপসভ্যতার জন্ম দিয়েছে। এই জন্যেই দেখতে পাই ৰাঙলায় তিনটে ব-দ্বীপীয় সভ্যতার বিমিশ্রণ ঘটেছে-গাঙ্গেয় সভ্যতা, ব্রহ্মপুত্র-সভ্যতা ও রাঢ়-সভ্যতা। জগতের সভ্যতার ইতিহাসে এটাই সর্বোত্তম বিমিশ্র সভ্যতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাঙলার মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের 'ব্যাপারে প্রকৃতির সাহায্য অবারিত। কারণ পৃথিবীর আর কোথাও গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মত অত বড় দু'টো নদী একত্র মিলিত হয়নি।

মৌলিক সভ্যতায় মানুষের দৈহিক সামর্থ অধিক হয়। বিমিশ্র সভ্যতায় মানুষের ৰৌদ্ধিক সামর্থ ও সেই সঙ্গে গোটা সভ্যতাটাই হয়ে থাকে জটিল ও দৃঢ়ভিত্তিক। আর গাঙ্গেয় সভ্যতার অধিবাসীদের মধ্যে সরলতা ও দৈহিক সামর্থ অধিক থাকে। কিন্তু ব-দ্বীপীয় স্তরে মানুষ হয় জটিল, দৈহিক সামর্থ অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু ৰৌদ্ধিক সামর্থ অনেক বেশী। ৰাঙলার মানুষেরা বৌদ্ধিক দিক থেকে খুৰই উন্নত, কারণ-

(১)বাঙলার সভ্যতা হচ্ছে তিনটি ব-দ্বীপীয় সভ্যতার বিমিশ্ররূপ।

(২) বাঙলার সভ্যতা মৌলিক সভ্যতা নয়–এটি একটি মহান জটিল সভ্যতা। এটা তিন তিনটি ব–দ্বীপীয় সভ্যতার চূড়ান্ত বিমিশ্ররূপ। তাই স্বভাবতই ৰাঙলার সভ্যতা খুবই শক্তিশালী সভ্যতা–ৰৌদ্ধিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যা খুবই প্রাগ্রসর।

এলাহাবাদ, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২

• * * * * * * * * *

নদী ও সভ্যতার কথা বলতে গিয়ে একটি পুরোনো ঘটনা চোখের সামনে ভাসছে। ঘটনাটি যেন আজও প্রাণীন্ গতিধারায় স্পন্দিত।

গেছি এলাহাবাদে–সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে। আমি সাধারণতঃ এধরণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করি না। তবে এলাহাবাদের ব্যাপারটা ছিল আমার কাছে একটু অন্য ধরণের। প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনেকেই আমার সঙ্গে ব্যষ্টিগতভাবে পরিচিত। দ্বিতীয়তঃ এলাহাৰাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনও যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রভাব ছিল। আমার কাজ হয়ে গেল সন্ধ্যের গোড়ার দিকে।

সূচীপত্র

তাই এলাহাবাদ শহরে থেকে আর সময় নষ্ট না করে রবাণা হলুম মুজাফফরপুর অভিমুখে। মুজাফফরপুরে তখন আমার কয়েকটা কাজ জমে ছিল যে জন্যে ওখানে যাওয়া জরুরী হয়ে পড়েছিল। রামবাগ ইষ্টিশানের প্রতীক্ষালয়ে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সুতনুকার সঙ্গে। সঙ্গে ছিল ওর ছেলে হিমবান। আমাকে দেখেই সুতনুকা আনন্দে চীৎকার করে উঠল। বললে- "দাদা, এ যে অভাবনীয়; এভাবে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাৰে এ স্বপ্নেও কোন দিন আমি দেখিনি।

সুতনুকা মিত্র আমার মাসতুতো বোন। ওর সঙ্গে এর আগে দেখা হয়েছিল প্রায় পনের বছর আগে–ওর ছোট বোন নীহারিকার বিয়েতে–চন্দননগরে। ওর স্বামী অরুপরতন মিত্র একজন দক্ষ সামরিক অফিসার হিসেৰে ইংরেজ আমলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। অরুপরতনের সঙ্গেও আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল চন্দননগরের বোড়ো–কালীতলাতে।

আমি বললুম–"দেখা যখন হ'লই, চলনা আমার সঙ্গে মুজাফফরপুর, তারপর ওখান থেকে বর্দ্ধমান চলে যাৰি।”

ও বললে–“দাদা, হিমবানের শীতের ছুটিতে আমি তোমার ওখানে যাৰ। এখন ওর কলেজ খুলে গেছে। আর তা ছাড়া

অরুপরতন পরশু লণ্ডন থেকে দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছোচ্ছে। পৌঁছেই সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছে ৰর্দ্ধমানের বাড়ীতে। ৰাড়ীতে তালা দেওয়া। আমি যদি বর্দ্ধমান পৌঁছোতে দেরী করি তাহলে বেচারা বড় অসুবিধেয় পড়ৰে”।

আমি ভেবে দেখলুম, কথাটা ঠিকই। তাই স্থির করা হ'ল, আমরা রামৰাগ (এলাহাৰাদ সিটি) মিটার গেজের গাড়ীতে একই কামরায় গল্প করতে করতে বেনারস সিটি পর্যন্ত যাৰ। আমি বেনারস সিটি থেকে মিটার গেজের গাড়ীতে চলে যাৰ মুজাফফরপুর আর সুতনুকা–হিমৰান বেনারস শহরে কিছুক্ষণ থেকে এমন কোন একটা গাড়ীতে ৰর্দ্ধমান যাৰে যা শেষ রাত্তিরে অর্থাৎ ভোর হৰার আগেই ৰর্দ্ধমান পৌঁছে যাবে। কারণ অনুমান করা যাচ্ছিল যে অরুপরতন ওই দিনই ৰেলা আন্দাজ দশটা নাগাদ কলকাতা থেকে লোক্যাল ট্রেনে ৰর্দ্ধমানে পৌঁছোৰে।

তাইই করা হ'ল। অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ। সুতনুকারা বর্তমানে বর্দ্ধমানের বাসিন্দে হলেও ওরা আসলে কোন্নগরের মিত্তির। পাঠান আমলের শেষের দিকে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হুগলী জেলায় যে একটি সারস্বত সমাজ গড়ে ওঠে তার অন্যতম কেন্দ্র ছিল এই কোন্নগর। সে যুগে এখনকার

সূচীপত্র

রায়-মিত্তিররাই ছিলেন জমিদার। সেকালে কোন্নগর হুগলী জেলা বা রাঢ়ের অন্যতম সভ্য ও সুশিক্ষিত গ্রাম রূপে পরিচিত তো ছিলই, গোটা বাঙলাতেও স্থানটির প্রসিদ্ধি ছিল। স্থানটির আসল নাম কর্ণনগর। লোকে বলত, ৰাঙলায় নগর বলতে ওই একটিই নগর আছে-কর্ণনগর। শিক্ষিত লোকের মুখে মুখে স্থানটির নাম ঘোরাফেরা করত। কেউ কাউকে যদি জিজ্ঞেস করত তুমি কোন্ নগরে যাৰে গা, তার জৰাৰে ৰলত-নগর তো ওই একটিই; তা কোন্ নগর জিজ্ঞেস করছ কেন? সেই থেকে জায়গাটির নাম হয়ে দাঁড়ায় কোন্নগর।

সুতনুকাকে বললুম, "আমরা আজ যে শহর থেকে আসছি প্রাচীনকালে এই এলাহাবাদ শহরটির নাম ছিল প্রয়াগ। একথা ঠিকই, কোন্নগরের চেয়ে প্রয়াগ অনেক পুরোনো। যজুর্বেদীয় যুগের শেষের দিকে এর প্রতিষ্ঠা। তবে প্রাচীনত্বে ৰর্দ্ধমান প্রয়াগের চেয়ে পুরোনো। পাঠান যুগে এই প্রয়াগ শহরটির নাম হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ্-আৰাদ। তখন থেকে এর খ্যাতি ৰাড়তে থাকে। শিয়ারা শহরটিকে বলতেন ইল্লাহাৰাদ। মোগলযুগে কিন্তু শহরটির খ্যাতি-বৃদ্ধি ৰন্ধ হয়ে যায়। শহরটি আৰার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে। ইংরেজরা একে তৎকালীণ আগ্রা ও অযোধ্যার সংযুক্ত প্রদেশের (United

সূচীপত্র

Provinces of Agra and Oudh) সংক্ষেপে U. P. রাজধানী করেন। বর্দ্ধমান প্রাক্-ৰৌদ্ধযুগে রাঢ়ের রাজধানী ছিল। বৌদ্ধ-জৈন যুগেও রাঢ়ের রাজধানী ছিল। মোগল আমলে (আকৰরের সময়) হয়েছিল সুৰা-ৰাঙলার রাজধানী। কোন্নগরের কিন্তু এই ধরণের কোন রাজকীয় জৌলুষ ছিল না। সে ছিল জিলা ৰর্দ্ধমানের (তখন হুগলী জেলা হয়নি) একটি অভিজাত গ্রাম। মধ্যযুগের সুপ্রসিদ্ধ ৰাঙালী পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষ, সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রকার ও ন্যায়কার রামচন্দ ঘোষ, খড়দহের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত প্রাণতোষ বিশ্বাস, প্রথম ৰাঙালী ডি, এম, ও তথা সিবিল সার্জেন ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ (Dr. K. D. Ghosh- শ্রীঅরবিন্দের পিতা)-সৰাই ছিলেন এই কোন্নগরের সুসন্তান। তারপর হিমবানের দিকে চেয়ে বললুম-তোর ৰাৰা কোন্নগরের সুসন্তান, তুই কিন্তু ৰর্দ্ধমানের।

ও বললে-"আপনি তো একটু আগেই বললেন, কোন্নগর আগে ৰর্দ্ধমান জেলাতেই ছিল"।

আমি বললুম-"সে কথা একশ' ভাগ সত্যি"।

আমরা চলেছি পশ্চিম থেকে পূর্বে–সুপ্রাচীন ব্রহ্মাবর্ত্ত তথা ব্রহ্মর্ষিদেশ থেকে প্রাচীন কাশী রাজ্যের দিকে। গাঙ্গেয় অববাহিকার এই অংশকে গঙ্গানদী–সভ্যতার মধ্যমাংশ বলে গণ্য করা হয়। প্রয়াগের উজানকে ধরা হয় গঙ্গা অববাহিকেয় সভ্যতার ঊর্ধ্বাংশ; প্রয়াগ থেকে শোণ–গঙ্গার সঙ্গম স্থলকে ধরা হয় গঙ্গা অববাহিকেয় সভ্যতার মধ্যমাংশ ও শোণ–গঙ্গা সঙ্গম থেকে সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত স্থানকে ধরা হয় গঙ্গা অববাহিকেয় সভ্যতার প্রাক্–গৌড়ীয় অংশ। সাহেবগঞ্জের পর থেকে অর্থাৎ গঙ্গা যেখান থেকে দক্ষিণবাহিনী হচ্ছে সেখান থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত গঙ্গা অববাহিকেয় সভ্যতার চরমাংশ বা গৌড়ীয় সভ্যতা। এই গৌড়ীয় সভ্যতা তার স্বকীয়ত্বের পূর্ণত্বে পৌঁছোচ্ছে যখন রাঢ়ের নদীগুলি তাদের স্থানীয় সংস্কৃতির স্বকীয়ত্ব নিয়ে মিশছে, আর মিশছে উত্তর–পূর্ব থেকে আগত দেবনদ ব্রহ্মপুত্র মঙ্গোলতান্ত্রিক সভ্যতার ধারা বেয়ে। গাঙ্গেয় অববাহিকার যে অংশ প্রাক্–গৌড়ীয় ও গৌড়ীয় সভ্যতার আধার সে অংশকে যথার্থ বিচারে আর্যাবর্ত সভ্যতা বলা চলে না। সেটি হচ্ছে পূর্ব ভারতীয় সভ্যতা বা বিস্তীর্ণায়িত গঙ্গা–বদ্বীপ সভ্যতা।

সূচীপত্র

তাই এলাহাবাদ থেকে কাশী বা ধরতে পারি গণ্ডকী (এখানে গণ্ডকী বলতে নারায়ণী গণ্ডকের কথা বলা হচ্ছে- মুজাফফরপুর ও সমস্তিপুরের বুড়িগণ্ডকে নয়। বুড়িগণ্ডক অববাহিকা প্রাক্-গৌড়ীয় সভ্যতার অংশ) পর্যন্ত স্থানকে আর্যাবর্ত সভ্যতার প্রতিভূ হিসেৰে। ৰর্দ্ধমানকে গণ্য করতে পারি রাঢ়ীয় সভ্যতার মধ্যমণি রূপে আর কোন্নগরকে পাচ্ছি এই রাঢ়ীয় সভ্যতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় সভ্যতার কপিলধারা রূপে যার থেকে উদ্ভূত হচ্ছে বর্ত্তমান ৰাঙালী সভ্যতা। তাই বুঝলে হিমবান, তোমার ৰর্দ্ধমান আর তোমার বাবার কোন্নগর দুই-ই একই সোণালী চাঁদের জ্যোৎস্নাবগাহন।

হিমবান বি. এস. সি-র ছাত্র। কিন্তু তার নদী অববাহিকেয় সভ্যতায় আগ্রহ দেখে আমি অবাক হয়ে গেলুম। এতটুকু ছেলে, অথচ সভ্যতার উৎস সম্বন্ধে তার জানবার কী অপরিসীম উৎসাহ। হিমবান আমাকে বললে-"আচ্ছা মামাৰাৰু, গঙ্গা নেমে আসছে গঙ্গোত্তরী থেকে, সঙ্গে নিয়ে আসছে একটি বিশেষ ধরণের গাছপালা, জীবজন্তু ও মানুষের পরিবেশ। যমুনাও তো যমুনোত্তরী থেকে আসছে তেমনি একটি নিজস্ব পরিবেশ নিয়ে। তা হলে প্রয়াগে' গঙ্গা-যমুনা মিশে যাবার পরে অবস্থাটা কেমন হবে"?

সূচীপত্র

আমি বললুম–ভারী সুন্দর প্রশ্ন করেছ। গঙ্গা যেমন তার গেরুয়া মাটির সঙ্গে এনেছে বিশেষ ধরণের ফ্লোরা (উদ্ভিদ) ও ফনা (জীবজন্তু) তার নিজস্ব ধরণের পলল ধর্ম, যমুনাও ঠিক তেমনি যমুনোত্তরী থেকে তার স্বকীয়ত্ব নিয়েই নেৰে এসেছে। কিছুদূর এগিয়ে আসার পর যমুনায় মিশেছে পশ্চিম ভারত, মালব ও বুন্দেলখণ্ডের নানান ধরণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে চর্মন্বতী বা চম্বল নদী। চম্বলের ধারা যমুনায় মেশার পরে তৈরী হয়েছে আরেক বিমিশ্র স্থানিক সভ্যতা যা ৰাঘেলখণ্ডীয় সভ্যতা বা ৰাঘেলী সভ্যতা নামে অভিহিত হতে পারে। যমুনা এই বিমিশ্র ধারাটিকে সঙ্গে নিয়ে তার কালো জল এনে প্রয়াগে গঙ্গায় ফেলছে। তাই প্রয়াগ থেকে শুরু হচ্ছে গাঙ্গেয় অববাহিকেয় সভ্যতার মধ্যম স্তর বা মধ্যমাংশ। প্রয়াগের উজানে যে ধরণের গাঙ্গেয় সভ্যতা, প্রয়াগের ভাটিতে তাই সেই ধরণের গাঙ্গেয় সভ্যতা নয়। এই সভ্যতা গঙ্গার দক্ষিণ পার ধরে চলেছে পটনার কাছে শোণ–গঙ্গার সঙ্গম পর্যন্ত। আর গঙ্গার উত্তরাংশে - চলেছে হাজীপুরের কাছে গঙ্গা–নারায়ণী–গণ্ডক সঙ্গম পর্যন্ত। উত্তর পারে তার পরেই শুরু হয়ে যাচ্ছে প্রাক্–গৌড়ীয় সভ্যতার অববাহিকা, যাতে অস্ট্রিক

প্রভাব তুলনামূলক বিচার কিছুটা কম আর মঙ্গোলতান্ত্রিক প্রভাব তুলনামূলক বিচারে কিছুটা বেশী। এই অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকে ত্রিহোত্রীয়ভূমি নামে খ্যাত। গঙ্গার দক্ষিণে শোণ–গঙ্গা সঙ্গমের পর প্রাক্‌–গৌড়ীয় সভ্যতার অববাহিকা শুরু হচ্ছে বটে কিন্তু তাতে মঙ্গোলতান্ত্রিক প্রভাব তুলনামূলক বিচারে কিছুটা কম ও অস্ট্রিক বা গণ্ডোয়ানা বা রাঢ়ীয় সভ্যতার প্রভাব তুলনামূলক বিচারে অনেকখানি বেশী।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে ত্রিহোত্রীয় ভূমি ও মগধভূমির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ত্রিহোত্রীয় ভূমির মানব দেহে অস্ট্রিক প্রভাব কম, মঙ্গোল–প্রভাব সে তুলনায় কিছুটা বেশী। খুৰ বেশী কালো লোক কম চোখে পড়ে। আর মগধ ভূমির মানুষে মঙ্গোল প্রভাব নেই বললেই চলে। খাঁদা নাকের মানুষ বড় একটা চোখে পড়ে না। কালো মানুষের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে বেশী। তবে প্রায় সৰাই উন্নতনাসা। ভাষাগত বিচারে ত্রিহোত্রীয় ভূমি (বিদেহ বা মিথিলা) ও মগধ একই মগধী গোষ্ঠীভুক্ত হলেও মৈথিলী ভাষা পূর্বী অর্দ্ধমাগধীসঞ্জাত। আর মগহী ভাষা পশ্চিমী অর্দ্ধমাগধীসঞ্জাত। দুইয়ের উচ্চারণের পার্থক্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তবু্‌ দুই–ই প্রাক্‌–গৌড়ীয় গাঙ্গেয় সভ্যতা।

সূচীপত্র

প্রাক্‌-গৌড়ীয় গাঙ্গেয় সভ্যতার শেষাংশ আমরা পাচ্ছি অঙ্গভূমিতে। অঙ্গদেশে এসে ত্রিহোত্রীয় বৈশিষ্ট্য ও মাগধী বৈশিষ্ট্য একাকার হয়ে গেছে। ওখানে তারা সান্নিধ্য পাচ্ছে গৌড়ীয় সভ্যতার। এই অঙ্গদেশীয় গাঙ্গেয় নদীসভ্যতা সাহেবগঞ্জের কাছে যেখানে গঙ্গা-পাহাড় কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে সেখান থেকে বিশুদ্ধ গৌড়ীয় সভ্যতা বা ব-দ্বীপীয় সভ্যতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। আর সেখান থেকে গঙ্গা হয়ে যাচ্ছে দক্ষিণবাহিনী।

হিমবান ৰললে-"আমি আর একটু বড় হয়ে এই জিনিসটা নিয়ে রিসার্চ করতে চাই। তবে আপনার কথা শুণে বেশ বুঝতে পারছি এ চর্চা বর্দ্ধমানের বোরহাটের ৰাড়ীতে বসে বা কলকাতার শ্যামপুকুরের বাড়ীতে বসে করা চলবে না। মাঠে ঘাটে ছুটোছুটি করতে হবে।”

আমি বললুম-"তুমি ঠিক বলেছ। এ সৰ কাজ কাগুজে বিদ্যেয় সম্ভব নয়। আর কোনখানেই এতটুকু ফাঁকি থাকলে চলবে না। ষোল আনা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। আর তাতে ষোল আনা ফলই পাওয়া যাবে।”

সুতনুকা বললে–"আচ্ছা দাদা, আমরা তো প্রায় কাশীর কাছাকাছি এসে পৌঁছোলুম। একটু পরেই মিটার গেজের বেনারস সিটি এসে পৌঁছোচ্ছে। এই যে অংশটায় এসে আমরা পড়ছি আপনি যাকে ৰললেন গাঙ্গেয় অববাহিকেয় সভ্যতার মধ্যমাংশ, এই এলাকাটিতে বৈদিক প্রভাব কেমন ছিল বা কতটা ছিল?"

আমি বললুম–“দেখো, ভাষাগত বিচারে আমি যতটা বুঝি **সংস্কৃতের জন্ম রাঢ়ভূমিতে।** কিন্তু যে প্রাচীন ভাষাকে আজকাল আমরা বৈদিক ভাষা বলি তা আর্যদের ভারতে আগমনের প্রথম ধাপটা ছিল সিন্ধু–সৌৰীর ও সপ্তসিন্ধু দেশ পর্যন্ত (শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, কাবুল ১৯২০ ও সিন্ধু)–এই সাতটি নদীকে নিয়ে সপ্তসিন্ধু.....পরবর্তীকালে এর নাম হয়ে যায় পঞ্জাব (পঞ্চ + আৰ) অর্থাৎ পাঁচ জলের দেশ। হিসাৰ থেকে সিন্ধু ও কাবুল নদীটিকে বাদ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল পাঁচটি নদী। এইটা হ'ল ভারতের বৈদিক প্রভাবের প্রথম ধাপ।

দ্বিতীয় ধাপে আর্যরা আরও কিছুটা দক্ষিণ–পূর্বে এসেছিল। যমুনা অববাহিকার উত্তরাংশে তাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল–অঞ্চলটির তারা নাম দিয়েছিল হরিৎধান্য (হরিৎধান্য >

হরিঅহান্য হরিহানা > হরিয়ানা)। এটাকে আমরা বলতে পারি বৈদিক প্রভাবের দ্বিতীয় ধাপ।

এরপরে তারা গঙ্গা–যমুনার অববাহিকা ধরে এল প্রয়াগ পর্যন্ত। এটাকে আমরা বলতে পারি বৈদিক সভ্যতার তৃতীয় ধাপ। তারপর আরও পূর্বদিকে গিয়ে তারা তাদের প্রভাব বিস্তার করলে উত্তরে গণ্ডকী ও দক্ষিণে শোণ–তীর পর্যন্ত। এটাকে বলতে পারি বৈদিক প্রভাবের চতুর্থ ধাপ। এই ধাপটিতেই সুপ্রাচীন কাশীরাজ্য। আমরা এখন সেই কাশী রাজ্যেই রয়েছি। লক্ষণীয় আরও এই যে প্রথম ধাপটিতে বৈদিকের যে কন্যা উদ্ভূত হয়েছিল তা পরিচিত ছিল পাশ্চাত্ত্য ও পৈশাচী প্রাকৃত–জাত ভাষাগুলিতে (যেমন পশ্তো, পঞ্জাৰী), বৈদিক তদ্ভব শব্দের ছড়াছড়ি। দ্বিতীয় ধাপটিতে অর্থাৎ হরিয়ানবী ভাষায় বৈদিক তদ্ভব শব্দের শতকরা হার কিছুটা কম। তৃতীয় ধাপে অর্থাৎ মাড়োয়ারী, হড়ৌতী, বুন্দেলী, বাঘেলী, অবধী ও ব্রজভাষায় বৈদিক তদ্ভব শব্দের হার কিছুটা কম। আর চতুর্থ ধাপের ভাষায় অর্থাৎ ভোজপুরীতে বৈদিক তদ্ভব শব্দের হার আরও কিছুটা কম তবে কেউ যেন একথা না ভাবেন যে, এই প্রভাব চতুর্থ ধাপে একেবারে শেষ হয়ে গেল। প্রত্যক্ষ বৈদিক প্রভাব এই চতুর্থ ধাপে শেষ হ'ল

বটে কিন্তু পরোক্ষ প্রভাব প্রাক্-গৌড়ীয় সভ্যতার তথা গোড়ীয় সভ্যতার অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে ভরে রইল ও ভ'রে রয়েছে।"

সুতনুকা বললে-"আমি ভাল ভাবে লক্ষ্য করেছি যে চতুর্থ ধাপের মানুষের চেহারা, গবাদি পশুর আকার ও দৈর্ঘ্য প্রাক্-গোড়ীয় ও গৌড়ীয় সভ্যতার এলাকা থেকে বেশ কিছুটা আলাদা।"

আমি বললুম-"তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ। এ অঞ্চলের মানুষের করোটির ধরণ-ধারণ প্রাক্-গৌড়ীয় সভ্যতার এলাকার মানুষের থেকে আলাদা। তৰে অঙ্গ এলাকায় এসে মানুষের কর্পর গৌড়ীয় এলাকার কর্পরের থেকে প্রায় অভিন্ন...... অর্থাৎ ভিন্নতা ধরাই মুস্কিল।

এলাহাবাদ থেকে কাশী মোটেই দূর নয়। খানিকক্ষণ পরেই দেখি মিটার গেজের বেনারস সিটি ইষ্টিশান এসে গেছে। হিমবান ভারী গলায় বললে-"মামাৰাবু, এবার তো আমাদের নাৰতে হবে, আবার কৰে আপনার সঙ্গে দেখা হৰে কে জানে। জিনিসটা ভারী ভাল লাগছিল।"

সুতনুকা ও হিমবান দু'জনেই আমাকে বার বার বর্দ্ধমান যাবার কথা বলতে লাগল। ওরা বললে-"আমি নাকি ৰৰ্দ্ধমানকে একেবারেই ভুলে গেছি। অথচ বর্দ্ধমানের সঙ্গে জড়ানো রয়েছে আমার কতই না স্মৃতি, কতই না সুখ-দুঃখে ভরা মমতামধুর গান।"

ওরা চলে গেল শহরের দিকে। আমার একান্ত সচিব এসে বললেন- "ঠিক পাশের কামরাতেই রয়েছেন তাঁর সমধী (বেয়াই মশাই)। তিনি ছাপরা যাচ্ছেন"।

আমি বললুম-"তোমার সম্বী যখন পাশের কামরায় রয়েছেন তখন তুমি কয়েকটা ইষ্টিশান তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করতে করতে যাও, আমার কোন অসুবিধা হৰে না। কাল ভোরেই একটা গঙ্গা-স্নানের যোগ। তাই সৰ যাত্রীরাই এখন বেনারস অভিমুখী। বেনারস থেকে মুজাফফরপুরের দিকে যাৰার লোক খুবই কম। তাই এ কামরাতে সম্ভবতঃ আমিই একমাত্র মুসাফির"।

একান্ত সচিব পাশের কামরায় বসলেন তাঁর সম্বীর কাছাকাছি। অনুমানে বুঝলুম, তিনি সম্ভবতঃ তাঁর সম্বীর সঙ্গে বসে ঘিয়ে ডুবিয়ে লিট্টি খাচ্ছেন।

গাড়ী হুইসল্ দিল.........চাকা নড়ছে। হঠাৎ চলতি গাড়ীতে দৌড়ুতে দৌড়ুতে ও হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এলেন সামরিক পোষাকে সজ্জিত একজন সুশ্রী ভদ্রলোক। ভদ্রলোক কামরায় উঠে দ্রুতপদে এলেন আমার কাছটিতেই। একটু পরে ভাল করে তাকিয়ে দেখি–আরে! এ যে আমার সেই পনের বছর আগে চন্দননগর বোড়ো–কালীতলাতে দেখা সেই ভগ্নীপতি অরূপরতন মিত্র....... সুতনুকার স্বামী। আমি তাকে বসতে ৰলেই বললুম–ব্যাপার কী অরূপ, অমন হন্তদন্ত হয়ে.... হাঁপাতে হাঁপাতে এই রাত ন'টায় আমার কাছে........ খালি কামরাতে! আমি যাচ্ছি মুজাফফরপুর। তুমি চলেছ কোথায়?"

অরুপ ৰললে–“এখন থেকে ঠিক পনের মিনিট আগে অর্থাৎ পৌনে ন'টার সময় হঠাৎ মনটা কেমন ছটফট করে উঠল, উদ্বেল হয়ে উঠল নানান ভাবে–ভাবনায়। ভাবলুম, যেভাবেই পারি আর যত তাড়াতাড়ি পারি আপনার কাছে আমাকে এক্ষুণি পৌঁছোতেই হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার মনের এই ছট্‌ফটানি, এই উদ্বেলতা আপনার কাছে এলেই শান্ত হবে। আমি এখন শান্তি চাই........শান্তি, সুখ চাই না, সমৃদ্ধি চাই না, চাই না এই বিপুলা ধরণীর সামান্যতম ঐশ্বর্য বা আভরণ, চাই শুধু শান্তি।”

অরূপ বসে পড়ল। সে তখনও একটু একটু হাঁপাচ্ছে।

আমি বললুম-"তোমার মনটা যখন ছটফট্ করে উঠল তখন তুমি কোথায় ছিলে?"

ও বললে-“এখান থেকে অনেক দূরে একটা সমুদ্রের ধারে।"

আমি বললুম-"অনেক দূরে ছিলে তো পনের মিনিটের মধ্যে এখানে এলে কী করে?"

ও ঠোঁটে একটু মিষ্টি হাসি এনে বললে- "তাড়াতাড়ি এলুম বলেই না এত হাঁপাচ্ছি। আপনার কাছে এসেই মনটা অনেকটা শান্ত হয়েছে। এখন যেন কেমন একটা শান্তি পাচ্ছি। আমি বললুম-"শান্তি-অশান্তি তো মনের জিনিস। তুমি বরং আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ বসে গল্পগুজৰ করো।"

ও বললে-"কিছুদিন আগে কার মুখে যেন শুণেছিলুম, আপনি অববাহিকেয় সভ্যতা নিয়ে কয়েকটা আলোচনা-চক্র করেছেন। জিনিসটা ঠিক কী তখন আমি তা বুঝিনি। তবে অনুমান করেছিলুম, নদী-অববাহিকার বিভিন্ন ধাপে সভ্যতার কেমন রকমফের হয় আপনি হয়তো সে সম্বন্ধে কিছু ৰলেছেন।

আমি বললুম–"তুমি কি তখন ব্রিটেনে ছিলে?"

সে বললে–“হ্যাঁ আমি ব্রিটেনে ছিলুম।"

অরূপ ৰলল–"আপনি তো জানেন, ব্রিটেন একটি ছোট্ট দেশ। এর যে কোন একটা জায়গা থেকে সমুদ্র পঞ্চাশ মাইলের বেশি দূরে নয়। তাই সে দেশে বড় কোন নদী থাকতেই পারে না। অর্থাৎ নদীর উৎস–স্থল থেকে সমুদ্রের দূরত্ব বেশি হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।” তবু ওখানকার কয়েকটি নদীর গতিপথ ধরে ধরে এগিয়ে দেখেছি, উজানের স্থানিক সভ্যতার সঙ্গে ভাটির স্থানিক সভ্যতার তফাৎ রয়েছে, তফাৎ রয়েছে কথ্য ভাষাতেও। এই দেখুন না টেস্ নদীর কথা। টেস্ কোন বড় নদী * নয়–দৈর্ঘ্যেও বড় নয়, প্রস্থেও বড় নয়। টেম্সসের যে অংশে জাহাজ চলাচল করে সে অংশটা ৰাস্তবিক পক্ষে নদী নয়, সমুদ্রেরই খাড়ি। যেমন আমাদের ক্যানিংয়ের কাছে মাতলা নদী। মাতলাকে অনেকে হয়তো ভাববেন খুৰ চওড়া প্রকাণ্ড বড় নদী। অনেকেই হয়তো ভাবৰেন প্রাচীনকালে ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গা থেকে নির্গত যমুনার দক্ষিণমুখী শাখা বিদ্যাধরী দক্ষিণ দিকে গিয়ে ও গঙ্গার দক্ষিণ–পূর্বাভিমুখী শাখানদী পিয়ালী কিছুদূর যায়ার

পরে দু'য়ে মিলে প্রাচীনকালে মাতলা নদীর সৃষ্টি হয়েছিল। আপাতঃদৃষ্টিতে কথাটা যথার্থ ৰলে মনে হলেও বিদ্যাধরী আর পিয়ালীর মিলিত জলধারা কতটুকু? আসলে মাতলা হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে–পড়া ব্যাকওয়াটার বা খাড়ি, ইংরেজীতে যার জন্যে যথার্থ ভাষা হচ্ছে 'estuary'। টেন্সের ভাটি অংশ কতকটা ঠিক সেই ধরণের। তা সে যাই হোক, টেমস্ নদী ধরে যত ভাটির দিকে যাওয়া যায় ততই প্রভাব বেশী এ্যাংলো–স্যাক্সন ও নর্মান ভাবধারার...... এর মধ্যে আবার নদীর দক্ষিণ পার বরাবর থেকে শুরু করে ডোবার প্রণালী ও ইংলিশ চ্যানেলের উপকূল ভাগ ধরে গেলে ফল্গুধারার মত আজও রয়ে গেছে নর্মান প্রভাবের আধিক্য। আবার ভাটির দিকে নদীর উত্তর পারের দিকে ও উপকূল ধরে গ্রীস্ত্রীর দিকে গেলে নর্মান প্রভাবের চেয়ে এ্যাংলো–স্যাক্সন প্রভাব বেশি। গ্রীস্ত্রী ধরে উপকূলের দিকে গেলে নর্মান প্রভাব খুৰ নগণ্য হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে নর্মান্ প্রভাব বেশী সেখানকার কথ্য ভাষায় লাতিন–সঞ্জাত তদ্ভব শব্দ বেশী। যেখানে এ্যাংলো–স্যাক্সন প্রভাব বেশী সেখানে লাতিন তদ্ভব তুলনামূলক বিচারে কম। উচ্চারণগত পার্থক্যও (intonation) কাণে ধরা পড়ে। ওই টেস্ নদীরই উজানের দিকে গেলে অথবা পশ্চিম মুখে ওয়েশের দিকে গেলে প্রাচীন ব্রাইটন প্রভাব উপেক্ষণীয়

নয়। কথ্য ভাষার ব্যাপারেও তাই। ওয়েলশ্ ভাষা এই কারণে একটি ছোট্টো ভাষা হলেও কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে রয়েছে। মানুষের চেহারার তফাৎও খুৰ ৰেশী স্পষ্ট না হলেও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।

আমি বললুম, "তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ অরূপ। আমি দেখছি তুমি আর হিমবান অর্থাৎ তোমরা দু'পুরুষ ধরেই নদী–অববাহিকেয় সভ্যতায় বেশ আগ্রহশীল..... এতটা আমি ভাবতে পারিনি"।

অরূপ একটু লজ্জার সঙ্গে একটা হালকা হাসি হাসল।

অরূপ বললে, "আপনিই কোথায় যেন বলেছিলেন যে আমাদের রাঢ় আঞ্চলের মধ্য–বীরভূমের বক্রেশ্বর নদীর উভয় তীরে রয়েছে একটি ক্ষুদ্র হলেও স্থানিক সভ্যতা। এমনকি তার মন্দির–রচনা পদ্ধতিতেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে..... বৈশিষ্ট্য রয়েছে পোড়ামাটির (টেরাকোটা) কাজেও। .... এমনটি কথ্য ভাষায় ক্রিয়াগত রূপেও। দক্ষিণ বীরভূমের ওই রকমই একটি ছোট্ট নদী কোপাই (কুপিতা) নদীর অববাহিকাতেও ওই ধরণের কিছু কিছু স্থানিক সভ্যতার ছাপ রয়েছে। মনে হয় কেউ যেন বলেছিলেন যে বক্রেশ্বর অববাহিকার জল

পৃথিবীর একটি অন্যতম উৎকৃষ্ট মানের জল। তা ধাতব গন্ধক–সংকুপ্ত। কিন্তু কোপাই অববাহিকার জল ৰাঙলার অনেক জায়গার জলের চেয়ে উত্তম মানের হলেও বক্রেশ্বর অববাহিকার মত নয়। দু'টি ছোট ছোট নদী তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জলধারা নিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ছুটে চলেছে রাঢ় বাঙলার ভূমির ওপরে নৃত্যের তালে তালে প্রাচীনতম মানবসভ্যতার ছন্দগীতি বহন করে। তারা নানুর থানার এক প্রান্তে এসে মেলানপুরে যখন দুয়ে মিলে কুয়ে নদী নামে পরিচিত হ'ল তখন দুয়েরই স্থানিক সভ্যতারও মিলন হয়ে গেল। মেলানপুর সত্যি সত্যি সর্বতোভাবে দুইকে মিলিয়ে দিল। এমনটি খুৰ কাণ পেতে শুণলে কথ্য ভাষাতেও একটা বিশেষ ধরণের টান এসে গেল যে টান পশ্চিম বীরভূমে নেই। এ ছাড়া স্থানিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য তো এলই।

আমি বললুম–"তুমি ঠিকই বলেছ অরূপ। তোমার কথাগুলো আমার ভারি ভাল লাগছে। আমাদের বীরভূমে নদী অববাহিকাগত লক্ষণগুলি ভারী সুন্দরভাবে স্পষ্ট। আমাদের ডাঙ্গাল বীরভূমের কথ্য ভাষায় কোন বিশেষ ধরণের টান নেই। কথ্য ভাষাটি রাঢ়ী বাংলার একটি ঝরঝরে রূপ। কিন্তু

নামাল বীরভূমে সেই রাঢ়ী বাংলাতে রয়েছে একটা স্থানিক টান। এটা তুমি লক্ষ্য করেছ"।

অরূপ ৰললে,–"হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য করেছি। খয়রাসোল থানার সঙ্গে লাবপুর থানার ও খয়রাসোল থানার সঙ্গে ময়ূরেশ্বর থানার এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটা একটু চোখ মেলে তাকালেই বা একটু কাণ পেতে শুণলেই ধরা পড়ে যাবে"। অরূপ আরেকটু হেসে বললে, 'যদিও এটি সংস্কৃতির কথা নয় একটু হাসিরই কথা তবু.....'

আমি একটু হেসে অরূপের দিকে তাকালুম..... বললুম,– "তবু মানে"?

অরূপ বললে–"খয়রাসোলে, মানে ডাঙ্গাল বীরভূমে যেমন পোস্তর ছড়াছড়ি অর্থাৎ পোস্তর সাম্রাজ্য, নামাল বীরভূমে কিন্তু পোস্তর প্রভাব শতকরা ৫/৭ ভাগের মত কম। অর্থাৎ ডাঙ্গালে পোস্তর সাম্রাজ্য আর নামালে পোস্তর রাজত্ব"।

অরূপ হেসে ফেললে। আমিও সে হাসিতে যোগ দিলুম। এ কথার জের টেনে আমি বললুম–"রাঢ়ী সংস্কৃতির অন্যান্য প্রতীকগুলো যেমন ডিংলে, খেড়ো, বিরি কলাইয়ের ডাল,

ঝুমুর নাচ..... এরা কিন্তু ডাঙ্গাল–নামাল সর্বত্রই সমানভাবেই চলে, তাই না।"

অরূপ হাসতে হাসতে একটু কাঁপানো গলায় বললে, হ্যাঁ দাদা, সেটাও আমি লক্ষ্য করেছি। এই দেখুন না, যদিও আমি মধ্য রাঢ়ের বর্দ্ধমানে থাকি কিন্তু আমিও তো নামাল রাঢ় কোন্নগরের ছেলে। আমাদের ওখানেও কুমড়ো (ডিংলে) আর বিউলির ডালের (বিরি কলাই) দারুণ সমাদর। আর পোস্ত বাদ দিলে তো মানুষ আস্ত থাকতেই পারে না"।

আমি বললুম–"আচ্ছা অরূপ, তুমি তো ঠিক ন'টার সময় দৌড়োতে দৌড়োতে আমার কামরায় এলে। তা প্লাটফর্মে কতটুকু সময়ের জন্যে সুতনুকা আর হিমবানের সঙ্গে কথাবার্তা হ'ল"। অরূপ অৰাক বিস্ময়ে বললে– "ওরা! এখানে এসেছিল"!আমি বললুম–"হ্যাঁ, তুমি জানো না। ওরা তো এলাহাবাদ সিটি থেকে বেনারস সিটি পর্যন্ত আমার সঙ্গে এই কামরায় এসেছে। তারপর ওরা তাড়াতাড়ি চলে গেল কাশী শহরে। সকালের দিকে কাশীতে থেকে সন্ধ্যের দিকে যে কোন গাড়ীতে বর্দ্ধমান রবাণা হয়ে যাবে যাতে বুধবার ভোরের দিকে বর্দ্ধমান পৌঁছোতে পারে। ওরা বললে–তোমার বুধবার ভোরে দমদম বিমান বন্দরে পৌঁছোবার কথা।

তারপর লোক্যাল ট্রেনে বর্দ্ধমান পৌঁছোতে দশটা বাজবে। ৰাড়ীর চাবি ওদের কাছে। ঠিক সময় মত না পৌঁছোলে তোমার অসুবিধা হবে। তাই ওদের যে কোন ভাবে হোক বুধবার ভোরে বর্দ্ধমান পৌঁছুতেই হবে।

অরুপ বললে–“কই না তো আমার সঙ্গে ওদের বেনারস সিটি ইষ্টিশানে দেখা হয়নি। তবে হ্যাঁ, ওদের কথাগুলো ঠিকই। আমার বুধবার সকাল দশটা ৰর্দ্ধমান পৌঁছবার কথা।

একটু থেমে অরুপ ৰললে–কিন্তু যে ট্রেন মঙ্গলবারের শেষ রাত্রে অথবা বুধবারের সকালে বর্দ্ধমান পৌঁছোৰে তেমন কোন ট্রেনে ওদের বর্দ্ধমান না যাওয়াই উচিত। আমার মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ করছে"।

আমি বললুম–"তোমার মন যখন খুঁৎ খুঁৎ করছে তখন ওদের কোন মতেই উচিত হবে না তেমন কোন ট্রেনে বর্দ্ধমান যাওয়া। তুমি বরং গাড়ীর আগামী বিরতিতে নেবে পড়ো। আর যে কোন রকমেই হোক এখনই কাশী শহরে চলে যাও। ওরা সম্ভাব্য যে সব স্থানে থাকতে পারে সেই সকল জায়গা খোঁজ করোগে আর ওদের বর্দ্ধমান যাওয়া থেকে বিরত করো। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার পর আর

তাড়াতাড়ি বৰ্দ্ধমান যাবার দরকার থাকবে না। সবাই মিলে দু'চার দিন কাশীতে থেকে তারপর ধীরে সুস্থে সুবিধাজনক ট্রেনে বৰ্দ্ধমান যেও"।

সে বললে–ঠিক কথা বলেছেন........ ঠিক কথা বলেছেন।

গাড়ীতে গতি একটু কমে এল...... নিশ্চয় সামনে কোন ইষ্টিশান আসছে। অরুপ ঝোড়ো কাকের মত দৌড়ে দরজার কাছে গেল আর গাড়ী থামতে না থামতে অর্থাৎ চলন্ত গাড়ী থেকেই লাফিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেৰে পড়ল। তার এই উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ ছিল। ইষ্টিশানে গাড়ী থামতেই আমার একান্ত সচিব আমার কামরায় ছুটে এলেন। তাঁর সমধীজীর সঙ্গে ঘিয়ে ডুবিয়ে লিট্টি খাওয়া শেষ হয়েছে। তারপর সমধীজী তাঁকে পুরির সঙ্গে কড়ীৰড়িও খাইয়ে দিয়েছেন। শেষ পাতে ছিল মাখানার ক্ষীর। একান্ত সচিব আমার কাছটিতে এসে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন–"কোন তক্লিফ হয়নি তো।" আমি বললুম "না তক্লিফ তো একদম ছিলনা।"

আমাদের গাড়ী চলেছে পশ্চিম থেকে পূর্বে– প্রাচীন কাশী রাজ্যের সীমানার মধ্য দিয়ে। হিমবানকে বলেছিলুম, "এটাই ছিল আর্যত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাবের শেষ ধাপ। আর্যদের ভারতে

আগমনের চতুর্থ চরণে কাশীকেই আর্যাবর্তের সীমানা নগর বলে গণ্য করা হত। সেকালে আর্যাবর্তের পূর্ব সীমানা হিসেবে ধরা হত সরযূ নদীকে। এই সরযু নদী যে জলধারা বয়ে আনত কেবল আর্যত্বেরই প্রভাব তা নয়, তার সঙ্গে মিশে থাকত মঙ্গোল ও কিছুটা অস্ট্রিক প্রভাব। তাই সরযু নদীর পূর্ব তীরকে অনার্য ভূমি হিসেবে গণ্য করা হত। পরবর্তীকালে অবশ্য এই সীমানা আরও একটু দীর্ঘায়িত করে গণ্ডক নদীকে (নারায়ণী–গণ্ডক) পূর্ব প্রত্যন্ত বলে ধরা হয়েছিল। সেকালের কান্যকুজ ব্রাহ্মণেরা অনার্যভূমি মনে করে সরযূ নদী পার হতেন না। ভয় পেতেন তাতে তাঁদের আর্যত্ব হয়তো ক্ষুণ্ণ হবে। উর্বর ভূমি আকর্ষণে যে সকল কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ পরবর্তীকালে সরযু নদী পার হলেন তাঁরা কান্যকুব্জ সমাজে কতকটা আপাংক্তেয় হয়ে গেলেন। তাঁদের আর কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বলে পরিচিতি রইল না, তাদের পরিচয় হ'ল সরযূপারী ব্রাহ্মণ বলে।

পাঠান যুগে আর্যাবর্তের শেষ সীমা ছিল গাজীপুর জেলা। সেকালে উত্তর ভারতে মুখ্যতঃ ছিল তিনটি সুৰা–পূর্ব সুৰা ৰাঙ্গাল, উত্তর–পশ্চিমে সুৰা পঞ্জাব ও মাঝখানে ছিল হিন্দোস্তান (Hindostan)। আজও ৰাঙলা ও পঞ্জাবের

লোকেরা ভারতের এই অংশের মানুষকে হিন্দুস্তানী বলে থাকেন। কেউ কেউ ভাবেন, হিন্দোস্তান বলতে যখন গোটা ভারতকে বোঝায় তখন একটা বিশেষ অংশের লোকদের হিন্দুস্তানী বলা ভুল–না, মোটেই ভুল নয়। একথাটা বলা হয় প্রাচীনকালে হিন্দোস্তান প্রদেশের অধিবাসীদের জন্যে। হিন্দোস্তান বলতে সারা ভারতকে বোঝায় এই ৰোধ নিয়ে নয়।

মোগল আমলে আকবর যখন তাঁর সাম্রাজ্যকে পনেরটি সুৰায় বিভক্ত করেন তখন হিন্দুস্তান সুবার উত্তরাংশের নাম হয় অবধ (Oudh) ও দক্ষিণাংশের নাম সুৰা আগ্রা। গাজীপুর ছিল ওই সুৰা আগ্রার শেষ প্রত্যন্ত। এখন গাজীপুরের পূর্বে রয়েছে বলীয়া জেলা (বল্মীক)। সেকালে এই বলীয়া জেলা ছিল। এটা ছিল গাজীপুরেরই একটি তহশিল্। যেমন সেকালে দেওরিয়া জেলা ছিল না, ওটি ছিল গোরক্ষপুরেরই একটি তহশিল্। ইংরেজরা আগ্রা ও অবধ প্রদেশ দু'টিকে জয় করে তাদের মিলিয়ে দিয়ে নাম করে দিয়েছিলেন আগ্রা ও অবধ সংযুক্ত প্রদেশ (United Provinces of Agra and Oudh) সংক্ষেপে U.P.। রাজধানী করলেন এলাহাৰাদকে। ইংরেজ রাজত্বের শেষের দিকে রাজধানী এলাহাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌয়ে স্থানান্তরিত হ'ল। যাই হোক, এই সরযূ নদীর

অববাহিকায় মঙ্গোল ও অস্ট্রিক ছাপ আর্যত্বের ওপর বেশী পড়ে গেল। তবে পরবর্তীকালে অনেক আর্য সরযূ-নদী পার হয়ে আসেন ও গণ্ডকী তীরকে আর্যাবর্তের প্রত্যন্ত বলে গণ্য করতে থাকেন। এই গণ্ডকী অববাহিকার পশ্চিমাংশ শাক্যারণ্য, ও পূর্বাংশ বিদেহ বা মিথিলা নামে খ্যাত হ'ল। এই বিদেহ বা মিথিলা আর্য-উপনিবেশ ৰলে গণ্য হত না। আমিও একে বলছি প্রাক্-গোড়ীয় গাঙ্গেয় অববাহিকেয় সভ্যতা। রাজা মিথি এই বিদেহ অংশ দখল করেন ও ভূমিকে পবিত্র করার জন্যে ত্রিহোত্রীয় যজ্ঞ (তিনজন হোতার দ্বারা যজ্ঞ) করেন, ভূমিকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেন। ত্রিহোত্রীয় যজ্ঞের দ্বারা যে ভূমি পবিত্রকৃত হয়েছিল লোকে তার নাম রেখেছিল ত্রিহুত। এই শাক্যারণ্য আর্যদের দ্বারা খুব বেশী আদৃত না হলেও ৰৌদ্ধ যুগে যথেষ্ট সমাদার পেয়েছিল। ভগবান বুদ্ধ কয়েকবারই এখানে এসেছিলেন। শাক্যারণ্য থেকেই পরবর্তীকালে নাম হয়ে দাঁড়ায় শারণ (শাক্যারণ্য > শাক্যারণ > শারণ)। পরবর্তীকালে লোকে ভুল করে বানান লিখত 'সারণ'। এই শাক্যারণ্যের উত্তরে ছিল প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ চম্পকারণ্য। রামায়ণে এই চাম্পকারণ্যের উল্লেখ আছে (চম্পকারণ্য > চম্পাআরণ্য > চম্পারণ)। এই শাক্যারণ্য ও চম্পকারণ্য হচ্ছে নারায়ণী-গণ্ডক অববাহিকার পশ্চিম তীরে। পূর্ব তীরে বিদেহ বা

মিথিলা বা ত্রিহুত। রাজা মিথি কর্তৃক ধৃত বা বাহিত ইত্যর্থে মিথি + লা + ড স্ত্রিয়াম্ 'আ' = মিথিলা। ৰৌদ্ধযুগে এই শাক্যারণ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল হথীগ্রাম (সংস্কৃতে হস্তীগ্রাম) বুদ্ধ কয়েকবারই এখানে এসেছিলেন। এই হথীগ্রাম*

* গ্রামটি এত অবস্থাপন্ন ছিল যে সেখানকার ঘরে ঘরে হাতী বাঁধা থাকত,

বর্তমানে হাথোয়া নামে পরিচিত। ইংরেজ আমলে যে কয়েকটি বড় বড় জমিদারি ছিল তার মধ্যে এই হাথোয়া এষ্টেট ছিল অন্যতম।

এসে গেল গণ্ডকী নদী–নারায়ণী–গণ্ডক। এই গণ্ডকী নদীর তীরেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ভারতের সবচেয়ে বড় পশুমেলা...... হরিহরক্ষেত্রের মেলা। মেলাভূমির অনতিদূরেই রয়েছে শোণপুর রেলওয়ে ইষ্টিশনটি। শোণপুরে গণ্ডকী নদীর ব্রীজ পার হয়ে আমরা পৌঁছোলুম মিথিলা ভূমিতে। মোগল যুগে ও ইংরেজ যুগের গোড়ার দিকে বাঙলার মিথিলা বিভাগটিতে তিনটি জেলা ছিল ত্রিহুত, চম্পারণ ও শারণ। চম্পারণের সদর ছিল মোতিহারি, শারণের ছাপরা ও ত্রিহতের মুজাফফরপুর। মুজাফফরশাহের নাম থেকে মুজাফফ্রপুর শব্দটি এসেছে। জেলাটি ছিল অতি বৃহৎ। ইংরেজ যুগের

সূচীপত্র

প্রথমাংশ পর্যন্ত এই উর্বর জেলাটিতে ছিল বিরাট বিরাট অরণ্য। সেই অরণ্যে ছিল রকমারি ফ্লোরা (বৃক্ষলতা) ও ফনার (জীবজন্তু) প্রাচুর্য-ছিল হরেক রকমের নীলগাই, বাঘ, অজগর, হরিণ ও কুমীর। মুজাফফরপুর শহরের উত্তরাংশে লখনদেই নদীর পরিত্যক্ত গতিপথে আজ যে সুবৃহৎ বিলটি রয়েছে। (স্থানীয় ভাষায় 'ম-অ-ন') সেটি সেকালে ছিল আরও অনেক বড় ও চারিপাশে ছিল সুবিস্তীর্ণ অরণ্য-ফ্লোরা ও ফনাতে সমৃদ্ধ। এই অরণ্যের বৃহদংশ ছিল দ্বারভাঙ্গা মহারাজার জমিদারিতে আর কিছু অংশ শূরষণ্ড রাজাদের জমিদারিতে, কিছুটা ছিল ৰেতিয়া মহারাজার জমিদারিতে। মানুষ তার প্রয়োজনের খাতিরে ও লোভের বশে আজ সে অরণ্য শেষ করে দিয়েছে। এই ত্রিহুত জেলাতে বিশেষ করে অরণ্য বলতে আজ আর কিছুই নেই। এই ত্রিহুত জেলার বৈশালীতে (এই বৈশালী ছিল লিচ্ছবীর দেশ-বিশ্বের প্রাচীনতম সাধারণতন্ত্র-oldest republic of the world) এক বৈশ্য পরিবারে জন্মেছিলেন বর্দ্ধমান মহাবীর-পিতার নাম সিদ্ধার্থ, মাতার নাম ত্রিশলা।

এই ত্রিহুত জেলা তথা মিথিলা আংশিকভাবে নারায়ণী গণ্ডক, আংশিকভাবে বুড়িগণ্ডক ও লক্ষ্ণদেই নদীর

অববাহিকায় অবস্থিত। এতে আর্যাবর্তের প্রভাবের চেয়ে গৌড়ীয় প্রভাব অনেক গুণ বেশী। লিপিও বাংলা। লক্ষণীয় এই যে বুদ্ধ ও মহাবী দুজনেই এমন স্থানে জন্মেছিলেন যে স্থানে আর্য-প্রভাব তুলনামুলক বিচারে কম ছিল। যাইহোক, এই ত্রিহুত জেলাটি ছিল আয়তনে বেশ বড়। ইংরেজরা এটাকে দু'টুকরো করে পশ্চিমাংশের নাম দেন মুজাফফরপুর জেলা যার সদর মুজাফফরপুরই থেকে যায় ও পূর্বাংশের নাম দেন দ্বারভাঙ্গা জেলা যার সদর করেন তখনকার দিনের লাহেরিয়াসরাই নামে একটি গ্রাম (আজ লাহেরিয়াসরাই একটি প্রকাণ্ড বড় শহর যা দ্বারভাঙ্গা শহরের গা ছুঁয়ে রয়েছে)। এই মুজাফফরপুর জেলা থেকে তৈরী হয়েছে তিনটি জেলা- সীতামারী, 'মুজাফফরপুর ও বৈশালী (হাজিপুর)। এই সেই মুজাফফরপুর মোগল যুগে সেখানকার লোকদের সেকালকার সুবাৰাঙ্গালের মধ্যে সবচেয়ে শিষ্টাচারসম্পন্ন ৰলে গণ্য করা হত। আর দ্বারভাঙ্গা জেলা থেকে হয়েছে মধুবনী (যেখানকার বনে মধুর প্রাচুর্য্য), দ্বারভাঙ্গা (দড়িভঙ্গা শাহের নাম থেকে। মৈথিলী ভাষায় শহরটিকে বলা হয় দইড়ভঙ্গা-যা ৰানানে লেখা হয় দড়িভঙ্গা) ও সমস্তিপুর (সমস্তিনারায়ণ রায়ের নাম থেকে)। নারায়ণী-গণ্ডক, বুড়ি গণ্ডক, লখনদেই, বাগমতী, কমলাৰালান ও কোশী অববাহিকা থেকে যে মঙ্গোল-তান্ত্রিক

সভ্যতা নেৰে এসেছিল তাতে পুষ্ট হয়েছিল প্রাক্-গৌড়ীয় অববাহিকা সভ্যতার মৈথিলী শাখা। রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহের সময় থেকে নেপালে গোর্খা রাজত্ব শুরু হয়। গোর্খারা ত্রিহুত জেলা জয় করে হাড়িপুর পর্যন্ত এগিয়ে আসেন। তারপরে তাঁরা ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন (ব্রিটিশ সেনাপতি ছিলেন জেনার‍্যাল অক্টোরলোনি যাঁর নামে কলকাতার ইংরেজরা একটি বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। আধুনিক কালে ইতিহাস অনভিজ্ঞ মানুষ এর নাম পাল্টে শহীদমিনার করে দিয়েছে)। ইংরেজের সঙ্গে তাঁদের সন্ধি হয় সুগৌলিতে (চম্পারণ জেলা)। এই সন্ধির সর্ত অনুযায়ী ইংরেজরা গাড়বাল ও কুমায়ুন নেপালের হাত থেকে পান যা তাঁরা আগ্রা-অবধ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে দেন আর ফেরৎ পান চম্পারণ ও ত্রিহুত জেলার অধিকাংশ অঞ্চল। তবে ত্রিহুতের উত্তর দিকের কিছু অংশ নেপালেই থেকে যায় ও আজও আছে। মিথিলার প্রাক্তন রাজধানী জনকপুর সেই অংশেই অবস্থিত। এটি এখন নেপালে। জনকপুরী খয়েরের নাম ৰাঙলার অনেকে শুণেছে।

আমি মুজাফফরপুরে নেবে পড়লুম। ওখানে দারুণ কর্মব্যস্ততার মধ্যে দু'দিন কাটল।

তারপরে প্রায় এক হপ্তা বাইরে থেকে অনেকগুলে টুকরো টুকরো স্মৃতি একসঙ্গে গেঁথে নিয়ে ৰাড়ী ফিরলুম। ৰাড়ী পৌঁছে দেখি, টেবিলের ওপর একটা চিঠি–লিখেছে ৰৰ্দ্ধমান থেকে হিমবান। হিমবান লিখেছে–"মামাৰাৰু, আমরা এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা নিয়ে বৰ্দ্ধমানে পৌঁছেছি। কাশী থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যের দিকে রবণা হয়েছিলুম। জানতুম মঙ্গলবারের একেবারে শেষ রাত্তিরে অথবা বুধবারের ভোরে বৰ্দ্ধমান পৌঁছে যাৰ। মঙ্গলবার শেষ রাত্তিরে আমি আর মা একরকম তৈরী হয়েই গাড়ীতে বসে নদী–সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলুম। এমন সময় অনুভব করলুম একটা প্রচণ্ড ধাক্কা–একটা জোরালো আবাজ। অমন আবাজ আমি জন্মে কখনও শুণিনি। নিমেষের মধ্যে আমাদের গাড়ী ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে....... চারিদিকে আবাজ আর আবাজ........ আবাজ আর আবাজ...... মানুষের আৰ্তনাদ........ এক নিমেষের মধ্যে সব কিছু ওলট.... পালট হয়ে গেল। গাড়ী ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। আমি আর মা গাড়ী থেকে ছিটকে ৰাইরে পড়ে গেলুম। গাড়ীর অঙ্গ–প্রত্যঙ্গগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। লটৰহর চারিদিকে ছিটকে যাচ্ছে। আমরা বুঝলুম–দুর্ঘটনা হয়েছে......

সূচীপত্র

মৃত্যু অনিবার্য। আমরা দু'জনে যেখানে গিয়ে পড়লুম, দেখলুম তারই ওপর ভেঙ্গে পড়ছে গাড়ীর একটা প্রকাণ্ড অংশ। আমরা ভয়ে চীৎকার করে উঠলুম কিন্তু তারপর......। হঠাৎ আমাদের দু'জনেরই মনে হ'ল ৰাৰা (শ্রীঅরুপরতন মিত্র) যেন ছুটে আমাদের কাছে চলে এলেন। একটা হাতে আমার হাত, আর একটা হাতে মায়ের হাত ধরে আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দিলেন খানিকটা দূরে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমি আর মা বেঁচে গেলুম। তারপরে কী হয়েছে বা হয়েছিল জানি না, কারণ আমরা দু'জনেই অজ্ঞান হয়ে গেছ্‌লুম। ভোরের আলো গায়ে মুখে লাগায় আমাদের জ্ঞান ফিরে এল। দেখি আমরা দু'জনে পড়ে রয়েছি রেললাইনের কাছে একটা কাটা ধানের ক্ষেতের এক পাশে একটা খড়ের গাদার ওপর। খড়ের গাদায় এসে পড়ায় আমাদের তেমন কোন গুরুতর আঘাত লাগেনি। হাড়ে একটু ব্যথা হয়েছে মাত্র। গ্রামের লোকেরা আমাদের ঘিরে রয়েছে। তাকিয়ে দেখি একটু দূরে হৃদয়বিদারক কাতরোক্তি।

স্থানীয় লোকেরা অত্যন্ত সহৃদয়। ৰৰ্দ্ধমানের মানুষ তো। লোকের দুঃখ দেখে একটুতেই কেঁদে ফেলে। চারিপাশ থেকে মানুষেরা কী করলে আমাদের ভাল হয় জিজ্ঞেস করছিল।

আমাদের জন্যে সবকিছু করতে তারা তৈরীও ছিল। আমরা বললুম–আমাদের ৰাৰা এখানে আছেন, তাঁকে আমাদের কাছে ডেকে দিন। তাঁরা খুঁজে এসে বললে, কই না তো! অরূপরতন মিত্তির নামে কেউ এখানে নেই। আমরা গ্রামের লোকের সাহায্যে অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালুম। আমরাও খোঁজ করে দেখলুম, না ৰাৰা এখানে নেই বা আসেননি।

রেলের সাহায্যকারী গাড়ী তখন ৰর্দ্ধমান থেকে এসে পৌঁছেছে। আমরা তাঁদের জানিয়ে ৰর্দ্ধমানে ফিরে এলুম। জায়গাটা কিন্তু বর্দ্ধমানের খুবই কাছে। তাই বাড়ী ফিরতে মোটেই অসুবিধে হ'ল না। –"আচ্ছা মামাৰাৰু, আমরা ৰাচলুম কী করে? একেই কি বলে ভাগ্য? একেই কী বলে কপালের লিখন?"

চিঠি পড়ে থ' হয়ে গেলুম। হিমবান আরো লিখেছে–“বাৰা এখনও বর্দ্ধমানের ৰাড়ীতে ফেরেননি। বিমান বন্দরে খোঁজ নিতে গেছলুম। ওখানে গিয়ে জানলুম, যে প্লেনে ৰাৰার আসার কথা সেই প্লেনটা আজও আসেনি। কেন আসেনি জিজ্ঞেস করায় বিমান–কর্তৃপক্ষ বললেন, তাঁদের কাছে কোন খবরই নেই। সামরিক কারণে তাদের জানা সম্ভবও নয়। কেন বিমানটি এখন পর্যন্ত আসেনি সামরিক বিভাগ না

জানালে তাঁদের পক্ষে কিছু জানা মোটেই সম্ভব নয়। প্লেনটিতে তাদের আরোহী ও মালপত্র দুই-ই ছিল। তাই তাঁরা বিমানটির না আসার কারণ জানার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

চিঠি পড়া শেষ করলুম। এমন সময় শুণলুম রেডিওতে খবর বলছে। খবরে বলা হচ্ছে, প্রায় এক হপ্তা আগে সোমবার রাত্রি পৌনে ন'টায় ভূমধ্যসাগরের তীরে একটা প্রচণ্ড রকমের বিমান-দুর্ঘটনা হয়ে গেছে। সামরিক কারণে খবরটি এর আগে প্রচারিত ও প্রসারিত করা সম্ভব হয়নি। বিমানের সমস্ত যাত্রী নিহত হয়েছেন। বিমানে কুড়িজন ভারতীয় যাত্রী ছিলেন। তাঁদেরও নাম-ধাম সংগ্রহ করা হয়েছে। তৰে মৃতদেহগুলি এমন ভাবে পুড়ে গেছে যে তাদের সনাক্তকরণ সম্ভব হয়নি। এই ভারতীয় যাত্রীদের নাম- ১)...........২)..........৩.......... যাত্রীদের মধ্যে কলকাতার ছিলেন একজন। তার নাম শ্রীঅরুপরতন মিত্র।

আমি বিস্ময়ে হতবাক্। সময় মিলিয়ে দেখলুম, সোমবার রাত্রি ন'টার সময় বেনারস সিটি ইষ্টিশানে অরুপরতন দৌড়ুতে দৌড়ুতে ও হাঁপাতে হাঁপাতে আমার কামরায়

উঠেছিল। বলেছিল পনের মিনিট ধরে অর্থাৎ পৌনে ন'টা থেকে তার মনে বড় রকমের ছট্‌ফটানি চলছে..........মন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। শান্তির খোঁজে সে আমার কাছে এসেছিল। সে অনেক দূর থেকে এসেছিল, তাই হাঁপাচ্ছিল।

খবরটা শুণে আমি কী করৰ ভেবে পাচ্ছি না।

হিমবানের চিঠির আমি কী জবাব দোৰ? (শব্দচয়নিকা)

মানবতা নবচিন্তাধারার চউকাঠে

সুপ্রাচীন অতীতে মনুষ্যসৃষ্টির আদিপর্বে–সেটা আজ থেকে অনুমানিক দশ লক্ষ বৎসর আগে–যখন এই পৃথিবীর বুকে প্রথম মানব শিশুর আবির্ভাব হয়েছিল, তখন তাদের মস্তিষ্কের আধার অর্থাৎ ক্রেণিয়াম ছিল খুবই ছোট। মস্তিষ্কের সামর্থ্য ছিল খুবই নগণ্য। মুষ্টিমেয় স্নায়ুকোষের দ্বারা তাদের চিন্তন শক্তি ও চিন্তাতরঙ্গ উৎপন্ন করার সামর্থ্য ছিল অত্যন্ত সীমিত

–আর যে স্বল্প পরিমাণ স্নায়ুতন্ত্ব ছিল গভীর মানবীয় ভাব–ভাবনা ব্যক্ত করবার পক্ষে তা ছিল একেবারে অপর্যাপ্ত। আজকের মানুষ যথেষ্ট উন্নত। তাদের মস্তিষ্কের প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। তাদের স্নায়ুকোষ–ও পূর্বের তুলনায় বহু উন্নত আর এই উন্নত মানব মস্তিষ্ক তথা স্নায়ুকোষ অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবধারাকে সহজেই ব্যক্ত করতে পারে।

একটু আগেই বললুম যে মানবজাতি আজ এক নবযুগের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। এই সময়ে আমরা কোনমতেই আমাদের মূল্যবান সময় অপচয় করতে পারি না। মানুষ জাতির মধ্যে যত শক্তি–সামর্থ্য নিহিত রয়েছে তার সৰেরই আজ সর্বাধিক উপযোগ ঘটাতে হৰে। মানব উৎপত্তির প্রথম স্তরে, অর্থাৎ মানব সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ ও পশুর মধ্যে তফাৎ ছিল না বললেই চলে। সে যুগের এপ্–ম্যান (অনুন্নত মানুষ), প্রোটো–এপ্, আর মানুষের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা ছিল অস্পষ্ট। দৈহিক ব্যাপারে মানুষ ছিল প্রায় ৰানরবর্গীয় জীবের মতই। সে যুগের অবিকশিত মানুষের কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ছিল না; আধ্যাত্মিক জীবন তো ছিলই না।

সময় এগিয়ে চলল। মানবজাতিও কতকগুলি অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ধারা বেয়ে এগিয়ে চলল। মানব দেহের স্নায়ুকোষের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তার জগতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিল। তার দৈহিক ক্ষেত্রে স্নায়ুকোষের বিকাশ ঘটায় মানুষের ভাবরাজ্যে একটা বড় রকমের ওলট–পালট ঘটে গেল। এমন কিছু লোক এগিয়ে এলেন যাঁরা সমাজের নেতা বলে স্বীকৃত হলেন। আর এই ভাবেই মানব সমাজের বুকে বীর–পূজার (Hero worship) প্রবর্তন ঘটল। এটা মানব সভ্যতার গোড়ার দিকের কথা– মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রথম সূত্রপাত।

বলতে পারি আধ্যাত্মিকতার বিকাশও এই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। মানুষের মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটল। মানবিক মূল্যৰোধকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া শুরু হ'ল। এই ভাৰে মানুষজাতি এক নূতন স্বর্ণিম যুগে উপনীত হ'ল। যদিও তখন কোন সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক জীবন শুরু হয়নি, কিন্তু কিছুটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ততদিনে শুরু হয়ে গেছে।

ক্রমে সমাজ জীবনে আরও অনেক পরিবর্তন দেখা দিল। একের পর এক যুগ এল..........গেল। ইতোমধ্যে বহু ছোট–

বড় যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেল। এই সৰের সমাহারকেই বলতে পারি প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ইতিহাস।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধিকতার যুগ শুরু হ'ল..... কালক্রমে ৰৌদ্ধিক চর্চার পথ ধরে এসেছিল ৰৌদ্ধিক অপচয় (intellectual extravaganza)। সহজ সরল বিশ্বাসের পরিবর্তে মানুষের মনে ভাবজড়তা (dogma) বাসা বাঁধল। নানান কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাস, নানান ধর্মমত, কত শত মতবাদ গজিয়ে উঠল। অন্ধ-ধর্মবিশ্বাস মানুষের সমাজকে বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দিল। এই সমস্ত অন্ধ বিশ্বাস ও মতবাদের সঙ্গে মানুষের সামাজিক প্রগতির কোনও সম্পর্ক নেই। তারা সমাজে প্রভূত ক্ষতি করেছে, সমাজের মূল সংরচনা-বলতে পারি, সমাজের বৃহত্তর অংশটাই এই ভাবজড়তার কবলে পড়েছিল। এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমাজের মুখ্য ধারা। যারা এটাকে পছন্দ করত না, যারা যুক্তি-তর্কের পথে চলতে চাইত সমাজে অবাঞ্ছিত মানুষ ৰলে তাদের চিহ্নিত করা হয়েছিল।

আরও পরবর্তীকালে এই ভাবজড়তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল মানুষের বুদ্ধি-বিবেক, তার যুক্তি-ভিত্তিক মানসিকতা। উন্নত মস্তিষ্ক, উন্নত স্নায়বিক সংরচনা, উন্নত দৈহিক কাঠামোর অধিকারী মানুষ ভাবতে শুরু করল যে কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী, জাতি বা উপজাতির জন্যে কোন কিছু করাটা বড় কথা নয়-আমরা যা কিছু করৰ সকল মানুষের জন্যে করৰ, গোটা মানবজাতির জন্যে করব। কিন্তু এটাকেও আমরা শেষ কথা বলতে পারি না। মানব জীবনের এইটাই মূল আদর্শ হতে পারে না।

প্যালিওজোয়িক যুগের মাঝামাঝি এসে আজ আমাদের ভাবতে হবে, আমাদের করণীয়টা কী। সৃষ্টির বুকে মানুষ জাতিই কি সৰ কিছু? -না, তা হতে পারে না। এই বিশ্বটা কেবল মানুষকে নিয়ে নয়; অন্যান্য অনেক প্রাণী-জীবজন্তু, বৃক্ষলতা-এরাও তো রয়েছে, এদেরও বাঁচার অধিকার আছে।

আমাদের এই বিশ্বটা কেবল মানুষেরই বিশ্ব নয়-এই বিশ্ব সবারই। বিশ্ব-চরাচরের সকল সৃষ্ট জীবেরই বিশ্বের ওপর রয়েছে সমান অধিকার।

আমাদের এই যে যুগ, এটা হ'ল নব্যমানবতাবাদের যুগ, যে যুগে মানবতাবাদ সকল জীবের জন্যেই প্রাণরস যুগিয়ে যাবে। আমরা সকলের জন্যেই, আর সবাইকে নিয়েই আমাদের একটা নোতুন সামাজিক সংরচনা–নব্যমানবতাভিত্তিক একটা নোতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে কোন গড়িমসি করলে চলবে না। এই কাজে যদি আমরা বেশী দেরী করে ফেলি তাহলে মহতী বিনষ্টির করাল ছায়া আমাদের অস্তিত্বটাকেই বিপন্ন করে তুলবে। এ বিষয়ে আমাদের সজাগ থাকতে হবে–সতর্ক হতে হবে। আমাদের মূল্যবান সময়ের এক মুহূর্তও নষ্ট করলে চলবে না।

একটু আগেই ৰললুম, যে আজ মানবতা নব যুগের চৌকাঠে এসে পৌঁছেছে।এই যুগে নানান যুগান্তকারী ঘটনা ঘটতে চলেছে। তোমরা তোমাদের এই সংশোধিত দায়িত্ব ও কর্তব্যভার গ্রহণ করতে তৈরী আছ তো? মনে রেখো, মানব সমাজে ভাবজড়তার বা ডগমার যুগ শেষ হয়ে গেছে। সমস্ত মানবজাতির ভাবানুভূতি তথা মানস–প্রবণতা একই ধরণের। আর মহত্তর জীবন লাভের জন্যে যে পাথেয় প্রয়োজন, যে প্রস্তুতি দরকার তাও একই ধরণের। মানুষ মাত্রেরই চাহিদা ও তার প্রয়োজনও একই রকমের, কারণ মানব জাতি যে একটি

সত্তা! মানব সমাজ এক ও অবিভাজ্য। তাই এই উদ্দেশ্যের পূর্তির জন্যে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে। তাই সকলের সঙ্গেই জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলের কল্যাণের জন্যেই একটা সামাজিক সাম্যাবস্থা বজায় রাখতেই হবে। পৃথিবীর কোন প্রান্তেই খাদ্য বা পানীয়ের ঘাটতি ঘটতে দেওয়া চলবে না। আমাদের এই পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে আরও বেশী খাদ্য উৎপাদন করা যাবে, যেখানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রাচুর্য্য রয়েছে। তাই স্বচ্ছল দেশগুলি থেকে উদ্বৃত্ত যাবতীয় সম্পদ, অন্ন, জল প্রয়োজন বিশেষে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে বিলি করা যেতে পারে। পৃথিবীর কাউকে কোথাও অনাহারে মরতে দেওয়া হবে না। আমরা সৱাই সকলের জন্যে-বিশ্বের যাবতীয় সম্পদও সকলেরই জন্যেই।

এ যাবৎ ভুরি ভুরি শান্তির ললিতবাণী প্রচারিত হয়েছে, কত শত শাস্ত্রবাক্য নীতিকথা উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁরা এই তথাকথিত শান্তির ললিতবাণী শুণিয়ে গেছেন তাঁরা শান্তির বাণী পাঠের সময় অস্ত্রে শান দিতেও ভোলেন না-তাঁদের সঞ্চিত বারুদ স্তূপকে উত্তপ্ত রাখতে ভোলেননি। অর্থাৎ তাঁদের সেই শান্তির প্রয়াসের পেছনে যথার্থ

আন্তরিকতার অভাব ছিল। আজ আমরা আর শান্তির ললিত বাণী শুণতে চাই না। আজ আমরা যা চাই তা হ'ল সমগ্র মানুষ জাতির সার্বিক উন্নতি। আর মানুষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবজগতের–জড় ও চেতন সকলেরই উন্নতি ঘটবে। তাই আজ যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে মানব অস্তিত্বের অধিরোহণ অর্থাৎ মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। আমরা ভাবজড়তা চাই না, আমরা চাই অধিকতর বিচারশীলতা, যুক্তিপ্রবণ মানসিকতা যা মানুষকে পরম ধাম পরমপুরুষে পরিচালিত করবে। একমাত্র পরমপুরুষই হচ্ছেন সেই পরমধাম, শেষ ধাপ। তিনিই হচ্ছেন সব জীবের চরম তথা পরম আলম্বন।

ভূমাকেন্দ্র থেকে অহরহঃ অগণিত তরঙ্গরাজি উৎসারিত হয়ে চলেছে। প্রতিটি সংরচনার নিজস্ব তারঙ্গিক দৈর্ঘ্য রয়েছে, নিজস্ব ছন্দ রয়েছে। কিন্তু জীবের গতি যখন পরম পুরুষের দিকে তখন সমস্ত ছন্দই মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। নানান বর্ণ, নানান ছন্দ, নানান তারঙ্গিক দৈর্ঘ্য–তাদের ভিন্ন ভিন্ন সত্তা হারিয়ে চরম একত্বে সমাহিত হয়। আগেও বলেছি, আৰাৱ ৰলছি, লক্ষ্য বা আলম্বন (desideratum) একটিই–

অনেক নয়। ভেদাত্মক ৰহুত্ব বা নানাত্ব নয়। পরমধাম একটিই–একক ও অভিন্ন।

এই ধরণের নব্যমানবতাবাদই বিশ্বকে বাঁচাতে পারে, মানুষ জাতিকে পরিত্রাণ করতে পারে। তাই আজ আমাদের নব্যমানবতাবাদের জয়গান গাইতে হবে।

রাঁচী, ২৬ মে ১৯৮৩

মানব ইতিহাস ও সামূহিক মনস্তত্ত্ব

মানব ইতিহাস গড়ে ওঠে সামূহিক আকুতি বা সামবায়িক মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে। অতীতে ইতিহাস সম্বন্ধে জনগনের ধারণা ছিল এই যে ইতিহাস মানেই হ'ল কোন রাজা বা রাণী কিছু দিনের জন্যে রাজ্যশাসন করবেন, কয়েকটা যুদ্ধ পরিচালনা করবেন, –কোনটাতে জিতবেন, কোনটাতে হারবেন–কোথাও বা তারা শত্রুপক্ষকে হত্যা করছেন, কোথাও বা তারা নিজেরাই নিহত হচ্ছেন–এ সবেরই ঘটনাপঞ্জী। কিন্তু

আজকের ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজকাল ইতিহাস বলতে কেবল রাজা–মহারাজাদের ইতিহাস বোঝায় না। সাধারণ মানুষের ইতিহাসকেও বোঝায়। সাধারণ মানুষের এষণা, আকুতি, মনোজাগতিক চিন্তাধারা এ সবকিছুই ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়।

সুপ্রাচীন সমাজে নারী–পুরুষের সমানাধিকার ছিল। পরবর্তীকালে সমাজে নারীর গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় এক নূতন ধরণের সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হ'ল যাকে বলা যেতে পারে মাতৃগত (Matrilineal) ও মাতৃপ্রধান (Matriarchal) ব্যবস্থা। এর আরও পরবর্তীকালে দৈহিক শক্তির গুরুত্ব অন্যান্য শক্তির চেয়ে আরও বড় হয়ে দেখা দিল। স্বভাবতই নারীর চেয়ে পুরুষের দৈহিক শক্তি বেশী থাকায় তাদের গুরুত্ব গেল বেড়ে। এরই ফলশ্রুতিতে এক নূতন ধরণের সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হ'ল যাকে বলা যেতে পিতৃগত (Patrilineal) ও পিতৃপ্রধান (Patriarchal) সমাজ ব্যবস্থা। কিন্তু আজকের যুগে মানুষ অনুভব করছে যে বৌদ্ধিক শক্তির তুলনায় দৈহিক শক্তির গুরুত্ব কম। অতীতে মানুষ একটা হাতুড়ি চালাতে গিয়ে প্রচুর দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করত। কিন্তু আজকে একটা বৈদ্যুতিক হাতুড়ি একটা লোহার হাতুড়ির

চেয়ে শতগুণ বেশী শক্তিশালী। আর একটা বৈদ্যুতিক হাতুড়িকে একটা অতি সাধারণ ইলেকট্রিক সুইচ টিপে দিয়েই চালানো যায়। এটাই প্রমাণ করে যে আজ ৰৌদ্ধিকতার গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। হ্যাঁ, এখন প্রশ্ন হ'ল নারী জাতির জাগরণ ঘটৰে কি ভাবে? ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এখানে কয়েকটা কথা বলা দরকার মনে করছি। নারী জাগরণের ফলে আগামী দিনে নারী–পুরুষের সমানাধিকার আসবে। কেউ কারো চেয়ে ছোট বা ৰড় বলে গণ্য হবে না। অনাগত দিনগুলিতে যা সবচেয়ে গুরুত্ব পাৰে তা হচ্ছে ৰৌদ্ধিক প্রাখর্য। আর সেই প্রখর বুদ্ধি কেবল পুরুষের বা কেবল মেয়েদেরই একচেটিয়া ভাবে থাকবে এমন কোন কথা নেই। আর যারই এই ৰৌদ্ধিক প্রাখর্য থাকৰে সে–ই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। অবশ্য এ ব্যাপারে সকলের বুদ্ধির প্রাখর্য সমান হবে না।

ইতিহাস রচিত হয় সামূহিক মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে। রাজতন্ত্রের দিন চলে গেছে। রাজতন্ত্রের সেই গৌরবোজ্জ্বল যুগে রাজা বা রাণীই ছিলেন ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু। আর ইতিহাস বলতে বোঝাত রাজা–মাহারাজাদের ইতিহাস। পরবর্তীকালে ইতিহাস হয়ে দাঁড়াল মন্ত্রী–অমাত্যদের ইতিহাস। আবার শীঘ্রই এমন দিন আসছে যখন ইতিহাস 'রচিত হবে সাধারণ

সূচীপত্র

মানুষকে নিয়ে। রাজতন্ত্রের যুগে কেউ ভাবতেও পারত না যে রাজা–রাণীদের বাদ দিয়ে ইতিহাস লেখা যেতে পারে। আজও যেখানে রাজতন্ত্র নেই সেখানেও সরকারী ভবনগুলোকে রাজভবন ৰলা হয়। 'রাজা' শব্দের যাদু থেকে মানুষ এখনও নিজেদের পুরোপুরি মুক্ত করতে পারেনি। কোন একটা শহরে দেখেছিলুম সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে, "রাজানুকুল হাসপাতাল" যার মানে হচ্ছে সরকার পরিচালিত হাসপাতাল। সেকালে দেওয়ানীখাসে রাজা ও আমীর–ওমারাহরা প্রাধান্য পেতেন। আজকাল সরকারী কর্মচারীদেরই প্রাধান্য। তাই নূতন শব্দ "সেক্রেটারিয়েট”–এর উদ্ভব হয়েছে। অনুরূপভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটা নূতন চেতনা জাগৰে। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যেও শক্তি বুদ্ধির প্রাথর্য–ও জাগৰে, তারই ফলশ্রুতি হিসেৰে ইতিহাস লেখার ধারা পাল্টে যাবে। বস্তুতঃ এক নূতন ধাঁচের ইতিহাস ইতোপূর্বেই পাল্টানো শুরু হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও পাল্টাৰে। মনে রাখবে তোমরা মানুষের সমাজে কেউ অপাংক্তেয় নও। এমনকি একশ' বছরের যে অতি বৃদ্ধা বিধবা মহিলা, তারও জীবনের মূল্য অপরিসীম। এই বিশ্বসভায় সে–ও বর্জনীয় নয়, সেও তুচ্ছ নয়, আমরা তার সঠিক মূল্যায়ণ করতে পারিনি বলে আমরা ভাবি যে সে বুঝি পৃথিবীর বোঝা। এরকম ভাবাটা আমাদেরই বুদ্ধির

অল্পতার নিদর্শন, তার দোষ নয়। এইভাবেই সবের পেছনেই আছে একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন। আমরা মাথা ঘামাইনা। এই প্রায়োজনটা কী তা খুঁজে বার করবার জন্যে যদি মাথা ঘামাতুম তবে জানতে পারতুম, প্রতিটি ব্যাপারেই, পৃথিবীর প্রতিটি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উহ–অবোহের পেছনে রয়েছে এই জিনিসটা। আমরা যদি তলিয়ে ভাবি, তলিয়ে দেখি, ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা করি তাহলে দেখৰ কোন কিছুই ব্যর্থ নয়। সব কিছুই ঘটে চলেছে ভবিষ্যতের একটা বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে। বিশ্বের কোন কিছুই গুরুত্বহীন নয়। কোন কিছুকেই তাই তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য করা চলে না। অণু–পরমাণুকে এককালে খুবই ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন বলে মনে করা হত। কিন্তু আণবিক বোমার আবিষ্কারের পর থেকে মানুষ সেই অণুকেই ভয়ের চোখে দেখতে লাগল। কেউই ঠিক ভাবে জানে না কোন জিনিসটার মধ্যে কী ধরণের

সম্ভাবনা নিহিত আছে। কেবল পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার পরেই কোন বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে মানুষ একটা সম্যক ধারণা গড়ে তুলতে পারে। এ জগতে সকলেই একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূর্তির জন্যেই আসে। **আনন্দমার্গেরও**

তাই কোন ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যের পরিপূর্তির জন্যে আবির্ভাব ঘটেছে।

তখন আমার বয়স খুবই কম। সেটাও অনেকদিন হয়ে গেল। তখন জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বড় রকমের অবিচার চলছে। সঙ্গীতে সাহিত্যে, সিনেমায় সামাজিক অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সর্বত্রই চলছে ব্যাপক শোষণ। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, সামাজিক শোষণ, অর্থনৈতিক শোষণ এরূপ কতরকমের শোষণ চলছে। সমাজে নারীর অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। কিছুদিন আগে পর্যন্ত নারীর কোন বোটাধিকার ছিল না। প্রাচীন বিহারের বৈশালীতে যে লিচ্ছবি প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ছিল সেখানে নারীর বোট দেবার অধিকার ছিল (**আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রজাতন্ত্র ছিল এই লিচ্ছবি প্রজাতন্ত্র)** কিন্তু তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারতেন না। সর্বত্রই নারীর অধিকারকে সঙ্কুচিত করার একটা প্রবণতা ছিল। কোন দেশেই কোন নারীর আইনের চোখে সমানধিকার ছিল না। শুধু সাম্প্রতিকালে কিছুটা সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে নারীরা কিছুটা অধিকার অর্জন করেছে। কিছু শোষক পুরুষ (সব পুরুষই শোষক ছিলেন না, তাদের অনেকেই আবার যথেষ্ট বিবেকবান

সূচীপত্র

ছিলেন) চেয়েছিলেন নারীদের শোষণ করতে তারাই নারী সমাজকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তারা ভাবতেন যে মেয়েরা মুক্তি-মোক্ষের অধিকারী নয়। তাদের মতে নারীদের উচিত শুধু পুরুষের দাসত্ব করা। তারা যদি মুক্তি-মোক্ষ চায় তাহলে তাদের পুরুষ হয়ে জন্মাতে হবে। তারপরেই তারা মুক্তি-মোক্ষ লাভ করবে। ভেবে দেখতো এই সব পুরুষের ঔদ্ধত্য ও দুষ্ট বুদ্ধি কতখানি। তারা নারী সমাজের মনে স্থায়ীভাবে হীনম্মন্যতাবোধ জাগিয়ে দিয়ে নারীদের শোষণ করার কত শত উপায়ই না উদ্ভাবন করেছিল। আজ তাদের সমস্ত দুর্বুদ্ধির মুখোস খুলে গেছে। নারীকে শোষণের আরও ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে। ফ্রান্সের আইন অনুযায়ী মেয়েদের সিংহাসনে আরোহণের অধিকার ছিল না। **মনুর যুগে স্বামীরা স্ত্রীদের জুতো দিয়ে মারত** কিন্তু আজকের দিনে হলে মানুষ এতে ক্ষুব্ধ হয়ে জোরাল প্রতিবাদ জানাবে।

সামূহিক মনস্তত্ত্বে একটা দ্রুত পরিবর্তন আসছে। মানুষের সমাজে দৈহিক শক্তির চেয়ে বুদ্ধির মূল্য বেড়ে চলেছে ও বুদ্ধি কেবল মুষ্টিমেয়ের নয়, সামূহিক জীবনেও বাড়ছে। তাই এই

পরিবর্তন। এই পরিবর্তন আরও আসবে, আরও ত্বরান্বিত হবে।

শ্রাবণী পূর্ণিমা ১৯ আগষ্ট, ১৯৮৪ কলিকাতা

জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন পুনর্জাগরণ

আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, "জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন পুনর্জাগরণ”। 'রেণাসাঁ' শব্দটি খাঁটি অর্থ হচ্ছে পুনর্জাগরণ। যে মানবতা এত দিন ধরে ঘুমিয়ে ছিল, আজ তাকে অন্ধ তমিস্রা থেকে জাগাতে হবে ও জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে, অস্তিত্বের সকল স্তরে নূতন কিছু করতে হবে।

জীবনের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি স্তর রয়েছে–জাগতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। জাগতিক স্তরে আবার অনেকগুলি উপস্তর রয়েছে। যেমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সামাজিক অগ্রগতি ও সেইসঙ্গে রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক–সাংস্কৃতিক জীবন। কেউ কেউ একথা প্রায়ই বলেন যে বিংশ শতাব্দী হচ্ছে বিজ্ঞানের

যুগ। না, কথাটা ঠিক নয়। বিংশ শতাব্দীই কেন ৰলৰ, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই অর্থাৎ অনুমানিক দশ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে মানবজাতি আসার উষালগ্ন থেকেই বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের জীবন অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। যতদিন পর্যন্ত একজন মানুষও বেঁচে থাকৰে ততদিন বিজ্ঞানের যুগে থাকৰে।

বর্তমান কালে বিজ্ঞান মানেই হচ্ছে নূতন নূতন অস্ত্র তৈরী করা ও যুদ্ধবাজদের হাত শক্তিশালী করা। বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র তা' হওয়া উচিত নয় ও মানবজীবনের প্রারম্ভিক স্তরেও তা' তেমন ছিল না। হ্যাঁ, অস্ত্রের প্রয়োজন আছে বৈকি! কিন্তু তা যুদ্ধৰাজদের হাতকে মজবুত করার জন্যে নয়, সৎ আদর্শ, সৎ চিন্তা ও সৎ মানুষের রক্ষা করবার জন্যেই অস্ত্রের দরকার। বিজ্ঞান অবশ্যই কলা হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। অর্থাৎ বিজ্ঞান হৰে সেবা ও কল্যাণের জন্যে। সাহিত্য যেমন সেবা ও কল্যাণের জন্যে, তেমনি বিজ্ঞানকেও হতে হবে সেবা ও কল্যাণমূলক। বিজ্ঞান সর্বদাই মানব সমাজের যথার্থ প্রগতির জন্যে প্রযুক্ত হওয়া উচিত।

এবার সামাজিক প্রসঙ্গে আসা যাক। সামাজিক স্তরে অনেকগুলি উপস্তর রয়েছে ও সামাজিক প্রগতির যথার্থ স্বরূপই

হচ্ছে সমস্ত রকমের সামাজিক বৈষম্য দূর করা। কোন একটি ক্ষুদ্র পরিবারের সদস্যের মত বৃহত্তর মানবসমাজের প্রতিটি সদস্যেরই সমান অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু আজ সেখানে রয়ে গেছে বৈষম্য। সুতরাং পুনর্জাগরণ–আন্দোলনের মাধ্যমে সব রকমের বৈষম্যকে দূর করে মানবসমাজের সাম্য, ভাবগত ও অস্তিত্বগত সন্তুলনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আমাদের সমাজে রয়েছে নানান ধরণের বৈষম্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমন রয়েছে জৈব সংরচনাগত পার্থক্য যাকে ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হচ্ছে। মানুষে–পশুতে, মানুষে–উদ্ভিদে, পশুতে–উদ্ভিদে এই পার্থক্য কাজ করে চলেছে। একজন মানুষও যেমন বাঁচতে চায়, তেমনি একটা পায়রাও বাঁচতে চায়–তেমনি বাঁচতে চায় একটা কাক, একটা গাছও। আমার কাছে যেমন আমার জীবন খুবই প্রিয় তেমনি সব সৃষ্ট সত্তাগুলির কাছে তাদের জীবনও সমভাবেই প্রিয়। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যেমন মানুষের জন্মগত অধিকার তেমনি পশুজগৎ ও উদ্ভিদ–জগতেরও জন্মগত অধিকার। অধিকারকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে তথা সমস্ত সমাজের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করবার জন্যে রেনেসাঁ–

আন্দোলনকারীদের অবশ্যই কিছু বাস্তবোচিত কাজ করতে হবে।

এ সমাজে জন্মগত ভিত্তিতেও পার্থক্য রয়েছে। জন্মের ভিত্তিতেই তৈরী হয়েছে তথাকথিত উচ্চবর্ণ–নিম্নবর্ণ। কোন বিশেষ দেশের মানুষ অনাহারে শুকিয়ে মরছে, আবার কোন দেশের মানুষ মরছে অমিতাহারে, অজীর্ণতায় ও লোভের বশবর্তী হয়ে। এটা একটা সামাজিক বৈষম্য যা খুবই খারাপ। এগুলি স্বার্থপর মানুষেরই সৃষ্টি–পরমপুরুষের নয়। রেনাসাঁ–আন্দোলনকে এ ব্যাপারে কিছু গঠনমূলক কাজ করতে হবে। সকলেই সমান, মানুষ হিসেবে সকলের আস্তিত্বিক মূল্য সমভাবে প্রোজ্জ্বল।

এরপর রয়েছে বর্ণগত তারতম্য। ভৌগোলিক কারণে ও ঐতিহাসিক কারণেই সমাজে বর্ণগত পার্থক্য রয়ে গেছে। কারও গায়ের রঙ শাদা, কারও কালো, কারও খুৰই কালো, কারও বা হলদে। এগুলি কোন মৌলিক পার্থক্য নয়–এটা হ'ল একান্তই বাইরের পার্থক্য। এই ধরণের আপাতঃ পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে কেন পৃথক শাস্ত্র তৈরী হবে?–না, বর্ণের

ওপর ভিত্তি করে' কোন পার্থক্য হতে পারে না, ও তার ওপর ভিত্তি করে কোন সামাজিক বৈষম্যও মানা যায় না।

এছাড়া রয়েছে নারী–পুরুষে পার্থক্য। নারীরা অনেকেই সামাজিক–রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। তোমরা জান এই মাত্র কয়েকশ' বছর আগেও পৃথিবীর অনেক দেশে তাদের বোটাধিকার ছিল না। তা কেন! তারাও তো মানুষ। পুরুষদের মত তাদেরও সমান অধিকার আছে। পুণর্জাগরণ আন্দোলনের অগ্রদূতদের সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আন্দোলন শুরু করতে হবে ও নারী–পুরুষগত এই ধরণের অসাম্যকে দূর করতে হবে। মেয়েরা কি গবাদি পশু না কাপড়ের পুঁটলি যা মানুষ বিয়ের সময় দান হিসেৰে দেয়। তাদের কি ক্রীতদাসীদের মত অন্যের কাছে বিকিয়ে দিতে হবে। যতদিন পর্যন্ত মেয়েদের সাহস ও বুদ্ধির অভাব ছিল ততদিন তারা এই সব সহ্য করেছিল। কিন্তু ভাবতো জিনিসটা কতখানি অবমাননাকর। তাদের এই অমর্যাদা প্রকাশ্য রাস্তায় চাবুক মারার চেয়েও অনেক বেশী খারাপ। কাপড়ের পুঁটলির মত মেয়েদের কি ধোপাৰাড়ি পাঠাতে হবে? তাদের অবশ্যই দাবিয়ে রাখা চলবে না। সমাজের পুরুষের একাধিপত্য থাকাও উচিত নয়। সমাজে উভয়েরই সামবায়িক

নেতৃত্ব থাকা উচিত, কেউ কারও অধীন নয়। তাই নারী-পুরুষের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলা উচিত। রেনাসাঁ-আন্দোলনের পথিকৃৎদের অবিলম্বে এই সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে হবে। তা না হলে সমগ্র জনগোষ্ঠীর অর্ধাংশ এই নারীরা যদি অবহেলিত থেকে যায় তাহলে কেমন করে মানবসমাজের সর্বাত্মক প্রগতি হবে? সুতরাং পুনর্জাগরণের আন্দোলনে এগুলি দেখা একটা সামাজিক কর্ত্তব্য, একটা সামাজিক দায়িত্ব। রেনাসাঁ কর্মীদের এই সব ব্যবধান ও আসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করতে হবে-এগুলিকে সমাজ থেকে উপড়ে ফেলতে হবে।

'রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হচ্ছে কী? -না, একই দেশের এক জনগোষ্ঠী অন্য জনগোষ্ঠীকে অথবা এক দেশ অন্য দেশকে শোষণ করে চলেছে। সেখানেও রয়েছে রাজনৈতিক অসাম্য। সমাজে এখনও পর্যন্ত অর্থনৈতিক বিভাজন, অর্থনৈতিক শোষণ রয়েই গেছে। শুধু তাই নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শোষণও রয়ে গেছে। রেনাসাঁ-কর্মীদের এ সত্য আজ সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। কেননা, এই বৈষম্যকে কখনই সৎ ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা সমর্থন করতে পারেন না-আমরাও করব না। হ্যাঁ,

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবশ্যই নীতিবাদীদের শাসন থাকতে হবে। দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেরা কখনই সমাজকে ঠিকপথে চালাতে পারে না, কখনই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে না। রাজনৈতিক জীবন অবশ্যই বিশ্বৈকতাবাদের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুললে চলবে না যে এ জগতের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ও সমস্যা রয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের কথা এবার ধরা যাক। এখানেও রয়ে গেছে চরম অসাম্য ও শোষণ। অবশ্য আজকের দিনে প্রত্যক্ষভাবে ঔপনিবেশিক শাসন নেই ঠিকই কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তা পরোক্ষভাবে আজও রয়ে গেছে। এগুলোকেও সহ্য করা উচিত নয়। পুনর্জাগরণের আন্দোলন করতে গিয়ে এ ব্যাপারেও কিছু করতে হবে। তোমাদের মনে রাখা উচিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকলকে ন্যূনতম প্রয়োজনপূর্ত্তির নিশ্চিততা (গ্যারান্টি) দিতে হবে। এ ব্যাপারে আপোষের প্রশ্ন ওঠে না। প্রত্যেককে ক্রয়ক্ষমতার নিশ্চিতিতা দিতে হবে। আজকের দিনেও এই ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মানুষের জীবনে নিশ্চিত নয়। বরং আজও মানুষ মার্কস্বাদের মত শঠতাপূর্ণ সেকেলে অর্থনৈতিক তত্ত্ব দ্বারা চালিত হচ্ছে–যা বাস্তব জীবনে

অকেজো ও অসার বলে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ কেন সেই ধরণের তত্ত্বে বিশ্বাস করবে যা কখনও সার্থক প্রমাণিত হয়নি। মানুষকে ভুল পথে চালানো হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখবার আজ দিন এসেছে।

এরপর আসে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক–তা হচ্ছে সাংস্কৃতিক জীবন। সংস্কৃতি কী? সমগ্র মানবজাতির সংস্কৃতি এক। তবে অভিব্যক্তিতে আঞ্চলিক তারতম্য রয়েছে। অভিব্যক্তির এই আঞ্চলিক তারতম্যের অর্থ এই নয় যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতিও ভিন্ন ভিন্ন– সংস্কৃতি এক কিন্তু অভিব্যক্তি ভিন্ন।

শিক্ষা সাংস্কৃতিক জীবনেরই একটা অঙ্গ। শিক্ষা অবশ্যই নিঃশুল্ক হওয়া উচিত ও তা বিশ্বৈকতাবাদের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। শিক্ষাকে বাস্তবায়নের সময়ে তোমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে সমাজে এক এক অঞ্চলের স্থানিক পরিস্থিতি, সমস্যা ও স্থানিক প্রয়োজন এক এক রকমের। তাই শিক্ষাগত সংরচনা তৈরী করার সময় এই মৌলিক তত্ত্বটাকে মনে রাখতে হবে।

সুতরাং দেখছো, পুনর্জাগরণ আন্দোলনের পরিধি বিরাট। তাই তোমাদের এই মুহূর্ত থেকেই কাজ শুরু করে দিতে হবে। এতে গড়িমসি করলে চলবে না।

জাগতিক ক্ষেত্রে যেমন এই ধরণের বিভিন্ন অসাম্য রয়ে গেছে, মানসিক জগতেও তেমনি রয়েছে নানান ধরণের ব্যাধি। রেনাসাঁ–কর্মীদের এই ধরণের অসাম্য তথা মনুষ্য–সৃষ্ট কৃত্রিম ভেদ–বিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। মানসিক জগতেও অবশ্যই প্রগতি থাকতে হবে। মানসিক ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি তাকে হতে হৰে অৰাধ ও নিরঙ্কুশ। মানসিক জগতেও অনেক রোগ রয়ে গেছে। তোমরা দেখৰে মানস–ভৌতিক জগতে অনেক মানুষই ভাবজড়তার দ্বারা প্রেষিত হচ্ছে। নানান ধরণের ভাবজড়তা মানুষের মনে শিকড় গেড়ে বসেছে। মানুষ কখনই সহজে এসব মিথ্যা ভাবনা থেকে মুক্ত হতে পারে না। কারণ ছোটবেলা থেকেই তাদের মনে এসবের সূচিকা প্রয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে এক মানব–সমাজ বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে গেছে ও একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মমতে বিভক্ত হয়েছে, একই ধর্মমত আবার বিভিন্ন জাতে ও জাত উপজাতিতে ভাগ হয়েছে–কী অসহনীয় দুরবস্থা।

কেউ বা ভাবে, যেহেতু তারা বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত, তাই পরমপুরুষের আশীর্বাদধন্য সন্তান আর অন্যেরা সব অভিশপ্ত। এটা অত্যন্ত নিম্নমানের ভাবজড়তা। এসব সুবিধাবাদীদেরই সৃষ্টি। রেনাসাঁ–কর্মীদের এই সমস্ত ভাবজড়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। আর তা করতে হবে অশেষভাবে। এজন্যে হয়তো তাদের অসংখ্য ৰাধার সম্মুখীন হতে হবে, কটূক্তি শুণতে হৰে ও লাঞ্ছনা বিড়ম্বনা ভোগ করতে হৰে কিন্তু তা সত্বেও তাদের নির্ভয়ে ও অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলতে হৰে। ভাবজড়তা হ'ল মানস–ভৌতিক ব্যাধি।

এছাড়া রয়েছে ভৌত–মানসিক রোগগুলি। কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে পরমপুরুষ মানুষের আহারের জন্যেই জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন। আমি একজনকে জানতুম, সে প্রায়ই ৰলত যদি মানুষ ছাগলের মাংস না খায় তাহলে একদিন পৃথিবী ছাগলে ভর্তি হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলতো যদি মানুষ মুরগীর মাংস না খায় তাহলে পুরো পৃথিবীটাই তাতে ভরে যাবে–এক ইঞ্চি পরিমিত জায়গাও থাকবে না। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য মানুষ তো শকুনের মাংস খায় না, তবে কি বিশ্ব শকুনে ভরে গেছে? এই মানুষগুলি কত বোকা! মানুষ কেঁচো খায় না; তাই ৰলে কি এই পৃথিবীতে কেঁচোর

সংখ্যাবৃদ্ধি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে? ব্যাপারটা হ'ল এই যে, লোভের বশেই মানুষ মুরগী ছাগল খেয়ে থাকে আর নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার জন্যে যুক্তি খুঁজে বেড়ায়। তোমরা এ ধরণের কপটতাকে প্রশ্রয় দিও না। মানসিক জগতের চলমানতায় কিছু ত্রুটিপূর্ণ চিন্তা রয়ে গেছে। মানুষ ভাবে, যেন পৃথিবীতে শাসন করতেই জন্মেছে আর সৃষ্ট জগতের জীবজন্তুরা যেন তাদের দ্বারা শাসিত হতেই জন্মেছে। মজবুত অস্ত্রের দ্বারা তোমাদের এই ধরণের মানসিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এই অস্ত্র কী–তা হ'ল নব্যমানবতাবাদ। এখানে বাস করার সকলের সমান অধিকার–এ বিশ্ব সকলের জন্যেই। এ বিশ্ব কেবল মানুষেরই পৈতৃক সম্পত্তি নয়। এটা দেখাও রেনাসাঁ–কর্মীদের কর্তব্য।

বিশুদ্ধ মানসিক জগতেও গতির প্রসঙ্গ আসছে। সম্পূর্ণ মানসিক স্তরেও অনেক ত্রুটিপূর্ণ চিন্তা কাজ করছে। এরই ফলশ্রুতিতে কোন ব্যষ্টি বা গোষ্ঠী প্রায়ই অন্যকে দমন ও পীড়ন করতে চেষ্টা করে। এই ধরণের ত্রুটিপূর্ণ মানসিকতার জন্যে জনগণের একটা বিরাট অংশ মানসিক হতাশায় ভুগছে।

পুনর্জাগরণের আন্দোলনকারীদের এই ধরণের শোষণের বিরুদ্ধে তৎপর হতে হবে ও ত্রুটিপূর্ণ দর্শনের হাত থেকে

মানবসমাজকে বাঁচাতে রোগগুলিকে মানুষের মন থেকে সরিয়ে দিতে হবে, মুছে দিতে হবে।

মানসাধ্যাত্মিক স্তরেও আরেক ধরণের মানসিক ব্যাধি থাকতে পারে। মানসাধ্যাত্মিক স্তরের গতিটা কেন্দ্রিত অর্থাৎ সমস্ত রোগ এক বিশেষ বিন্দুতে নিয়ন্ত্রিত ও যা চরম সত্তার দিকে এগিয়ে চলে। এই গতি অবশ্যই সংশ্লেষণাত্মক-বিশ্লেষণাত্মক নয়। মোটের ওপর যদি গতিটা হয় বাহ্যিক তবে পথ হয়ে যায় বিশ্লেষণাত্মক-যা খুবই ভয়াবহ। এই কারণেই দেখা যায়, মানসাধ্যাত্মিকতার নামে, মজহব বা উপধর্মের (রেলিজন) নামে মানব-সমাজে অসাম্য তৈরী হয়েছে, মানুষে মানুষে সৃষ্টি হয়েছে ভেদ। অতীতে ধর্মের নামে অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়ে গেছে। আজকের দিনেও এক উপধর্মমতের মানুষ অন্য উপধর্মমতের মানুষদের বিশ্বাস করে না। তাদের ওপর নির্ভর করতে পারে না অতএব এটা মনে রাখা উচিত যে একমাত্র কেন্দ্রিত সত্তা সেই চরম সত্তাই আমাদের রক্ষক। সেই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। এটিই সমস্ত রকমের মানসিক রোগের মকরধ্বজ।

তৃতীয়টি হচ্ছে আধ্যাত্মিক স্তর। এই স্তরের স্বাভাবিক পথ হচ্ছে, সমস্ত কিছুকে আধ্যাত্মিকতার দিকে চালিত করে

দেওয়া। আদর্শের ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, ভাষার ক্ষেত্রে, ঐক্যের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এর উত্তরণ হওয়া দরকার। অর্থাৎ আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্ত স্তরে এই উত্তরণ হতে হবে। তোমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি অণু–পরমাণুকেই আধ্যাত্মিকতায় রূপান্তরিত করতে হবে। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ দর্শনের জন্যে, ত্রুটিপূর্ণ নির্দেশনার জন্যে, মানুষ এ সত্য ভুলে গিয়ে আত্মিক শক্তিকে মানসশক্তিতে ও মানসশক্তিকে জড় শক্তিতে রূপান্তরিত করে চলেছে অর্থাৎ তার ঋণাত্মক প্রতিসঞ্চরের পথ বেছে নিয়েছে যা প্রগতির পরিপন্থী।

রেনাসাঁ–কর্মীদের এই সবের বিরুদ্ধে সরব হতে হবে আর তা হতে হবে এক্ষুণিই, এই মুহূর্ত থেকেই। আমিও চাই, তোমরা সকলেই বিচারবুদ্ধি সমর্থিত পুনর্জাগরণের পথে এগিয়ে চল–আজ থেকেই, এই মুহূর্ত থেকেই। তোমাদের জয় হোক।

আর ইয়ু প্রবচন, ২ জানুয়ারী ১৯৮৬

সূচীপত্র

প্রমা–১

"ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টিমাতৃকা অশেষ ত্রিকোণধারা"।

"পরমপুরুষের সত্ত্ব, রজঃ ও তম বিভিন্ন ধারায় অজস্র রেখাকার তরঙ্গ বয়ে চলেছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক তরঙ্গধারা মিলিত হয়ে ত্রিকোণ বা ততোহধিক 'কোণাত্মক বিভিন্ন যন্ত্রের সৃষ্টি হয়ে চলেছে। বহুভূজ যন্ত্রগুলিও স্বরূপ–পরিণামের ফলে ক্রমশঃ ত্রিভূজে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। এই ত্রিগুণাত্মিকা মাতৃকাশক্তি (Vitum Matrix) অশেষ"।

এই গুণ–ত্রিকোণ বা গুণযন্ত্রকে যতক্ষণ সাম্যাবস্থা ৰজায় থাকছে ততক্ষণ সত্ত্ব রজঃতে, রজঃ তমতে ও তম রজঃতে সীমাহীনভাবে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। এই স্বরূপ–পরিণামাত্মক রূপান্তরণের জন্যেই গুণযন্ত্রকের ভারসাম্য বজায় থাকছে। কিন্তু এই অবিরাম রূপান্তরণের ধারায় এমন এক অবস্থা আসে যখন প্রকৃত প্রভাব নিৰন্ধন গুণযন্ত্রকের ভারসাম্য পরামৃষ্ট হয়ে কোন একটি কৌণিক বিন্দু থেকে সর্জন ধারার

সূচীপত্র

উৎসারণ সুরু হয়......বিসৃষ্টির ধারায় ক্রমবিবর্তনের পথ ধরে তৈরী হয় লোক-ত্রিকোণ।

জাগতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক-জৈবী সত্তা এই ত্রিভৌমিক। এই তিনকে নিয়ে তৈরী হয় সত্তার প্রমা-ত্রিকোণ বা লোক-ত্রিকোণ।

এখন এই 'প্রমা'-তত্ত্ব ৰলতে ঠিক কী বোঝায়? 'প্রমা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে প্র-মা + ড + টা প্রমা। 'মা' ধাতুর অর্থ মাপা বা পরিমাপ করা। আর তাই 'প্রমা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে ভারসাম্য। ইংরেজীতে এই অর্থে equilibrium ও equipoise দু'টি শব্দকেই ব্যবহার করা হয়। তবে এদের উভয়ের মধ্যে কিছুটা বৈবহারিক পার্থক্য রয়েছে equilibriam হ'ল শক্তিগত ভারসাম্য আর equipoise হ'ল ওজনগত ভারসাম্য। যেমন ধর, কোথাও দুই পক্ষের মধ্যে দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতা চলেছে। উভয়পক্ষই সমশক্তিসম্পন্ন হওয়ায় এক পক্ষ অপর পক্ষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারছে না। অর্থাৎ উভয় পক্ষের মধ্যে রয়ে গেছে শক্তিগত ভারসাম্য (equilibrium)। আবার ধর তুলাদণ্ডের এক পাশে রয়েছে ১কিলো ওজনের একটি বাটখারা ও অপর পাশেও রয়েছে ১কিলো বেগুন। এ ক্ষেত্রে ওজনগত সমতা থাকায়

তুলাদণ্ডের দু'টি পাল্লাই এক সন্তুলিত অবস্থায় রয়েছে। এই ওজনগত সন্তুলিত অবস্থানে ৰলৰ ওজনগত ভারসাম্য ও শক্তিগত ভারসাম্যের মিলিত ফলশ্রুতি হ'ল 'প্রমা'।

প্রমার অপরিহার্যতা বৈয়স্টিক জীবনে যতখানি সত্য, সামুহিক জীবনেও ততখানিই সত্য। কোন একটি জনগোষ্ঠীর সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতির বা শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকর্ষ নির্দ্ধারিত হয় তার সামূহিক ও বৈয়ষ্টিক জীবনে প্রমাসীনতা কী পরিমাণে প্রতির্ষ্ঠিত হতে পেরেছে তার ভিত্তিতে। বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল এই যে পৃথিবী নামক এ গ্রহে ১০ লক্ষ বছর আগে মানুষ জাতির আগমন ঘটলেও, সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলতে চলতে আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তন আজ থেকে ১৫,০০০ বছর আগে শুরু হলেও তবু্ মানুষ তার সামাজিক ও বৈয়ষ্টিক জীবনে ত্রিভৌমিক সন্তুলন অর্থাৎ প্রমা প্রতিষ্ঠা করতে তো পারেই নি, এমন কী এ ব্যাপারে কোন সচেতন প্রয়াস চালাবার প্রয়োজন অনুভব করেনি। যেমন পাশ্চাত্ত্য জগৎ অনেকাংশে বৈষয়িক উন্নতি ঘটিয়ে আংশিক ভাবে ভৌতিক ক্ষেত্রে প্রমা আনবার চেষ্টা করেছে ঠিকই কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রমা প্রতির্ষ্ঠিত করবার তেমন কোন প্রচেষ্টা তাঁদের ছিল না বা আজও নেই। তবে হ্যাঁ,

মানসিক ক্ষেত্রে মানব মনীষার বিভিন্ন দিকে বিকাশ ঘটিয়ে প্রমা আনবার কিছুটা চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রমা প্রতিষ্ঠার বেশ কিছুটা চেষ্টা হয়েছিল; তবে তা উন্নতির পরাকাষ্ঠায় পৌঁছুতে পারেনি। পাশ্চাত্যের মত ভারতবর্ষেও মানসিক ক্ষেত্রে প্রমা প্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা অবশ্যই হয়েছিল, কিন্তু সে প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য সাফল্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাদের সবার মধ্যে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রচলিত ভ্রান্ত জীবনধারা, ভাবজড়তা, ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ত্রুটিপূর্ণ অব্যবস্থা ইত্যাদির ফলে তাঁদের বৈয়ষ্টিক ও সামূহিক জীবনে প্রমা প্রতিষ্ঠিত হবার অবকাশ উপযোগিতা হয়নি। মানব সমাজকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে-মননে, মনীষায় ৰোধিতে আরও অনেক অমূল্য সম্পদ যা তারা দান করতে পারত প্রমার অভাব থাকায় তারা তা করে যেতে পারেনি।

ভৌতিক ক্ষেত্রে প্রমার অভাব

প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলকেই অজস্র ভূ-নিম্নস্থ সম্পদে ও ভূমি-উপরস্থ সম্পদে সমৃদ্ধ করে দিয়েছে। বনজ, কৃষিজ, খনিজ, জলজ, ভেষজ প্রভৃতি সম্পদে আমাদের এ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল পূর্ণ হয়ে রয়েছে। তবু বহু দেশের অর্থনৈতিক পরিভূ-তে রয়েছে চরম দারিদ্র্য, জীবন যাত্রার নিম্ন মান, কৃষি ও শিল্পে অনগ্রসরতা। ফলে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, নিরক্ষরতা, চিকিৎসার অভাব ও গৃহহারা জীবনের অভিশাপ নিয়ে আজও বিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে কোটি কোটি মানুষ তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করে চলেছে। প্রকৃতির অঢেল আশীর্ব্বাদে সম্পদের অভাব কোন অর্থনৈতিক অঞ্চলে নেই কিন্তু শুভহিতৈষণার অভাবের জন্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজে লাগান হয়নি। ফলস্বরূপ, ভৌতিক জগতে মানুষের ন্যূনতম চাহিদাগুলি (অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান) পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই অনিবার্য কারণেই ভৌতিক স্তরে প্রমার অভাব ব্যাপক ভাবে দেখা - দিয়েছে।

মানব সভ্যতার আদি বিন্দু রাঢ়ের কথাই ভাবা যাক না। এই অতি প্রাচীন ঢেউখেলানো ভূমিখণ্ডে প্রকৃতি তার সম্পদের ভাণ্ডার উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। রাঢ়ের প্রাচীন কঠিন

শিলার স্তরে স্তরে ঢাকা রয়েছে সোণা, রুপা, তামা, পারা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি ধাতব দ্রব্য। আর আগ্নেয় শিলার কঠিন শয্যায় শায়িত রয়েছে কোয়ার্জ ও অনেক ধরণের মূল্যবান প্রস্তর। রাঢ়ের প্রাচীন পাললিক শিলাস্তরে ও মৃত প্রস্তরের অভ্যন্তরে খুঁজে পাচ্ছি উন্নতমানের কয়লা ও বালি। পশ্চিম রাঢ় তাই অজস্র খনিজ সম্পদে রত্নগর্ভা। আর পূর্ব রাঢ়ের ভূমিখণ্ড তুলনায় নবীন মৃত্তিকাসঞ্জাত, কারণ এ অঞ্চল হ'ল সমুদ্রোত্থিত। কিন্তু তারও বুকে অতি প্রাচীনকালে যে সকল স্থানে 'সারগোসা' সমুদ্র ছিল সে সকল অঞ্চলে খনিজ তৈল পাৰার বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে।

পশ্চিম রাঢ় যেমন সমৃদ্ধ মাটির তলাতে, পূর্ব রাঢ় তেমনি সমৃদ্ধ মাটির ওপরে। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বর্দ্ধমান, হুগলী, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, কান্দি মহকুমার মত উর্বর জমি বিরল। এর কারণ হচ্ছে দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, বক্রেশ্বর, কোপাই, শিলাবতী, হিংলো প্রভৃতি রাঢ়ীয় নদীগুলি তাদের উজানে ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য প্রচুর খনিজ সম্পদসমৃদ্ধ পলিমাটি বহন করে এনে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মৃত্তিকার উপরিভাগকে করে তুলেছে উর্বর, মাটিকে করেছে সোণার মাটি। এই উর্বর ভূমিতে ধান, গম, ইক্ষু,

ডাল, কার্পাস, তুঁত রেশম, অতুঁত রেশম ইত্যাদি বহু কৃষিপণ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। রাঢ়ের লালমাটি ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ। এ মাটিতে উৎকৃষ্ট মানের আপেল, নাসপাতি, কমলা, পেঁপে, পেয়ারা, আঙ্গুর, আতা প্রভৃতি ফল ফলতে পারে। বিভিন্ন ধরণের সেচ ব্যবস্থা (ক্ষুদ্র নদী সেচ, পুষ্করিণী সেচ, তোলা সেচ) প্রবর্তন করে উদ্যানশিল্প ও বছরে তিন রকম ধানের (আউশ–আমন–বোরো) ফলনের চেষ্টা করাও যেতে পারে। কৃষিসম্পদের এই বিপুল সম্ভাবনাকে ভিত্তি করে রাঢ়ের বুকে গড়ে উঠতে পারত হাজার হাজার কৃষিভিত্তিক ও কৃষি–সহায়ক শিল্প কারখানা। কিন্তু তার প্রায় কিছুই কাজে লাগানো হয়নি আজ পর্যন্ত।

বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ রাঢ়ের অরণ্যানী শাল, পিয়াশাল, হিজল, পলাশ, অশোক, কুসুম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি গাছপালায় আচ্ছাদিত।

তাই রাঢ়ে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার থাকা সত্বেও রাঢ়ের মানুষ আজ প্রায় নিরন্ন, অর্দ্ধ–উলঙ্গ, গৃহহারা, ব্যাধিতে জীর্ণ–শীর্ণ ও শিক্ষার অভাবে অজ্ঞ ও অনগ্রসর। রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যদি প্রমাতত্ত্বের ওপর

আধারিত হত তা হলে রাঢ়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি আজ সম্পূর্ণ অন্য রূপ হত।

ঠিক এই রকমই প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় আর এক ভূমিখণ্ড হ'ল পাশ্ববর্তী রাজ্য ওড়িষ্যা। রাঢ়ের মত প্রভূত কৃষিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ওড়িষ্যায় অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল। এর বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূল ভাগে নানান ধরণের শিল্প-কারখানা গড়ে উঠবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বন্দর শিল্প, জাহাজ নির্মাণ কারখানা, সমুদ্রতরঙ্গ সঞ্জাত বিদ্যুৎ-শক্তি (tidal electricity) উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া, কৃষিভিত্তিক ও কৃষি সহায়ক শিল্প গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু এ অঞ্চলেও প্রমা-ভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভাবের জন্যেই আজও ওড়িষ্যার কোটি কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করে চলেছে।

শুধু রাঢ় বা ওড়িষ্যার কথাই বা বলি কেন, প্রমার অভাবে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের এই ভয়াবহ চিত্র আজ পরিদৃষ্ট হয়।

সূচীপত্র

মানসিক স্তরে প্রমার অভাব

মানব মনের প্রধান কাজ দু'টি–চিন্তা করা ও স্মরণ করা। মানুষ মন-প্রধান জীব। তাই মনুষ্যত্বের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব তার মননশীলতায়, ৰৌদ্ধিক তীক্ষ্ণতায় ও বৈদুষ্যের দীপ্তিময়তায়। তার সর্জন-প্রতিভার অভিস্ফুরণের মধ্য দিয়ে মানসিক জগতের বর্ণাঢ্য ভাবসম্পদকে মানুষ ছড়িয়ে দেয় রঙ-তুলির রেখায় ছবির পটে, লেখনীর স্পর্শে কবিতায় সাহিত্যে, ছেনি-হাতুড়ির সাহায্যে ভাস্কর্য্যের সৌকুমার্য্যে। তার দর্শনের চিন্তা-ভাবনা, বিজ্ঞানের বিচারবীক্ষণ, বিভিন্ন শাস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মানব-মনের চৈত্তিক অধিক্ষেত্র তথা মানসিক স্তরেরই সোণার ফসল হয়ে মানব সমাজে সমাদৃত হয়ে আসছে। কিন্তু মানসিক স্তরে যদি প্রমার অভাব ঘটে তবে মানস ভাবের অভিব্যক্তি প্রসূত শিল্পে-সাহিত্যে-ভাস্কর্য্যে-শাস্ত্রে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা প্রশাখায় ভুলভ্রান্তি এসে যেতে বাধ্য। তাতে নৃত্যের ছন্দপতন ঘটতে পারে, চিত্রাঙ্কনে পরিমিতিবোধের অভাব হতে পারে, সঙ্গীতে সুর-লয়-তালের রসভঙ্গ হতে পারে, অথবা সাহিত্যের শাখা-প্রশাখায় অপরিণত সৃষ্টির আগাছা-পরগাছা ছড়িয়ে পড়তে পারে।

কোন চিত্রকর হয়তো একটি ছবি আঁকছেন। ছোট্ট একটি জলাশয়, তাতে রয়েছে নৈস্তরঙ্গের প্রশান্তি। জলাশয়ের বুকে ফুটে রয়েছে একটা জলপদ্ম। ছবিতে আঁকা জলাশয় হয়তো এক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থান দখল করে রয়েছে, আর প্রস্ফুটিত পদ্মের ছড়ানো পাপড়ির আয়তক্ষেত্রটা ছবিতে দেখানো হয়েছে দু'ইঞ্চির মত। এ ক্ষেত্রে চিত্রকর ছবির মৌল পরিমিতির সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে প্রমার শৈল্পিক সন্তুলনতাকে নষ্ট করে ফেলেছেন। প্রমার অভাবে শিল্পসৃষ্টিও সার্থক, সুষম ও সুন্দর হয়ে উঠতে - পারেনি।

আবার কবিতার কথাই ধরা যাক্। সার্থক কবিতা হ'ল ভাব-ভাষা-ছন্দ ও রসের সুষ্ঠু সমন্বয়। কিন্তু যদি কবির মধ্যে শুধু ভাষার মুন্সিয়ানা ও ভাবের গভীরতা থাকে কিন্তু ছন্দের পটুতা বা রসের অভাব থাকে সে ক্ষেত্রে তাঁর কবিতার প্রমা বিঘ্নিত হয়ে যাবে। প্রমাবিহীন কবিতার উৎকর্ষ সার্থকতার গৌরৱ লাভ করতে পারে না।

ঠিক তেমননি ভাব-ভাষা-সুর-ছন্দের মার্মিক ঐক্যতান হ'ল গানের অভিপ্রকাশ। এর যে কোন একটি অভাব ঘটলেই গীতিমাধুর্য্যেও প্রমার অভাব দেখা দেবে। আর তাই সে ক্ষেত্রে গীত হৱে শুধু কতকগুলি শব্দের প্রাণহীন পংক্তিবদ্ধ রূপ।

সুদূর অতীতে মানব সমাজে দার্শনিকতার সূত্রপাত হয়ে ছিল সৃষ্টির মূল রহস্যকে জানৰার ও বুঝৰার জন্যে। জ্ঞান-ভূমির এই সাধনায় মানৰ মনীষীরা নানান যুগে নানান ধরণের ভাব নিয়ে বিভিন্ন দর্শন গড়ে তুলেছেন। তাদের কোন দর্শন হয়ে উঠেছিল ভাববাদী, কোনটি বা জড়বাদী। কিন্তু দর্শনের মূল লক্ষ্যটা কী? স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র নির্ভুলভাৰে নির্ণয় করাই হ'ল দর্শনের মূল লক্ষ্য কিন্তু দার্শনিকরা আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েও আপেক্ষিক জগতের সঙ্গে পারমার্থিক জগতের সেতুৰন্ধ রচনা করতে পারেননি। দর্শন যেন অধিবিদ্যার (metaphysics) গোলক ধাঁধাঁয় ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য ও পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। দর্শনের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দর্শনগুলিকে করে তুলেছে ভাব-জড়তাশ্রয়ী ৰৌদ্ধিক জঞ্জাল। শিব তাদেরই সম্বন্ধে বলেছিলেন- 'লোকব্যামোহকারক'।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রমার অভাব

আধ্যাত্মিকতার মূল লক্ষ্য হ'ল মানব অস্তিত্বের অভ্যন্তরে যে পরম শিব লুকিয়ে আছেন তাঁকে লাভ করা; ভূমার সঙ্গে

অণুর, শিবের সঙ্গে জীবের, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মহামিলন ঘটানো। আধ্যাত্মিকতার এই গূঢ় রহস্যকে না জেনে মানুষ উপধর্ম (Religion) প্রভাবিত হয়ে দূর দেশে তীর্থযাত্রায় গমন করে–এমন কি ঘরবাড়ী, জমিজমা বিক্রী করেও তারা তীর্থস্নানে যায়। বলা বাহুল্য মাত্র এতে তাদের শ্রম, সময় ও অর্থের অপচয়ই হয় না, ক্লেশও বাড়ে; কিন্তু আধ্যাত্মিক লাভ কিছু হয় না। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রমাহীনতার এটি একটি জ্বলন্ত নিদর্শন।

প্রমা–সংবৃদ্ধি, প্রমা–ঋদ্ধি ও প্রমা–সিদ্ধি:

মানব অস্তিত্বের ত্রি–স্তরেই প্রমা–তত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম সে কথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্যে জাগতিক উন্নতিও নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। জাগতিক বিকাশের সন্তুলিত অবস্থা চরম উৎকর্ষে পৌঁছে যখন ব্যষ্টি ও সমষ্টির মানস ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করছে তখন তাকে ৰলৰ প্রমা–সংবৃদ্ধি।

তেমনি প্রমা–ঋদ্ধি মানে যেখানে মানসিক বিকাশের সন্তুলন অবস্থা চরম উৎকর্ষে পৌঁছে ব্যষ্টি ও সমষ্টির

জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করছে তখন তাকে ৰলৰ প্রমা-ঋদ্ধি। এ অবস্থায় মনের চিত্তধাতু (ectoplasmic stuff) চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে কেবল আয়তনগত ও ভরগত ভাবেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, চিত্তাণুগুলি কুশাগ্র তীক্ষ্ণতা প্রাপ্তির প্রয়াসে অগ্র্যাৰুদ্ধির শীর্ষ বিন্দুর দিকে মানসিক ভারসাম্য বজায় রেখে এগিয়ে যেতে থাকে।

আর প্রমাসিদ্ধি তাকেই ৰলৰ যে মানসাধ্যাত্মিক স্তর উৎক্রান্ত হয়ে মানবমন আধ্যাত্মিক বিকাশের পরম সাম্যাবস্থায় তথা চরম উৎকর্ষে পৌঁছেছে ও ব্যষ্টি ও সমষ্টির জাগতিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করছে।

লোকত্রিকোণ ও বিক্রান্ত-বিকৃত-বিপর্যস্ত অবস্থা:

জাগতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক-ত্রিস্তরকে নিয়েই তৈরী হয় ব্যষ্টি বা সমষ্টিসত্তার লোকত্রিকোণ বা প্রমাত্রিকোণ। বিবর্তনের ধারায় পরম তত্ত্বের মূল কোরক থেকে উৎসারিত এই বিসৃষ্টির প্রথম চরণে আসছে লোকত্রিকোণ। প্রাথমিক অবস্থায় ব্যষ্টি সত্তার লোকত্রিকোণে সামরস্য বা সামঞ্জস্য বজায় থাকলেও পরবর্তী ধাপে দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাবে ও বৃত্তির

সংঘাতে লোকত্রিকোণের সামরস্য নষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ প্রমাত্রিকোণে সামঞ্জস্যও বিনষ্ট হয়ে পড়ে। লোক ত্রিকোণ বা প্রমা–ত্রিকোণের এই সামরস্যবিহীন অবস্থাটিকে ৰলে বিক্রান্ত অবস্থা (stage of derangement) । এই অবস্থায় যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা হৃত প্রমাকে যদি পুনরুদ্ধার করা যায় তো ভালই, নইলে এই অধোগতির ধারায় লোকত্রিকোণ বিক্রান্ত হবার পরে নেৰে আসে বিকৃত অবস্থায় (stage of disruption)। নিম্নমুখী এই গতিকে মানুষ যদি প্রতিরোধ ও সংশোধন করতে অসমর্থ হয় তবে এর পরবর্তী স্তরে লোক–ত্রিকোণ নেৰে যায় বিপর্যস্ত অবস্থায় (stage of degeneration)। আজকের মানব সমাজ এই বিপর্যস্ত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। পরিণাম স্বরূপ, মানব সমাজ আজ অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনা, সামাজিক অস্থিরতা, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও ধর্মীয় কুসংস্কারের ভয়াবহ আবর্তে পড়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে।

সমাধান:

সমাজ এই বিপর্যস্ত অবস্থায় পৌঁছে গেলে তখন আর সরাসরি লোক– ত্রিকোণের সামরস্য প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।

সূচীপত্র

বরং সমাজকে ধাপে ধাপে 'বিপর্যস্ত' অবস্থা থেকে 'বিকৃত' অবস্থায় ও তারপরে 'বিকৃত' অবস্থা থেকে 'বিক্রান্ত' অবস্থায় উন্নীত করে ও চরম স্তরে লোক–ত্রিকোণের তথা প্রমা–ত্রিকোণের সামরস্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যদিও জাগতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক–তিনটি স্তরেরই যথাযথ গুরুত্ব রয়েছে তবুও আমাদের ভৌতিক স্তরকে প্রারম্ভিক পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। ভৌতিক স্তরে প্রমা নষ্ট হয়ে গেলে সমাজে তখন 'কৌস্থিতিক'দের আধিপত্য ঘটতে থাকে। কৌস্থিতিকরা তখন সমাজদেহকে কলুষিত করে দেয়। ফলস্বরূপ, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্তরেও প্রমা বিনষ্ট হয়ে পড়ে। মানসিক অবস্থা সর্বক্ষেত্রেই ক্রমশঃ অধোগতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তাই ভৌতিক স্তরে লোক–ত্রিকোণ তথা প্রমা–ত্রিকোণ প্রতিষ্ঠা প্রারম্ভিক কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

এখন প্রশ্ন হ'ল, লোক–ত্রিকোণ তথা প্রমা–ত্রিকোণ সামরস্যের স্তরে ফিরিয়ে নিয়ে আনার উপায় কী? প্রতিটি মুখ্য স্তরকে কতকগুলি উপস্তরে ভাগ করতে হবে। যেমন, ভৌতিক স্তরকে আমরা ভাগ করতে পারি–কৃষি, শিল্প, ব্যবসা–বাণিজ্য, চিকিৎসা, দৈহিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে শিক্ষার ব্যাপারে ভৌত–

বিজ্ঞানের সব শাখাগুলি পড়ে ভৌতিক স্তরে, কারণ তারা সকলেই জড়-জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে সমস্ত হিউমানিটিজ সাবজেক্টই (যেমন ভাষা-সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন ইত্যাদি) পড়ে মানসিক স্তরে। প্রতিটি উপস্তরের উপ-ত্রিকোণ তৈরী করে তাদের মধ্যে স্তরে স্তরে সামরস্যের মাত্রাবৃদ্ধি ঘটিয়ে ক্রমশঃ ভৌতিক স্তরকে বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে বিকৃত অবস্থায় উন্নীত করতে হবে ও পরবর্তী ধাপে উপ-ত্রিকোণগুলির মধ্যে সামরস্যের মাত্রা আরও বাড়িয়ে ভৌতিক স্তরকে বিকৃত অবস্থা থেকে বিক্রান্ত অবস্থায় তুলে আনতে হবে। এইভাবে ভৌতিক স্তরের লোক-ত্রিকোণে পূর্ণ সামরস্য তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন তার সংশ্লিষ্ট অসংখ্য উপ-ত্রিকোণগুলিতেও সামরস্য যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

অনুরূপভাবে মানসস্তরেও রয়েছে বহুসংখ্যক উপ-স্তর। যেমন শরীর-মানসিক, বিশুদ্ধ-মানসিক, তথা মানস-আধ্যাত্মিক উপস্তরগুলি। মানসস্তরের এই উপস্তরগুলির মধ্যেও স্তরে স্তরে সামরস্যের মাত্রাবৃদ্ধি ঘটিয়ে মানস-স্তরকে 'বিপর্যস্ত' অবস্থা থেকে 'বিকৃত' অবস্থায়, 'বিকৃত' অবস্থা থেকে বিক্রান্ত' অবস্থায় ও সবশেষে মানস-স্তরের স্বাভাবিক লোক-ত্রিকোণ তথা প্রমা-ত্রিকোণে সামরস্য ফিরিয়ে আনতে হবে।

এবার আধ্যাত্মিক স্তরের প্রসঙ্গে আসা যাক। এই আধ্যাত্মিক স্তরকেও সম্ভবমত কয়েকটি উপস্তরে ভাগ করা যায়, যদিও স্বাভাবিকভাবেই এই উপস্তরের সংখ্যা হবে খুবই কম। এই আধ্যাত্মিক স্তরের উপ-ত্রিকোণগুলির মধ্যেও স্তরে স্তরে সামরস্যের মাত্রাবৃদ্ধি ঘটিয়ে বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে বিকৃত অবস্থায়, তারপর বিক্রান্ত অবস্থায় ও শেষ ধাপে আধ্যাত্মিক জগতে স্বাভাবিক লোক-ত্রিকোণের সামরস্য প্রতির্ষ্ঠিত করতে হৰে।

ভৌতিক স্তরে সামরস্যপূর্ণ লোক-ত্রিকোণ তথা প্রমা-ত্রিকোণ তৈরী করতে গেলে চারটি তত্ত্বের কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

(১) বর্তমান কালের ভৌতিক চাহিদা ও নিকট ভবিষ্যতের ভৌতিক চাহিদা;

(২) বর্তমান কালের ভৌতিক যোগান ও নিকট ভবিষ্যতের ভৌতিক যোগান;

(৩) ভূমির সর্বাধিক উপযোগ গ্রহণ;

(৪) প্রাউটের পঞ্চ মৌল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়ের সমস্যার সমাধান;

সূচীপত্র

যেমন কোন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের খাদ্যসমস্যা দূর করতে হলে কৃষির উপ-ত্রিকোণগুলি গড়ে তুলতে হবে প্রয়োজনীয় যথাযথ সেচব্যবস্থা চালু করে, অধিক ফসল উৎপাদনশীল বীজ ব্যবহার করে, জমিতে ট্রাক্টরের সাহায্যে নিবিড় চাষ ও প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করে বৎসরের তিন বা চার ফসলের চাষের ব্যবস্থা করে, উপযুক্ত জমির জন্যে উপযুক্ত ফসল নির্বাচন করে, কৃষি-সমবায় (agricultural co-operative) ও কৃষি উৎপাদক-সমবায় (agricultural producers' co- operative) ব্রিগেড তৈরী করে। মুনাফা লুণ্ঠনের অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, প্রয়োজন পূর্তির নীতিতে কৃষিকে পরিচালিত করে ও উৎপন্ন ফসলের যথাযথ সংরক্ষণ ও বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। এত সব ব্যবস্থার সম্মিলিত সামরস্যেই কৃষিতে যে লোক-ত্রিকোণ বা প্রমা-ত্রিকোণ তৈরী হবে সেটা মুখ্যতঃ ভৌতিক স্তরের লোক-ত্রিকোণের সামরস্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

অনুরূপভাবে মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্তরেও লোক-ত্রিকোণ বা প্রমা-ত্রিকোণের সামরস্য ফিরিয়ে আনতে হবে তাদের সংশ্লিষ্ট উপ-ত্রিকোণগুলিতে সুন্দরভাবে সামরস্য প্রতিষ্ঠিত করে।

ভৌতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্তরের লোক–ত্রিকোণগুলি বা প্রমা–ত্রিকোণগুলি মিলিত হয়ে যে চরম লোক–ত্রিকোণ বা প্রমা ত্রিকোণ তৈরী করবে তার কেন্দ্রবিন্দু পরম গুণ–ত্রিকোণের কেন্দ্র–বিন্দুটির সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কে সম্বন্ধিত হয়ে মহাবিশ্বের সঙ্গে ব্যষ্টির, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির ও সমষ্টির সঙ্গে মহাবিশ্বের এক পরিপূর্ণ সার্থক গতিশীল সামরস্য প্রতিষ্ঠিত করবে। সর্বস্তরের এই সামরস্য আনবে এক সুসন্তুলিত প্রমাসীনতা। এই প্রমাসীনতা অর্জনের মধ্য দিয়েই মানুষ ভৌতিক স্তরে প্রমা–সংবৃদ্ধি, মানসিক স্তরে প্রমাঋদ্ধি ও আধ্যাত্মিক স্তরে প্রমা–সিদ্ধি অর্জন করেতে সক্ষম হবে। তাতেই ঘটবে সর্বমানবের তথা সর্বজীবের সর্বস্তরে কল্যাণ, প্রগতি ও পূর্ণতা।

প্রমা–২

প্রশ্নঃ ১) ধরা যাক্, কোন দেশে খাদ্যসম্ভার তথা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস–পত্রের ঘাটতি নেই কিন্তু মানুষের মন

কোন একটি বিশেষ মতবাদের নিগড়ে বাঁধা–মানসিক চিন্তার স্বাধীনতা নেই। সেই দেশে কি ভৌতিক বা মানসিক প্রমাত্রিকোণ থাকতে পারে?

উঃঃ না, থাকতে পারে না। ধরা যাক্ প্রকৃতির অকৃপণ দানে বা সে দেশের মানুষের কর্মদক্ষতার ফলে কোন দেশে খাদ্যশস্য বা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব নেই, বরং বলা যেতে পারে প্রাচুর্য্যই রয়েছে। তাহলে সে দেশে জড় প্রমাত্রিকোণ থাকতে পারে না, যদি সংশ্লিষ্ট দেশের প্রতিবেশী দেশগুলির খাদ্যভাব থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ভারতের পঞ্জাব ও হরিয়াণা রাজ্য কিছুটা সম্পদশালী। ওড়িষ্যা, পূর্ব ইউ. পি. ও বিহার খুবই গরীব। তাই ওই এলাকার রাজনৈতিক শান্তি– বিঘ্নিত হতে বাধ্য। আলো ও অন্ধকার একত্রে থাকতে পারে না। আমেরিকা যুক্তরাজ্য খুবই ধনী। আবার কানাডাও ধনী রাষ্ট্র। প্রতিবেশী রাষ্ট্র মেক্সিকো গরীব। তাই ওই এলাকায় জড় প্রমাত্রিকোণ ঠিকমত গড়ে উঠতে পারে না। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির দক্ষিণের দেশগুলি খুবই দরিদ্র। তাই ওই অঞ্চলে জড় প্রমাত্রিকোণ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। **ভৌতিক প্রমাত্রিকোণ ঠিকমত গড়বার**

জন্যে পৃথিবীব্যাপী খাদ্য তথা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ চাই।

মানসিক দিক দিয়েও তেমনি মানসিক প্রমাত্রিকোণ গড়ে উঠতে পারে না যদি মানুষের মনে স্বাধীন চিন্তার অবকাশ না থাকে। মানুষের মন চায় মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত ভাবরাজ্যের বিশাল ব্যপ্তিতে নিজেকে ছেড়ে দিতে। তাই 'ইজম্'-ৰদ্ধ মানুষের সমাজে মানসিক প্রমাত্রিকোণ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

প্রশ্নঃ ২) এমন কতকগুলি রোগ আছে যাদের উৎপত্তি ভৌতিক ক্ষেত্রে, কিন্তু পরে মনে তা রোগে পরিণত হয়। যদি মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা না থাকে তাহলে এই ভৌত-মানসিক ব্যাধিগুলির সম্পূর্ণ নিরাময় কি সম্ভব?

উঃঃ না। মানুষের মানস জগৎ যদি সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য হারিয়ে ঠেলে সেক্ষেত্রে ভৌত-মানসিক ব্যাধির নিরাময় সম্ভব নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে মাক্রোবাইটাম মানব সমাজে ভৌত-মানসিক ব্যাধি সৃষ্টি করতে পারে। এই ধরণের

রোগের উৎপত্তি দেহে কিন্তু কালক্রমে তা মনে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

প্রশ্ন: ৩) ধরা যাক্, কোন দেশের মানুষ খুৱ নীতিবাদী। সে দেশে আবার খাদ্য তথা জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রীরও অভাব নেই। আবার সে দেশের মানুষের চিন্তার স্বাধীনতাও আছে। ভিন্ন মতাবলম্বী লেখকের বই পড়ার বা কোন দর্শন চর্চ্চায় কোন ৰাধাও নেই। সে অবস্থায় আধ্যাত্মিক প্রমা–ত্রিকোণ গড়তে পারে কি না?

উঃ: আধ্যাত্মিক প্রমাত্রিকোণ গড়ে তোলা তখন সম্ভব যখন দেশে ব্যাপকভাবে আধ্যাত্মিকতার চর্চ্চা হচ্ছে। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্যে মানুষের মনে একটা দৃঢ়মূল আধ্যাত্মিক এষণা জাগিয়ে তুলতে হবে। তাই সেখানে আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে তবেই না মানুষের মনে আধ্যাত্মিক এষণা জাগৱে–তাদের আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করবে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যত অধিক সংখ্যক এই ধরণের শিশু–শিক্ষাকেন্দ্র খোলা যায় ততই ভাল। শুধু নীতিবাদের প্রচারের দ্বারা, খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা তথা কিছুটা চিন্তার স্বাধীনতার

দ্বারা, পৃথিবীর কোথাও আধ্যাত্মিক প্রমাত্রিকোণ গড়ে উঠতে পারে না।

প্রশ্নঃ ৪) ক) ধরা যাক্ কোন একটি দেশে খুবই গরীব। সে দেশে খাদ্যের ঘাটতি নেই কিন্তু ভৌতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর ঘাটতি আছে। সে দেশে মানসিক প্রমাত্রিকোণ বা জড় প্রমাত্রিকোণ গড়ে তোলা যাৰে?

উঃঃ স্বভাবতই সেক্ষেত্রে কোন ভৌতিক প্রমাত্রিকোণ বা মানসিক প্রমাত্রিকোণ গড়ে উঠতে পারে না।

খ) প্রশ্নঃ সেক্ষেত্রে সেই দেশের পক্ষে করণীয় কী? তারা কি পার্শ্ববর্তী কোন স্বচ্ছল দেশ আক্রমণ করে জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুসম্ভার সংগ্রহ করবে?

উঃঃ যতদিন সে তার নিজের কৃষিপণ্যের উৎপাদনের বৃদ্ধি না ঘটাচ্ছে ততদিন সে দেশে কোন প্রকার প্রমাত্রিকোণ গড়ে উঠতে পারে না। নিজের ঘাটতি খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্যে পার্শ্ববর্তী দেশ আক্রমণ করলে বা আক্রমণের অভিসন্ধি থাকলে ওই সমগ্র এলাকায় রাজনৈতিক অসন্তোষ ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাই বৃদ্ধি পাৰে-কোন ধরণের প্রমাত্রিকোণ গড়ে উঠতে পারে না।

গ) প্রশ্ন: যদি সেই দেশে জনাধিক্য ঘটে থাকে তাহলে কী ৰাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে উপরি–উক্ত সমস্যার সমাধান করা যায়?

উঃ: ৰাণিজ্যিক আদান–প্রদানের মাধ্যমে কিছুটা সমস্যার সমাধান করা যায়। যেমন ৰাঙলাদেশে রয়েছে উদ্বৃত্ত চামড়া (leather) ও কাঁচা চামড়া (hide) কিন্তু বার্মায় রয়েছে এগুলোর ঘাটতি। দুই দেশের মধ্যে বিনিময় ৰাণিজ্য চলতে পারে বৈ কি।

প্রশ্ন: ৫। ক) পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই কমবেশী ডগমায় ভুগছে। হয়তো সে দেশে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর অভাব নেই। সে দেশে কি আধ্যাত্মিক প্রমাত্রিকোণ গড়ে উঠতে পারে?

উঃঃ না। অবশ্যই না।

প্রশ্ন: ৬) আবার ধরা যাক্ কোন দেশে চিন্তার স্বাধীনতা হয়তো আছে কিন্তু মানুষের মনে অজস্র ডগমা বাসা বেঁধে রয়েছে–সেক্ষেত্রে উপায় কী? ডগমা দূর করার পন্থা কী–পদ্ধতিটা কী?

সূচীপত্র

উঃঃ পৃথিবীর প্রায় দেশই কোন না কোন ডগমায় ভুগছে। কেউ উপধর্মীয় ডগমায়, কেউ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ডগমায়। সাম্যবাদ, ধনতন্ত্র সবেতেই ডগমা জিনিসটা সরষেতে ভূত ঢোকার মত অবস্থায় রয়েছে।

তোমরা জান যে অর্থনৈতিক জগতে ব্যাংকিং প্রথা, সুদ গ্রহণ, মুদ্রার (rolling money) চলমানতা–এগুলি অপরিহার্য কিন্তু ধরো কোন রাজনৈতিক বা উপধর্মীয় মতবাদ এগুলো সমর্থন করল না, তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে দেশ ধাক্কা খেল না কি!

আবার দেখ কোন রেলিজন বা মজহব মানুষকে শিক্ষা দেয়–অহিংসা পরমো ধর্ম, এক গালে চড় মারলে আরেক গাল বাড়িয়ে দেবে। যদি সে দেশ তদানুযায়ী চলতে শুরু করে, তাহলে প্রতিবেশী শত্রুরাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে তাকে তো হাত–পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। এ অবস্থায় কোন প্রকার প্রমাত্রিকোণই গড়ে উঠতে পারে না।

প্রশ্নঃ ৭। ক) যদি কোন দেশে ভৌতিক প্রমাত্রিকোণ, মানসিক প্রমাত্রিকোণ ও আধ্যাত্মিক প্রমাত্রিকোণ গড়ে ওঠে কিন্তু ওই তিন ধরণের প্রমাত্রিকোণ পরস্পর মিলছে না–যা

সূচীপত্র

সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মিলে থাকে–সে ক্ষেত্রে সে দেশের সৎলোকেরা অরাতি–মাইক্রোবাইটামের ধ্বংসাত্মক শক্তির বিরুদ্ধে লড়বে কি করে?

উঃঃ যদি লক্ষ লক্ষ জড় প্রমাত্রিকোণ, মানসিক প্রমাত্রিকোণ ও আধ্যাত্মিক প্রমাত্রিকোণ কোন একটি সামান্য বা অভিন্ন বিন্দুতে মিলিত না হয় তা হলে তাদের মধ্যে পরস্পর টানাহ্যাঁচড়া চলবেৰ..... বিক্রান্ত হয়ে পড়ৰে–বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হৰে। তাদের আভ্যন্তরীণ প্রমা নষ্ট হবে। যদি প্রমাত্রিকোণগুলি অভিন্ন বিন্দুতে মিলিত হয় তা হলে শক্তিত্রিকোণ গুণত্রিকোণের দোর গোড়ায় এসে পৌঁছুবে যদি প্রমাত্রিকোণগুলি বিনষ্ট হয় সেক্ষেত্রে সৎ লোকেরা মিত্র–মাইক্রোবাইটামের সাহায্য নেৰে। কোন কোন মাইক্রোবাইটাম কার্যগতভাবে মানুষের মিত্র, কেউ কেউ কার্যগতভাবে শত্রু। স্বভাবগতভাবে কোন মাইক্রোবাইটামই মানুষের শত্রু বা মিত্র নয়।

"ন কশ্চিৎ কস্যচিত মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিৎ রিপুঃ
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রানি রিপবস্তাথা"।

সৎলোকেদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে স্বভাবগত ভাবে শত্রুভাবাপন্ন মাইক্রোবাইটামেরাও মানুষের ৰন্ধু হয়ে যেতে পারে। যেমন বিষ মানুষের পক্ষে প্রাণঘাতক, আবার বিষ মানুষের প্রাণদায়ক ঔষধও। সর্পবিষ তো একটি সর্বজন স্বীকৃত ঔষধ।

প্রশ্ন: ৮) মিত্র মাইক্রোবাইটামদের কর্মতৎপরতায় উৎসাহ দেবার জন্যে ও অরাতি মাইক্রোবাইটামদের কর্মতৎপরতা প্রতিহত করার জন্যে পৃথিবী সহ সমগ্র বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা কি ঢেলে সাজানো উচিত?

উঃ–মাইক্রোবাইটামের কর্মক্ষেত্র কেবল ভৌতিক জগৎই নয়, মনোজগতও। তবে আধ্যাত্মিক জগৎ তাদের কর্মের অধিক্ষেত্র নয়। কারণ তারা ভূমামানসের প্রতিসঞ্চর ধারায় সৃষ্ট। তাই তারা জীবের আধ্যাত্মিক সংরচনাকে আহত করতে পারে না–তবে ভৌতিক ও মানসিক আধারকে অবশ্যই আঘাত হানতে পারে। সকল দেশের তথা সকল গ্রহের শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি উপযুক্তভাবে তৈরী করা যায়, তবে মানুষের ভৌতিক, মানসিক, মানসাধ্যাত্মিক ও আধ্যাত্মিক আধার মিত্র–মাইক্রোবাইটামের সাহায্য পেতে পারে।

সূচীপত্র

ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

সর্বাত্মক বিমুক্তির নব্য-নীতিচেতসা

এ যাবৎ বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে অঙ্গারাণু বা অঙ্গার-পরমাণুকে মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহার না করে কোন সত্তা-সংরচনাই তৈরী হতে পারে না। অর্থাৎ অঙ্গারাণুর সাহায্য ব্যতিরেকে কোন সংরচনার অস্তিত্ব, সংখ্যাবৃদ্ধি তথা অবক্ষয় আদৌ সম্ভব নয়। যা অঙ্গার-জাত ও যা অঙ্গার-সঞ্জাত এমন সব কিছুই (carbon and non-carbon) মাইক্রোবাইটাম থেকেই তাদের নিজ নিজ পারমাণবিক সংরচনার পেয়ে থাকে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মাইক্রোবাইটামের স্থানিক আধার (space)-এর প্রয়োজন থাকলেও বাস্তবে তার দরকার নেই কিন্তু পারমাণবিক সংরচনার তাত্ত্বিক বা বাস্তব উভয় দিক দিয়েই স্থানের প্রয়োজন রয়েছে। মাইক্রোবাইটাম আদৌ অঙ্গারসঙ্গাত নয়।

সূচীপত্র

অঙ্গার–পরমাণু সংরচনার কথাই ধরা যাক। একটা পরমাণুর নিয়ন্ত্-কেন্দ্র (nucleus)–এর চারপাশে বিদ্যুতাণুগুলো (electrons) ঘুরতে থাকে। পরমাণুর ওজন তার নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের ভর (mass)–এর পরিমাণ দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়। দু'টো পরমাণুর মধ্যে যে পার্থক্য তা প্রধানতঃ দু'টো নিয়ন্ত্রণ–কেন্দ্রের মধ্যেকার পার্থক্য। এ ব্যাপারে বিদ্যুতাণুর ভরের বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। একটা পরমাণু নিয়ন্ত্রণ–কেন্দ্রকে যদি ভেঙ্গে ফেলা যায় তবে বিপুল পরিমাণ শক্তি বা তাপ অবশ্যই নির্গত হবে। এটা সত্যিই যে জীবকোষের সংরচনা অঙ্গার–পরমাণুর ওপর নির্ভরশীল। একটা মাত্র মাইক্রোবাইটাম দিয়ে একটা অঙ্গারাণু তৈরী হয় না। কোটি কোটি মাইক্রোবাইটাম মিলিতভাবে একটা অঙ্গারাণু সৃষ্ট করে। সাধারণতঃ বা স্বভাবতঃ একটা পরমাণু অ–সমসত্ত্ব প্রকৃতির ও বিশেষ পরিস্থিতিতে সমসত্ত্ব প্রকৃতির। একটা পরমাণু বা বহু পরমাণুর সংযোগে তৈরী হচ্ছে একটা অণু আর অনেক অণু সমাহৃত হয়ে মৌলের (element) পর্যায়ভুক্ত হচ্ছে। এই মৌল হয় সমসত্ত্ব প্রকৃতির, যেমন হাইড্রোজেন, কার্বণ, হিলিয়াম প্রভৃতি–নয়তো অসমসত্ত্ব প্রকৃতির যেমন হাইড্রোজেন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন–ডাই–অক্সাইড ইত্যাদি। একটা পরমাণু আভ্যন্তরীণ দিক

থেকে ও বহিরঙ্গের দিক থেকে সমসত্ত্ব ও অসমসত্ত্ব দুই ধরণেরই হতে পারে। একটা অণু সম্পর্কেও ওই একই কথা খাটে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বেশীর ভাগটাই অসমসত্ত্ব প্রকৃতির ও বহিরঙ্গের দিক থেকে সমসত্ত্ব প্রকৃতির। সুতরাং একটা পরমাণু অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সমসত্ত্ব ও অসমসত্ত্ব প্রকৃতির কিনা তদানুযায়ী তার বৈয়ষ্টিক মহিমা নির্দ্ধারিত হয়।

হাইড্রোজেন, সালফার ও অক্সিজেন সংযুক্ত হয়ে সালফিউরিক এসিড তৈরী হয়। সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রায়, নির্দিষ্ট চাপে ও নির্দিষ্ট অনুপাতে যখন তারা সংযুক্ত হয় তখন আমরা সালফিউরিক এ্যাসিড পাই। এর যদি উপকরণগুলোর একটারও তারতম্য ঘটে তবে ফলাফলও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

অঙ্গারাণুর সাহায্য ব্যতিরেকে জীবপঙ্কীয় সংরচনাই তৈরী হতে পারে না। জীবপঙ্কীয় কোষগুলো মূলতঃ অসমসত্ত্ব প্রকৃতির অণুপুঞ্জের সমাহারমাত্র। **যদি জীবপঙ্কীয় কোষগুলির নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রকে বিশ্লিষ্ট করা যায় তাহলে তারা যে বিপুল পরিমাণ শক্তি বিচ্ছুরিত করে, তার পরিমাণ পারমাণবিক বিস্ফোরণের চেয়ে অনেক গুণ বেশী।**

স্বভাবতই জৈবসংরচনা, যা কোটি কোটি জীবপঙ্খীয় কোষের সমাহৃত রূপ, তার মধ্যে এত বিপুল পরিমাণ শক্তি নিহিত রয়েছে যে তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।

কোটি কোটি মাইক্রোবাইটাম মিলে তৈরী করে একটি মাত্র অঙ্গারাণু। এই কারণেই বলা যায় না যে সব কিছুই অঙ্গরাণুসঞ্জাত। বরং এ কথা বলাই সঙ্গত যে অঙ্গারাণুগুলিই এসেছে মাইক্রোবাইটাম থেকে। কেবল অঙ্গারাণুই নয়, অন্যান্য সমস্ত অণুকণাও মাইক্রোবাইটাম-সঞ্জাত। স্বভাবতই রসায়ন শাস্ত্র, জৈব রসায়ন (bio-chemestry) ও জড়বিজ্ঞানের অন্যান্য সকল শাখাতেই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংশাধিত হবে। এমন একদিন অবশ্যই আসৰে যে দিন গণিতশাস্ত্রের এক 'ওমেগা' ও জৈব-রসায়নের এক 'ওমেগা' একে অপরের দ্যোতক হিসেবে চিহ্নিত হবে। এযাবৎ প্রচলিত যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সূত্র ও তত্ত্বকে নোতুন করে ভেঙ্গে তৈরী করতে হবে, নোতুন করে তাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে ও নোতুন করে শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে।

যখন একটা পরমাণুই সাধারণ অণুবীক্ষণ তথা সাধারণ দূরবীক্ষণের আওতায় আসছে না তখন যে মাইক্রোবাইটাম পরমাণুর চেয়ে অজস্র গুণ সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র তারা কি করে

সাধারণ অণুবীক্ষণ বা সাধারণ দূরবীক্ষণের পরিভূ-তে আসে বা মানসস্তরে জৈব ইন্দ্রিয়ানুভূতিগত বা তন্মাত্রাধিগত হতে পারে?

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জৈব-অজৈব নির্বিশেষে অঙ্গার-সঞ্জাত প্রতিটি সত্তা-সংরচনারই মন আছে। অর্থাৎ প্রতিটি সংরচনার সঙ্গেই একটি করে মন সংযুক্ত হয়ে রয়েছে-কোথাও বা ব্যক্তরূপে, কোথাও বা অব্যক্তরূপে। মন যেখানে ব্যক্ত নয় সেখানে চিত্তকৌষিক আবরণী (endoplasmic-coverage) তৈরী হয়নি, আর মন যেখানে ব্যক্ত সেখানে এই চিত্তকৌষিক আবরণী থাকতেই হবে। মন থাকলেই তার অঙ্গারাত্মক (carbonic) ও নন-কার্বনিক আভোেগ থাকতেই হবে। মানসিক আভোগ যেখানে অঙ্গারাত্মক সেখানে মনের গতি স্থূলত্বের দিকে অর্থাৎ জড়াভিমুখী। আর মানসিক আভোগ যেখানে নন-কার্বনিক ধরণের মনের গতি সেখানে সূক্ষ্মত্বের দিকে। নন-কার্বনিক মানসভোগ মানুষের মনকে অতিমানস ও আধ্যাত্মিক জগতের দিকে প্রধাবিত করে। তাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক সাধক তাঁর খাদ্যাখাদ্য নির্বাচন ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন। অঙ্গারাত্মক আভোগ মানুষের জৈব আধারের অস্তিত্ব তথা পুষ্টিসাধনে সাহায্য করে, আর নন-কার্বনিক

সূচীপত্র

আভোগ মানুষের মানস সংরচনাকে মজবুত করে। মানুষ যদি অবিবেচনার বশবর্তী হয়ে ত্রুটিপূর্ণ অঙ্গারজাত খাদ্য গ্রহণ করতে থাকে, তা তার মানসিক শক্তিত্রিকোণকে দারুণভাবে বিপর্যস্ত করবে। তাতে তার মানসাধ্যাত্মিক প্রগতি ব্যাহত হৰে। কালক্রমে এমন একটা অবস্থা আসবে যখন মানুষের জৈব আধারের মননশীলতা প্রায় স্তম্ভিত হয়ে যাবে। পাষাণী অহল্যার পৌরাণিক গল্পের কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

মানুষ নন–কার্বনিক মানস আভোগ থেকে যত দূরে সরে যায় ও উত্তরোত্তর যত জড় আভোগে বা অঙ্গারাত্মক আভোগে ডুবে থাকে, তাতে দু'টো বড় রকমের কুফল দেখা যায়। প্রথমতঃ তার নিজের জড় আভোগের আধার বৃদ্ধি পাৰে, আর মন ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে স্থূল জড়ের দিকে ধাবিত হবে। দ্বিতীয়তঃ সেই মানুষটির মন অন্যের অঙ্গারাত্মক আভোগকে গ্রাস করতে চাইবে। এটিই হ'ল সাম্রাজ্যবাদ (imperialism)–এর উৎপত্তির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হ'ল মানুষের মনে ও তা মানুষের মানস জগতেই কাজ করে যায়। যখন বাইরের জগতে এই সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাই নানান রূপে প্রকাশিত হতে থাকে–

যেমন ধনতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র, অর্থনৈতিক সাম্যবাদ, সংকীর্ণতাবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, প্রাদেশিকতাবাদ, জাতি প্রাধান্যবাদ, পুরুষ-প্রাধান্যবাদ, ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি (একবার আমি একটা ৰর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে গেছলুম। সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীর মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু দেখলুম সেই গ্রামটিতে, এমনকি প্রাইমারী স্কুলেও মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্তে হিন্দী পড়ানো হচ্ছে। এটা হ'ল ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের একটি জলন্ত উদাহরণ)। এই সবই হ'ল সেই সাম্রাজ্যবাদী-রূপী মানসব্যাধির আকৃতি-প্রকৃতিগত পার্থক্যমাত্র।

এই মানসিক ব্যাধির জন্যেই একটা বৃহৎ শক্তি (super power) তার সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের প্রেষণায় দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর হামলা করে। উদ্দেশ্য থাকে একটাই-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক স্বার্থকে কায়েম করা। একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অন্যান্য সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়, শোষণ করতে চায়, তার কায়েমী স্বার্থকে বিস্তৃত ও সংহত করতে চায়। একটা শক্তিশালী ভাষাগতগোষ্ঠী অন্য সংখ্যালঘু ভাষাগতগোষ্ঠীকে দাবিয়ে রাখতে চায়; সমাজের তথাকথিত

উচ্চবর্ণের লোকেরা সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকেদের পদানত করে রাখতে চায় ও ছলে-বলে-কৌশলে তাদের প্রাণরসকে নিংড়ে শুষে নিতে চায়। সুবিধাবাদী পুরুষ সমাজ নানানভাবে নারীজাতীর অধিকারকে খর্ব করতে চায়। এক কথায় সর্বক্ষেত্রেই সেই সাম্রাজ্যবাদরূপী অন্তর্নিহিত মানসিক ব্যাধিটাই কাজ করে যায়।

সাম্রাজ্যবাদ স্পষ্টতই মানবতাবিরোধী। নব্য-মানবতাবাদী নীতির ও মৌল মানবনীতির বিরোধী তত্ত্ব হ'ল এই সাম্রাজ্যবাদ। মানব সমাজে প্রমাসংবৃদ্ধি, প্রমাসমৃদ্ধি ও প্রমাসিদ্ধির পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষতিকারক এই সাম্রাজ্যবাদ। এক কথায় বলতে গেলে সাম্রাজ্যবাদ মানব প্রগতির পক্ষে বাধা স্বরূপ। এই সাম্রাজ্যবাদ থেকেই জন্ম নেয় বড় বড় বিশ্বযুদ্ধ, নানান ধরণের ভেদমূলক ধ্বংসাত্মক শক্তি।।

সাম্রাজ্যবাদ অবশ্যই এক ঋণাত্মক শক্তি-একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাপার। এই সাম্রাজ্যবাদ বৈয়ষ্টিক ও সামূহিক জীবনে অন্যায়, অবিচার ও শোষণের পরিবেশ গড়ে তোলে। এই বিষাক্ত কলুষিত পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই ঋণাত্মক শক্তির (যেমন অরাতিসুলভ মাইক্রোবাইটাম) প্রার্দুভাব ঘটে। অরাতিসুলভ মাইক্রোবাইটামরা আরও সুংসহত ও সুসংবদ্ধ

হয়ে মানব সমাজের বিভিন্ন দিকে সাম্রাজ্যবাদের দানবীয় কার্যকলাপের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। চারুকলা, সাহিত্য, শিক্ষা, ব্যবসা–বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, নৈতিকতা ও সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিকে তাদের অশুভ প্রতিফলন ঘটে। তারা এমন একটা ভয়াবহ সামাজিক পরিবেশ তৈরী করে যাতে মানুষের মনে দাসত্ববোধ হীনম্মন্যতাবোধ দানা বাঁধে, অসংস্কৃতি ও মানসিক–অর্থনৈতিক শোষণের পথ প্রশস্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই কারণে মানুষের মনে একটা প্রচণ্ড রকমের নৈরাশ্যবাদ ও সন্দেহবাদের সৃষ্টি হয়।

তাহলে দেখছি যে এই সাম্রাজ্যবাদরূপী ব্যাধিটি মানুষের মনে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে। এই সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদকে দূর করতে গেলে আজকে প্রয়োজন এক নব্য নীতিচেতসা (New–Ethics)–র। এই নব্য নীতিচেতসা দু'টি মূলতত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে– (১) এক পরম সার্বভৌম সত্তাকে অর্থাৎ পরমপুরুষকে জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। (২) অঙ্গারাত্মক বা জড়–আভোগের সঙ্গে নন–কার্বনিক আভোগের একটা সুন্দর সামঞ্জস্য ও সুসন্তুলিত সামরস্য বজায় রাখতে হবে। আজকের যুগে এটাই হ'ল নব্য নীতিচেতসা। বহির্জগতে ও মনোজগতে

আজকে যে সমস্ত সামাজিক ব্যাধি ও মানসিক ও শারীরিক রোগ দেখা দিয়েছে তা নিরাময়ের একমাত্র ঔষধ হ'ল নব্য নীতিচেতসা। এই নব্য নীতিচেতসার সম্প্রয়োগে মানব সমাজের ঘটৰে সর্বাত্মক বিমুক্তি–অপসারিত হৰে অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নির্যাতন, উপধর্মীয় কুশিক্ষা, সাংস্কৃতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা তথা সামাজিক প্রভুত্ব স্থাপনের অপপ্রয়াস।

দশম খণ্ড

সূচীপত্র

মানুষের সাহিত্য ও শিল্প–সাধনা

'সাহিত্য' শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য তার নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। জীবনের গতির সহিত অর্থাৎ সঙ্গে চলাই যার ধর্ম তাকেই বলি 'সাহিত্য'। সাহিত্য সমাজ–জীবনের বাইরেকার কোন উদ্ভট কল্পনা নয়, কোন অবাস্তব আকাশ–কুসুমের রঙীন নেশা নয়–সাহিত্য বাস্তব জীবনের ছবি, মনের গোপন কোণের ভেতরকার আলেখ্য, অন্তরের অন্তস্তলে চেপে' রাখা দীর্ঘশ্বাসের বলিষ্ঠ প্রকাশ। নামের মর্যাদা রাখতে গেলে একে গতিশীল সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বেঁচে' থাকতে হবে।

'সাহিত্য' শব্দের আরেকটা অর্থ করা যেতে পারে 'স+হিত–'হিতেন সহ', অর্থাৎ হিতের সঙ্গেই যার অস্তিত্ব। যেখানে হিতের ভাবনা নেই সেখানে 'সাহিত্য' শব্দটাও ব্যবহার করতে পারিনে। যাঁরা বলেন 'আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্' (Art for art's sake) তাঁদের যা' রচনা, তাঁদের যা' সৃষ্টি, তাকে আর যা–

সূচীপত্র

ই বলি না কেন সাহিত্য বলতে পারি না। 'হিত' কথাটা লৌকিক জগতে একটা আপেক্ষিক জিনিস। দেশভেদে, কাল–ভেদে, পাত্রভেদে ওর সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হ'তে থাকে বা হ'তে পারে। কিন্তু এই 'হিত' শব্দের যে ভাবটি পারমার্থিক সত্যের পাশটিতে মানুষকে নিয়ে পৌঁছিয়ে' দেয় তা' সকলের কাছে সর্বদেশে ও সর্বকালে একই। অবশ্যই বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ভাবের ভাবুকের সঙ্গে সংযোগ রাখবার জন্যে একই হিত ভাবটিতে বহু শাখা–প্রশাখা–উপশাখা বিস্তার করতে হয়। এই বহুধাবিস্তারিত পত্র–পুষ্প–যুক্ত যে বৃহৎ হিতাত্মক ভাবধারা যার এক প্রান্তে রয়েছে মাটির মানুষ আর এক প্রান্তে রয়েছে চরম আনন্দঘন ভাব–একেই বলি সাহিত্য। কারণ এই হিতাত্মক ভাবধারায় প্রতিটি অণু পরমাণুতে প্রতিটি ছন্দ–বৈচিত্র্যে পরম শ্রেয়ের ভাবই নিহিত রয়ে' যাচ্ছে। তাই বলতে হচ্ছে সাহিত্যে তারই নাম যা' সমাজের সঙ্গে চলে, যা সেবার প্রেরণা যুগিয়ে' প্রকৃত কল্যাণের পথে, প্রকৃত সিদ্ধি–ঋদ্ধির পথে নিয়ে যায়। 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্' (Art for art's sake) কথাটা তাই গ্রহণযোগ্য নয়, বরং বলা উচিত 'আর্ট ফর্ সার্ভিস এ্যাণ্ড ব্লেসেডনেস' (Art for service and blessedness)।

এই বিশ্ববৈচিত্র্যের প্রতিটি দ্যোতনায়, প্রতিটি স্তরবিন্যাসে– তা' সে যত স্থূল বা যত সূক্ষ্মই হোক না কেন–একটি সুর–ধরাই বয়ে' ছলেছে, যে সুর আনন্দ–প্রাপ্তির সুর। তার গতিতে একই সঙ্গে আনন্দ পাওয়া ও আনন্দ দেওয়ার ভাবই ফুটে' চলেছে। সাহিত্যিক যখন সাহিত্য সেবায় বা সাহিত্য সাধনায় নাৰেন তখন তাঁর সর্জনী–প্রতিভাকে এই স্রোতধারাতেই বইয়ে' দিতে হয়। ব্যষ্টিগত জীবনের যা কিছু পঙ্কিলতা, যা' কিছু অশিব তা 'বিশ্ব–জনীন মানসিকতার পূত বারিতে ধুয়ে শুচি–শুভ্র করে বিশ্বমানবের মর্মে মধুর ভাবে পৌঁছিয়ে' দিতে হয়। এইখানেই তাঁর সেবার সার্থকতা, এইখানেই তাঁর সাধনার সার্থকতা। ব্যষ্টি–জীবনের কল্যাণমধুর ভাৰটি সমষ্টি–জীবনকে যদি অনুপ্রাণিতই না করতে পারল তবে সে সৃষ্টিকে কালপর্যায়ভুক্ত কিছুতেই করতে পারিনে। সাহিত্যকে যে সেবা–ধর্ম হিসেবে বা সাধনা হিসেবে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম সে যেন ৰড় বড় বুলির আড়ালে নিজের পঙ্কিল চিন্তাধারাকে লুকিয়ে' রেখে সমষ্টি–মানসের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা না করে। সে যেন না বলে, "আমি সমাজের ছবি আঁকছি, এই এঁকে' দেওয়াটাই আমার ধর্ম, প্রতিবিধানের ব্যবস্থা সমাজ অবস্থার চাপেই করে' নেৰে।" বিচারের কষ্টিপাথরে এই জাতীয় তথাকথিত সাহিত্যিককে

সাহ্যিত-সেবী বা সাহিত্য-সাধক না বলে' সাহিত্য-ব্যবসায়ী বলাই অধিকতর সঙ্গত কারণ তারা হিতের ভাব নিয়ে পথ চলছে না। তারা জন-সমাজকে দেখছে তাদের পুস্তকের ক্রেতা হিসেবে, ব্যবসায়ীর চশমা চোখে এঁটে।

কলাসৃষ্টির উদ্দেশ্যই আনন্দ দেওয়া। যে আনন্দ জন-সাধারণের মধ্যে বিতরণ করতে হবে তার পরিবেশককে জন-সাধারণের দৈনন্দিন জীবন থেকে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নামেশা আটপউরে ঘটনাপ্রবাহ থেকে দূরে থাকা সম্ভব নয়। যাদের জীবনের সঙ্গে সাহিত্যিককে মিলেমিশে' থাকতে হবে (সাহিত্যিকও তাদেরই একজন) তারা এই পৃথিবীর মাটির মানুষ। তারা অন্ধকারের আবর্ত থেকে' পরিত্রাণ পেতে চায়, তারা প্রতি মুহূর্তে নবতর আলোকে নিজেদের প্রাণ-মন উদ্ভাসিত করে' নিতে চায়। তাই তাদের মধ্যে তাদের প্রতিটি ক্রিয়া, প্রতিটি সংবেদনের মধ্যে রয়েছে একটা এগিয়ে' চলার ভাব। তাই তাদের যদি কোনও কিছু দিতে হয়, কলাস্রষ্টাকে স্থির হয়ে' এক ঠাঁই বসে থাকলে কিছুতেই চলবে না।

মানবগোষ্ঠী তার যাত্রাপথে সময় সময় ত্রস্ত-চকিত হয়ে' থেমে' যেতে চায়। কখনও বা পথ-শ্রমে ক্লান্ত হয়ে' বা আশাহত হয়ে' হাঁটু ভেঙ্গে' বসে' পড়ে। প্রতিভা-শক্তির

অধিকারী সাহিত্যিকের দায়িত্ব সেই সময়টিতে সব চাইতে বেশী করে দেখা দেয়। তাই জনসাধারণের জন্যে যখনই সে এগিয়ে' চলার গান গেয়ে' যায় তখনই তাকে আর একটা বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হয়, সেটা হচ্ছে প্রতিটি সৃষ্টির পরে একবার ভাল করে' তাকিয়ে দেখা–যাদের জন্যে গান গাইলুম তারা ঠিক আমার সঙ্গে চলতে পারছে তো! আমার সংবেদন তাদের মর্মে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে তো! আমার সেবায় তাদের সত্যিকারের হিত হচ্ছে তো! সাহিত্য জগতে বরমাল্য তাঁরাই পেয়ে' থাকেন যাঁরা সাহিত্যিকের এই দাযিত্ব সম্বন্ধে সদা সচেতন।

সত্যিকারের সাহিত্য–সাধক শুধু বর্তমানেরই প্রতিভূ নন, তিনি অতীতের চারণ, ভবিষ্যতের বার্তাবহ। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের প্রাবাহিক সম্পর্কটুকু বুঝে' নিয়ে তিনি ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও যথাযথভাবে দিতে সক্ষম। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তাঁর রচনার একসূত্র সুন্দরভাবে গাঁথা হয়ে' থাকে। শুধু ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখে' গেলেই তো চলৰে না, একথা মনে রাখতেই হবে যে ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনাই বর্তমানের গর্ভে ৰীজ–রূপে রয়েছে, যেমনধারা এই বর্তমান অতীতের বুকে নিহিত ছিল। তাই শিল্পী তাঁর সর্জন–ধর্মের অনুশীলনে

বর্তমানের নিখুঁত আলেখ্যকে স্থান তো দেবেই, তার সঙ্গে সঙ্গে হিতের ভাবনা ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও দেখিয়ে' বুঝিয়ে যাবে।

সাহিত্যিক যখন যে সম্ভাবনা জগতের সামনে তুলে' ধরেন তা যেন বর্তমানের একটি সুস্থ পরিণতিরূপেই প্রদর্শিত হয় অথবা বর্তমানের চিত্র আঁকবার সময় তার স্বাভাবিক পরিণতি–টুকুও নিখুঁতভাবে দেখিয়ে' দেওয়া হয়। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বা বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্পর্কটুকু যেন কার্য–কারণতত্ত্বের প্রতিটি স্তরকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে' তুলেই সৃষ্ট হয়। কারণের স্বাভাবিক পরিণতিই যে এক বিশেষ সময়ে বা বিশেষ দেশে বা বিশেষ পাত্রের কাছে কার্যরূপে আখ্যাত হয় একথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলে' থাকা চলবে না। কেননা, এদের মধ্যেকার সংলগ্নতাই মানুষকে লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিলিয়ে' দেয়। এই প্রাণগত সমতা, এই গতিধর্মিতার একত্ব না থাকলে পাঠক কোন রচনাকেই নিজেদের জিনিস মনে করে' গ্রহণ করতে পারে না। আর সে অবস্থায় সেই গণমানস সম্পর্ক–বর্জিত রচনার লেখককে আর যাই বলি না কেন সাহিত্যিক বলতে পারিনে। তাঁর লেখাকে বড় জোর রচনা আখ্যা দিতে পারি, সাহিত্য নয়।

আগেই বলেছি, হিতের ভাবনা নিয়ে সঙ্গে চলার নাম সাহিত্য, কিন্তু যে সাহিত্য হিতের ভাবনা নিয়ে চলতে চলতে বেশী এগিয়ে' পড়েছে, সম্পূর্ণ কেটে' ছেঁটে না ফেললেও ঠিক এক সঙ্গে চলছে না অথচ যখনই তাকাই তখনই তাকে সঙ্গে সঙ্গে না পেলেও কাছে কাছে পাই, সেই রকমের সাহিত্যকে যুগ–সাহিত্য ৰলৰ না, ৰলৰ 'তটস্থ'–সাহিত্য'। সর্বদাই এগিয়ে' থাকায় এ সাহিত্যের আয়ুষ্কাল অবশ্যই বেশী; কিন্তু তবু যুগ–বিশেষের বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার কাজে এ সাহিত্যের মাহাত্ম্য কিছুটা ফিকে বলে' মনে হয়। যুগ–সাহিত্যের সব চাইতে বড় লক্ষণ এই যে সে স্পষ্ট ভাষায় যুগের দাবী প্রকাশ করে' থাকে। জনসাধারণের সে ঠিক হাতটি ধরে' ধরে' চলে। যুগসম্যায় জর্জরিত মানব–মনের ছোট–বড় গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্বহীন প্রতিটি কথা বা প্রতিটি ঘটনা যুগের ভাষাতেই সকলের কাণে তুলে' দেয়। এ যুগসাহিত্য যা' যুগের দাবী মেটাবার জন্যেই সৃষ্ট হয় তা' যদি ষোল আনা আন্তরিকতা তথা হিতের ভাবনা থাকা সত্বেও যুগের মানুষের চাইতে খুব বেশী গতিশীল হয়ে' পড়ে তবে সঙ্গে চলার গুণ নষ্ট হয়। তার সব মূল্যই নষ্ট হয়ে' যায়। তটস্ত সাহিত্যের মত প্রতিষ্ঠা অর্জনের কোন সম্ভাবনা তার মধ্যে না থাকায় সাহিত্যিকের সমস্ত স্বপ্নই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই যুগের প্রয়োজনে

সৎসাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে, সাথে সাথে চলতেই হবে, গতির ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতেই হবে। দু'-চার পা এগিয়ে' যেতে পারো, কারণ সাহিত্যিক পথ-প্রদর্শক, কিন্তু বেশী এগিয়ে যাওযা চলবে না, পেছিয়ে' যাওয়া তো চলৰেই না।

চলা জীবনের ধর্ম। তাই চলতে তো হৰেই। যে গতি-শীলতা হারিয়ে ফেলেছে সে তো মৃত! বিশ্বের সব কিছু ভাঙ্গা-গড়া-রাখার অধিকার গতিশীলদেরই আছে- মৃত স্থাণুদের নেই। সাহিত্যিক মানুষকে মৃত্যুর জড়তার মধ্যে তো ফেলে' দিতে পারে না। কারণ সে চাওয়ার মধ্যে তো হিতের ভাবনা নেই। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে পথ চলার গানই গেয়ে' চলৰে। অনন্ত জীবনের মধুরসেই মানবমনকে তৃপ্ত করতে থাকৰে।

বিশ্বে আজ সাহিত্য নামে যে জিনিসটি চলছে তার অধিকাংশই সাহিত্য নয়-রচনা মাত্র। সাহিত্যিককে তার কলমের প্রতিটি আঁচড়েই বিরাট দায়িত্বৰোধের পরিচয় দিতে হবে। তাই সত্যিকারের সাহিত্যিক হ'তে গেলে কেবল ভাষা বা ভাব থাকলে চলৰে না, তার চাইতে বেশী আরও কিছু চাই। প্রতিটি বস্তুর ভেতরে প্রবেশ করবার শক্তি-মন দিয়ে প্রতিটি মনকে নিজের মনে মিলিয়ে' ফেলবার সাধনা। সোজা

কথায় বলতে গেলে তাকে তত্ত্বদর্শী হতেই হবে। জীবন সম্বন্ধে সামান্য ভাসা-ভাসা জ্ঞান নিয়ে ভাষায় তুবড়ি ছুটিয়ে' সাহিত্য তৈরী করা যায় না। বৈদিক ভাষায় সাহিত্যিককে কবি বলা হত। কারণ 'কবি' শব্দের অর্থ তত্ত্বদ্রষ্টা। কেবলমাত্র তত্ত্বদ্রষ্টারাই সত্যিকারের সাহিত্য গড়ে' তুলতে পারে। সাহিত্যিকদের কাজ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেওয়া। আর এই ভবিষ্যৎকে দেখবার সামর্থ্য কেবল তত্ত্বদ্রষ্টাদেরই আছে। যারা মনে করে বর্তমানের বা অতীতের বা ভবিষ্যতের ছবিটুকু এঁকে দিয়েই আমি দায়ে খালাস-তারা সাহিত্যিক নয়। কারণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান-কালের এই তিনটে ভাগের ওপর অধিকার নির্ধারিত হয় এই তিনের সংযোজনী শক্তির আত্মস্থীকরণের ওপর। যে এই প্রৱাহিক শক্তিকে আত্মস্থ করতে পারেনি সে কিছুতেই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বা বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারে না। তাই তার আঁকা ভূত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন ছবিই যথাযথভাবে ফুটে' উঠতে পারে না। তাই বলছিলুম এদি'কে সাহিত্যিক না বলে' রচনাকার বলাই অধিকতর সঙ্গত। এই শ্রেণীর রচনাকারেরাই 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্' (Art for art's sake) উক্তিটি ব্যবহার করে' থাকেন। একটু তলিয়ে' ভেবে' দেখলে সবাই একথা মানতে বাধ্য হৰে যে আর্ট (Art)

জিনিসটাকে আর্টের খাতিরে ফেলে' রেখে' দিলে মানুষ সমাজের ওপর তার প্রভাব কতখানি ক্ষতিকর হতে পারে।

জগৎ ভূমামানসের কল্পনাধারা (thought-projection of cosmic mind), তাই এর কোথাও ক্ষণেকের তরেও থেমে' থাকবার জো নেই। ইচ্ছা থাক বা না থাক, মানুষের সমাজ, মানুষের পরিবেশ পরিবর্তনের মাঝ দিয়ে' সামনের পানে এগিয়ে যাবে, যেতেই হৰে। সাহিত্য জিনিসটা এই গতিশীল মানুষেরই মানসিক অভিব্যক্তি। এই গতিশীল মানুষের প্রয়োজনেই তার সৃষ্টি; তাই সেও কোন স্থির-সত্তা হ'তে পারে না, হ'তেই পারে না। যে সমাজের আলেখ্য শিল্পীর তুলিতে ধরা পড়ে, যে ভাবধারার স্ফুরণ সাহিত্যের মাধ্যমে হয় তার ভাবসঞ্চারী তত্ত্ব গুলো যখন পরিবর্তনশীল তখন শিল্পী বা সাহিত্যিককে সব সময়েই সেই তত্ত্বগুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে' কাজ করে' যেতে হবে। সমাজের গতি অনেকগুলো তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল হ'লেও মূলতঃ তার গতি নির্ধারিত হয় মানসিক তথা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দ্বারা।

(১) মানসিকতার পরিবর্ত্তন:- এই মানসিক পরিবর্তন যদিও একটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থা তবু এ পরিবর্তন সর্বকালে একভাবে হয়নি, হচ্ছে না বা হবে না। বাস্তব জগতের বিভিন্ন

প্রয়োজনে বস্তুতান্ত্রিক সমস্যাগুলোও যখন যেভাবে জেগে' থাকে তার সমাধানের জন্যে মানুষকে তখন সেইভাবে চেষ্ঠায় লেগে' পড়তে হয়। আর এই চেষ্ঠার রসদ জোগাবার জন্যে মানসিকতাকেও কোথাও দ্রুতগতি, কোথাও মন্দগতি হ'তে হয়। আজ থেকে প্রায় দশ লক্ষ বৎসর পূর্বে যখন পৃথিবীতে প্রথম মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল তখন তাদের মানসিকতা যে গতিতে এগিয়ে' চলত আজ থেকে দশ সহস্র বৎসর পূর্বে কিন্তু সে গতির বেগ অনেক বেড়ে' গিয়েছিল। আগেকার মন এগিয়ে' চলত অত্যন্ত ঢিমে–তালে। পুরুষানুপুরুষক্রমে একই পরিবেশে, একই সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে তারা দিন কাটাত। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে' তারা তৃণ–গুল্ম খেয়ে', প্রস্তরের অস্ত্র ব্যবহার করে' মানব–সভ্যতার পরিচয় বহন করে' চলেছিল। তারপর পশু–মাংস ভক্ষণ–সেও তারা আয়ত্ত করতে বেশ দুই/তিন লক্ষ বৎসর সময় নিয়েছিল। অগ্নি আবিষ্কারের পর – দগ্ধ মাংসে লবণ ব্যবহারের প্রথাও তারা সহজে শেখেনি। কিন্তু আজ থেকে দশ হাজার আর পাঁচ হাজার বছরের মধ্যবর্তীকালের মানব সভ্যতার দিকে তাকালে দেখতে পাই, অনেক দ্রুত গতিতে তারা এগিয়ে' চলেছে। প্রতি দু'–তিন শ' বছরের মধ্যে এক একটা নোতুন নোতুন আবিষ্কার হয়েছে। নোতুন নোতুন বস্তুর সংস্পর্শে আসার ফলে

সূচীপত্র

মানসিকতাতেও সময় সময় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসেছে, পশুপালন ছেড়ে' কৃষিজীবিকা গ্রহণ করতে হয়েছে। বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠী সমাজৰদ্ধ হয়েছে, তবু এই পাঁচ থেকে দশ হাজার বছরের মধ্যবর্তীকালে কোথাও দৃঢ়নিৰদ্ধ সমাজব্যবস্থা আমরা পাই না। এদের বিভিন্ন অংশে আমরা পেয়েছি সমাজ–ঘটনের সর্বতোমুখী প্রায়াস। এই পাঁচ হাজার বৎসর–কাল ধরে' মানুষ জাতির যে বিভিন্নমুখী অগ্রগতি, যাকে বর্তমান কালের পরিপেক্ষিতে মোটেই দ্রুতগামী বলতে পারিনে, তারই একটা অস্পষ্ট আলেখ্য পাই বেদে অর্থাৎ বেদ সেই মানসিকতারই সাহিত্যিক প্রতিফলন। তবু সে যুগে, সেই অন্ধকারের বুক–চেরা আলোক–প্রতিফলনের যুগে মানুষ এক সঙ্গে দ্রুততর গতিতে চলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল। বেদের কয়েকটি মন্ত্রে, বিশেষ ক'রে "সংগচ্ছধ্বং” মন্ত্রটিতে সেই দ্রুত গতিরই বীজ উপ্ত রয়েছে।

পুরণো পৃথিবী দূরে সরে গেল। সে যে নোতুনতর রূপ নিয়ে' এল তা'তে দেখা গেল তার গতিবেগ আরও বর্দ্ধিত হয়েছে। এল ইতিহাস–প্রসিদ্ধ ৰৌদ্ধ যুগ। যদিও চীনে ও মিশরে এই ৰৌদ্ধযুগের পূর্বেও এক উন্নত ঘটন–ধর্মী গতিশীল সমাজের সূত্রপাত হয়েছিল, তবু সে গতিশীলতাকেও অগ্রগতির

দ্বিতীয় ধাপ বলে' এখানে ধরছিনে; তার কারণ তারা বৈদিক সভ্যতার চাইতে পরবর্তীকালের হলেও তারই সগোত্র, যদিও স্বকীয়তায় বৈশিষ্ট্যবান।

এই বৌদ্ধযুগের পৃথিবী বৈদিক যুদের আগে চলার ছন্দকে ত্বরান্বিত করে' দিয়েছিল। বৈদিক সমাজ–ব্যবস্থা বিভিন্ন ঘাত–প্রতিঘাতের মধ্যে পড়ে' সংঘর্ষবিমুখ গতিহীন হ'বার অবস্থায় এসে' পৌঁছেছিল। তার দ্বিধাজড়িত দুর্বলপদে নোতুন করে' পৌরুষের ধাক্কা জাগিয়ে' বৌদ্ধযুগ যে অগ্রগতির সূচনা করে' দিল তা' মানুষের অগ্রগতির বেগ বৈদিক যুগের চাইতেও অনেক বেশী বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই এ যুগের সাহিত্যে সেই ঘটন–ধর্মী প্রাণচঞ্চল সমাজ–আলেখ্য আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাই।

জীবন যতই সংঘাতবহুল হয়ে চলেছে ততই অবস্থার চাপে পড়ে, মানবমনকে তাড়াতাড়ি চলতে হয়েছে। গত দু'শো বছর ধরে' জীবনের জটিলতা তথা সমস্যাবহুলতার দরুণ সমাজের অগ্রগতিও অস্বাভাবিক রকম বেড়ে' গিয়েছে। এ অগ্রগতিকে পছন্দ করুন আর নাই করুন–স্বাভাবিক ভাবেই এ এসেছে, আসছে, গত দু'টো মহাযুদ্ধ সমাজকে আরও জোরে, যেন টেনে' হিঁচড়ে এগিয়ে' নিয়ে' চলছে–যে কোন রকমে কালকে

জয় করার জন্যে মানুষ যেন পাগল হয়ে উঠেছে। অতিরিক্ত গতির জন্যে সবদিকে সামঞ্জস্য রেখে' এগোনও ঠিক হচ্ছে না। একদিকে সামলাতে গিয়ে' অন্যদিকে ব্যর্থতাও প্রকট হয়ে' উঠেছে। জীবনের এই দীনতা, এই ব্যর্থতা আজকের যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের প্রতিটি ছত্রে উৎকটভাবে ফুটে' উঠেছে। কোথাও সৰল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় নেই। মানুষের ব্যর্থতাগুলোকেই পুঁজি করে' সাহিত্যিক অর্থ-উপার্জনে ব্যস্ত। চারশো বছর ধরে' তৈরী করা মঙ্গলকাব্য, দীর্ঘকালের অভিনন্দনধন্য রামায়ণ ও মহাভারত, সমাজে বহুকালের মর্যাদা পেয়ে' আসা সেক্সপীয়র, মিল্টন, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, প্রাকৃত-বিদগ্ধের মিলনসাধক 'রামচরিতমানস' সব কিছুর ঐতিহ্যই যেন মানুষ খুইয়ে' বসতে চলেছে, গতির আধিক্য ধারাবাহিকতা রাখলেও গতিবেগের দরুণ সমাজ যেন টাল সামলাতে পারছে না। এই বেসামাল ভাবটুকুই তাই আজকের সাহিত্যিক তার লেখনীতে এঁকে চলেছে, আর পাঠকগোষ্ঠীকে জানিয়ে' চলেছে যে সেও একজন এই বেসামাল দলেরই মানুষ।

সাংস্কৃতিক-বিবর্তনও সমাজের মধ্যে বড় রকমের পরিবর্তন এনে দিয়েছে ও দিচ্ছে। আর এ জিনিসটা হচ্ছে পৃথিবীর কম-বেশী প্রায় সকল দেশেই-প্রায় সমানভাবে। এই

সাংস্কৃতিক বিবর্ত্তনকেও খারাপ জিনিস বলতে পারিনে, কারণ এতে কম-বেশী একের ত্রুটি অন্যের মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে বটে, কিন্তু তবু এর একটা মস্ত বড় লাভের দিকও রয়েছে আর সেটা হচ্ছে মানুষ জাত ক্রমশঃ একে অপরের সঙ্গে মিশে' একটা নূতন মানব-সংস্কৃতি গড়ে' তোলার কাজে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হাত লাগিয়ে' চলেছে।

জীবনের বিভিন্ন ধারার নামই সংস্কৃতি। বিভিন্ন দেশের মধ্যে আসা-যাওয়া, ভাব-বিনিময় যতই বেড়ে' চলেছে, ততই সাংকৃতিক ক্ষেত্রে একে অপরের কাছে চলে' আসছে, পুরোণো আভিজাত্যের তথা ঐতিহ্যের জীর্ণ বাঁধে কোথাও ফাটল ধরেছে, কোথাও বা তা' ভেঙ্গে চউচির হয়ে' যাচ্ছে, যার ফলে নতুনধারা একটা আন্তর্জাতিক সাহিত্য গড়ে' ওঠার সূচনা দেখা দিচ্ছে। এটা আর যাই হোক, শুভ-লক্ষণ নিশ্চয়ই। কিন্তু কোন কিছুই যা, প্রাকৃতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে শুভ-লক্ষণের সূচনা করে তাও মানুষের নির্বুদ্ধিতায় বা দুর্বুদ্ধিতায় শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'তে পারে। এই আন্তর্জাতিকতার ভাবও সাধুতা, সরলতা, তেজস্বিতা বা সত্যিকারের মানৰ প্রেমের অভাবে সাহিত্যিকের খেয়ালের স্তরেই সীমিত থেকে' যেতে পারে। বাস্তবের মাটির কঠোরতা

তার ধাতে সহ্য নাও হতে পারে। মানুষের ভাগ্য আমরা সাহিত্যিকের খেয়ালের ওপর ছেড়ে' দিতে পারি নে। সাহিত্যিকের যেমন কল্পনার রঙিন নেশা নিয়ে' পড়ে থাকলে চলবে না, ঠিক তেমনি বাস্তব জগতের ব্যর্থতার কথা শুনিয়ে' হতাশার গান গেয়ে' মানুষকে নৈরাশ্যবাদের পদে নিয়ে' যাওয়াও চলবে না। যে মানসিক গতি ও সাংস্কৃতিক ৰিবৰ্ত্তন সামাজিক কাঠামোকে নূতন ছাঁচে ঢেলে' দেয় তাদের দু'য়েরই পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে সর্বদা সংযোগ রেখে' সাহিত্যিককে চিন্তা করতে হবে ও একটা সমন্বয়-ধর্মী ভাব নিয়েই সাহিত্যিককে- শুধু সাহিত্যিককে কেন, প্রতিটি কলাশিল্পীকেই- কলম বা তুমি ধরতে হবে। শিল্পী বা সাহিত্যিক, যদি তা' না করতে পারেন তাহ'লে বুঝবে হৰে তাঁর শিল্পীধর্মে পাতিত্য ঘটেছে। তাঁর অবদান বস্তুতঃ আবর্জনাবিশেষে যা' হয়তো সার তৈরী কাজে লাগতে পারে। কিন্তু তাকে কাছাকাছি রাখলে জনস্বাস্থ্য যে কোন সময়ে বিপন্ন হ'বার সম্ভাবনা থেকে' যাবে। শিল্পীর সাধনা সেখানেই সার্থক যেখানে তার দ্বারা সমাজের সর্বাত্মক বিকাশ হয়ে থাকে। সাহিত্যিকের শিল্পপ্রেরণা যদি সমাজের গতিকে একটি বিশেষ দিকে নিয়ে' যাবার জন্যেই সদা সচেষ্ঠ হয় অথবা তা' যদি সমাজের অধিকাংশ দিককে অস্বীকার করে' বসে সেক্ষেত্রে তাকে সাহিত্য ৰলৰ না, কারণ

তার মধ্যে সত্যিকারের হিতের ভাব থাকছে না। যে ভাবধারায় স্বসংসম্পূর্ণতা নেই তা' বাস্তব জীবনকে পূর্ণত্বের পানে নিয়ে' যেতে কিছুতেই সক্ষম হয় না।

প্রকৃত শিল্পী বা সাহিত্যিক তাই তুলি বা কলম ধরার আগে নিজের চতুর্দিক একবার ভাল করে' চেয়ে' দেখে' নেৰে'; জেনে ও বুঝে' নেৰে যে, সমাজ কোন্ দিক পানে চলেছে, কেন চলেছে, তার দুর্বলতার মূলীভূতকারণগুলো কী কী। অসদ্-ভাবের প্রেরণাগুলো তার কাছে কোন্ মতবাদের ফলে এসেছে। কেবল দেখে' যাওয়াটুকুই যথেষ্ট নয়-ধ্বংসের উদ্দাম-স্রোতের বিরুদ্ধে হয়তো তাকে একক ভাবেই দাঁড়াতে হবে। "যদি তোর ডাক শুণে কেউ না আসে তবে একলা চল রে" ভাবটি নিয়েই হয়তো অনেক ক্ষেত্রে তাকে সাধনা করে' যেতে হবে। শত-সহস্র-প্রতিকূলতা, যেগুলোর অধিষ্ঠান বহু যুগের কুসংস্কারে, যেগুলোর প্রতিষ্ঠা মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিতে সেগুলোর দুর্গম শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে' হয়তো তার কলম ভেঙ্গে' যাবে, হয়তো তার তুলি পটের ওপর জলের রেখাই আঁকতে বাধ্য হবে, হয়তো তার অভিনয়মুখরতা মুক মুদ্রামাত্রেই পর্যবসিত হবে, তবু্ তার সাধনায় বিরাম দিলে চলবে না। তার এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক

একটি পরাজয় বিজয়মাল্যে মণিরুপে গ্রথিত হয়ে' থাকবে। সমাজ যখন অনাচারের পঙ্কিল আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে' মরতে থাকে, ব্যষ্টি বা সমষ্টিজীবনের শঠতাই যখন বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় বয়ে' বেড়াতে থাকে, মিথ্যাচার, উৎকোচগ্রহণ, কপটাচরণ যেখানে নেতৃত্বের যোগ্যতার মাপকাঠি হয়ে' দাঁড়ায়, সেখানে ভারতীয় প্রকৃত সাধককে প্রতিমুহূর্তেই লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে' এগিয়ে' যেতে হয়। তার বরাতে জোটে কেবল টিটকারি আর চুণ-কালি। এগুলোকে যে ভয় পায় সে মানুষ জাতকে সত্যিকারের কোন কিছু দিয়ে' যেতে পারে না। নীতির দৃঢ়তা যার নেই, পায়ের তলাকার মাটি যার মজবুত নয় সে অন্যকে তার স্নিগ্ধ ছায়ায় আনন্দ দেবে কি করে'? পরগাছার মত অন্যের রস শোষণ করে' জীবনটাকে টেনে' নিয়ে' যাওয়া হয়তো সম্ভব কিন্তু তাতে করে নিজের সার্থকতার বা অন্যের মূল্যবোধ-এ দু'য়ের কোনটাই বোঝা সম্ভব নয়।

অন্ধকারের গহ্বর থেকে যে মানুষকে আলোকের পথে নিয়ে' যাবার দায়িত্ব নেবে সেই শিল্পী বা সাহিত্যিককে পথের সঙ্কেত অবশ্যই জানাতে হবে। সস্তা পল্লবগ্রাহিতাবৃত্তি বা পাঁচ-দশটা বই পড়ে ভুঁইফোড় পণ্ডিত হয়ে দু-পাঁচটা বড় বড় গালভরা বুলি কপ্চে' অথবা দশজনের লেখা চুরি করে'

'ডক্টরেট উপাধি পেয়ে' তার জোরে কাউকে পথনির্দেশনা দেওয়া সম্ভব নয়। এ জন্যে চাই একটা বলিষ্ঠ অন্তর্দৃষ্টি যার একটুখানি অভাব থাকলেই সাহিত্যিক বা শিল্পীর সব প্রচেষ্ঠাই ব্যর্থ হয়ে' যায়। কেবলমাত্র বচনবিন্যাস বা রুচিটিচিত্রণ মানুষের মনের ক্ষুধা তো মেটাতে পারেই না, সমাজের অগ্রগতির কাজেও এই জাতীয় শিল্পসৃষ্টি কোন মূল্য বহন করে না। পথের জ্ঞান থাকা চাই, পথচলার জ্ঞান থাকা চাই। অতীতের গতিধারা যেভাবে বর্তমানকে রূপ দিয়েছে তাকে অব্যাহত থাকতে দিলে সমাজের সম্ভাব্য রূপ কী হ'তে পারে তা' যে না বুঝেছে সে সমাজকে শ্রেয়ের পথে পরিচালনা কিছুতেই করতে পারে না। সে সমাজ সংস্কারের নামে সমাজকে অন্ধকারের পানেই ঠেলে'দেৰে, স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার প্রচার করবে–দেবীর আর্দশে মানবীকে না গড়ে' নটীর আর্দশে দেবীমূর্ত্তি গড়তে চাইৰে।

সাহিত্যিক যুগস্রষ্টা–তাই সে ঋষি, তাই সে কবি। তার এই মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহ্য তাকে ক্ষণেকের জন্যেও বিস্মৃত হ'লে চলবে না। সে মূক জনসাধারণের বার্তাবহ, সে সমাজের প্রতিভূ। তার সামান্য একটু ভুলে সৃষ্টি হ'তে পারে মহা অনর্থ, সামান্য একটু সতর্কতার মধ্যে থেকে' যেতে পারে

বিরাট সম্ভাবনা। তাই যার চিন্তা ও প্রকাশে সংযম অভ্যস্ত হয়নি সে যেন শিল্পসাধনার অপচেষ্ঠা না করে। একটু আগেই বলেছি, মানসিক ও সাংস্কৃতিক গতিধারার সমন্বয়ের মাধ্যমেই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা, এই যে বৌদ্ধিক গতিধারা বা সাংস্কৃতিক বিবর্তন এগুলো ব্যষ্টি–মানুষ, সমষ্টি–মানুষ–এ দু'য়ের কোনটাকেই অস্বীকার করে' নিরালম্বভাবে থাকতে পারে না, কারণ ৰৌদ্ধিক বিকাশ বা সাংস্কৃতিক বিকাশ দু'টোই মানুষেরই জিনিস আর সে মানুষ সমাজের ওপরতলাকার দু'পাঁচটা নৈবেদ্যের মণ্ডার মত সাজান মানুষ নয়। তারা তারাই, যারা চালের মত নৈবেদ্যের মণ্ডাটিকে মাথায় তুলে' তাকে ঠিক অবস্থায় দাঁড় করিয়ে' রেখেছে। বস্তুতঃ ঠিকভাবে সামাজবিজ্ঞানের কথা ভাবতে গেলে এইটাই বলতে হয় যে ওই মণ্ডা অর্থে সমাজের ওপরতলাকার কোন মানুষবিশেষকে বোঝা উচিত নয়, সেটিকে ধরে নেওয়া . উচিত সমষ্টিমানসের মিলিত স্ফুরণ হিসেবে। শিল্পী যা' মিলিত স্ফুরণকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দিকে রূপ দিতে দিতে এগিয়ে' নিয়ে' যাবে' তাকে তাই জনসাধারণের মানসিক তথা সাংস্কৃতিক কাঠামোর সঙ্গে– আরও সহজ ভাবে বলেত গেলে তাদের প্রাণধর্মের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রেখে' প্রতিটি পা–ফেলতে হবে, কোথাও জনসাধারণকে তিলমাত্র অবজ্ঞা করা চলবে না। মাটির

মানুষকে ভুলে' থেকে আকাশের ফানুসকে নিয়ে' ব্যস্ত থাকলে সৃষ্টি অল্পকালের জন্যে চোখের সামনে ঝিলিক মেরে দিয়ে' শূন্যে মিশে' যাবে। কালের পাতায় তার লেখা কোন স্থায়ী রূপ নেবে না।

সাংস্কৃতিক বা ৰৌদ্ধিক যে কোন কারণেই হোক, সমাজের পরিবর্তন যখন একটু বেশী তাড়াতাড়ি হ'তে থাকে সেখানে তার বিশেষ একটি অবস্থার বা বিশেষ একটি ঝোঁকের পরিপ্রেক্ষিতে যে সাহিত্য তৈরী হয়, সব দিক দিয়ে' বিচার করে' দেখতে গেলে তা' অবশ্যই সাহিত্য পদবাচ্য। কিন্তু সমাজের দ্রুত পরিবর্তনের জন্যে তার পরবর্তী অবস্থাতে এই জাতীয় সাহিত্য তার বাস্তব মূল্য অনেকখানিই হারিয়ে ফেলে। এই জাতীয় যুগসাহিত্য এককালে মূল্যহীন হয়ে' যাবে বলে' যারা মনে করে তারাও ভুল করে। কারণ এ সাহিত্য শুধু ইতিহাসের পাতাজোড়া হয়েই থাকবে না, ভবিষ্যতের সাহিত্যিকের কাছে একটা বিশেষ মূল্যও বহন করবে; কারণ এর থেকে তারা সমাজের গতিধারার একটি আঁচ পাৰে। যুগসাহিত্যের নামে যাঁরা তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাব প্রদর্শন করে' থাকেন তাঁদের একথাটাও বোঝা উচিত যে তটস্থ সাহিত্যের সবকিছু মাধুর্য এই যুগ–সাহিত্যের বহু রূপে সমৃদ্ধ ভাবের

মধ্যে নিহিত রয়েছে। একটা বড় অধঃপতন, একটা ৰড় রকমের বিপর্যয় এই যুগশিল্পীর সাধনাই রোধ করতে পারে। তটস্থ সাহিত্যের সাধক সেখানে নীরব দর্শকমাত্র। সে কেবল নীতি ব্যাখাই করে' যাবে, পৌরুষের তেজস্বিতা জাগিয়ে দেবার সামর্থ্য সেক্ষেত্রে তার খুবই সীমিত। যুগসাহিত্যিক যেন মাটি ভেঙ্গে' পাথর কেটে' রাস্তা গড়ে' চলেছে আর তটস্থ সাহিত্যিক পাহাড়ের চুড়োয় বসে তারই ছবি আঁকছে, আর মধ্যে মধ্যে রাস্তা তৈরীর বিজ্ঞান বাৎলে যাচ্ছে।

সমাজের গতিশীলতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই যুগসাহিত্যের প্রত্যক্ষ কার্যকাল (span) ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হ'তে থাকে। গতির ঝোঁকে খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই তার ক্লান্তি এসে যায়। কিন্তু এতে দুঃখ করবার কিছুই নেই, পথ তৈরীর কাজ তো এগিয়েই চলেছে, তটস্থ–সাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক তো ঠিক থেকে' যাচ্ছে। দেশ–কাল–পাত্রকে নিয়েই যুগসাহিত্যের কারবার। তাই যে কোন কারণেই হোক্, এই তিনটে আপেক্ষিক তত্ত্বের যে কোন একটিকে জয় করবার চেষ্ঠা একটু বেশীরকম ভাবে দেখা দিলেই সমাজের তথা যুগসাহিত্যের 'স্পীড' (speed) বেড়ে' যায়। আর তটস্থ সাহিত্য–সে আপেক্ষিক তত্ত্বকে নিজের বিষয় হিসেবে রাখলেও তার গতির

ছন্দে নিজেকে বেঁধে' রাখে না, আর এই জন্যেই তার গতিধারা খুবই অস্ফুট–এক রকম অনড়–অচল–স্থির বললেই চলে, আর এই জন্যেই এর নাম দিতে পারি তটস্থ। ঠিক যা' পারমার্থিক তত্ত্ব তা' দেশ–কাল–পাত্রের ধারাছোঁয়ার বাইরে বলে' তা' অভিব্যক্তিরও বাইরে আর সেই জন্যে তাকে নিয়ে' প্রকৃতপক্ষে কোন সাহিত্য তৈরী করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। কিন্তু পারমার্থিক তত্ত্ব বা সত্য যে সোণালী রেখায় আপেক্ষিক তত্ত্বসৃষ্ট জীবমানসের সঙ্গে তার প্রাণের সংযোগ ঘটিয়েছে' সেটুকুকে তো মর্মের ভাষায় কিছুটা প্রকাশ করতে পারি– তাকেই বলি তটস্থ সাহিত্য। নদীও নয়, তীরও নয়, যে রেখাটিতে এরা একে অপরকে ছুঁচ্ছে সেটির নামই তট। আর এই তটে দাঁড়িয়ে' যে দু'য়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করছে সে–ই তটস্থ।

যুগসাহিত্যের যিনি স্রষ্ঠা তাঁকে যদি বলি ঋষি, তাহলে তটস্থ সাহিত্যের স্রষ্টাকে বলৰ কবি। ঋষি চলেছেন দেশ–কাল–পাত্রের সঙ্গে স্তরবিন্যস্ত ভাবে সমন্বয় ঘটিয়ে' আর কবি দেশাতীত, কালাতীত ও পাত্রাতীতের সঙ্গে ঘটিয়ে' চলেছেন দেশ, কাল, ও পাত্রের সংযোগ। যুগসাহিত্য সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি আশা–আকাঙ্খা, ব্যথা–বেদনাকে

রূপ দেৰে এমনি একটি ভাষার মাধ্যমে যে ভাষা সহজেই তাদের প্রাণকে স্পর্শ করে, অর্থাৎ যুগসাহিত্যের স্রষ্টাকে জনগণের ভাষাকেই সর্বাধিক মূল্য দিতে হবে। কিন্তু তটস্থ সাহিত্য জনসাধারণের ভাষাকে ততটা মুখ্য স্থান না দিলেও বিশেষ অসুবিধা হয় না। তুলসীদাসজী যদি তাঁর 'রামচরিতমানস' বা চণ্ডিদাস যদি তাঁর পদাৰলী তৎকালীন বিদগ্ধ ভাষা সংস্কৃতে রচনা করতেন তাহলে তাঁরা কী জনগণের মধ্যে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন? পৃথিবীর এক অংশের জনগণের ভাষাও তেমনি যুগসাহিত্যের বাহন হিসেবে অন্য অঞ্চলে বা অন্য ভাষাভাষীর কাছে খুৰ ৰেশী মূল্য বহন করে না। রাজস্থানের ইতিহাস বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইংরেজী ও ৰাংলা ভাষায় যথেষ্ট সংখ্যক সুলিখিত পুস্তক আছে কিন্তু রাজস্থানী ভাষাভাষী তা' থেকে কতটুকু উপকৃত হ'তে পারে? মাইকেল মধুসূদনের কবিপ্রতিভা ইংরেজী রচনায় হয়তো ভালভাবেই ফুটে' উঠত কিন্তু ৰাংলা ভাষায় সে প্রতিভা যেভাবে বিকশিত হয়েছে, যেভাবে একটা অদ্ভুত যুগসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজীতে তিনি হয়তো ততখানি পারতেন না। তাই যুগসাহিত্য শুধু জনগণের ভাষাতেই যে তৈরী করতে হবে তা' নয়, সাহিত্যিককেও যতদূর সম্ভব তাঁর মাতৃভাষাতেই তা' রচনা করতে হবে। আগেই ৰলেছি, তটস্থ

সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু জনগণের ভাষার দাবী এতটা জোরালো নয়। তাই কোন সূক্ষ্মতত্ত্ব বা জটিল বিজ্ঞান সম্পর্কীয় কোন পুস্তক যদি কেবলমাত্র প্রধান প্রধান ভাষাগুলিতেই লিখিত হয় তা'তে চিন্তিত হবার খুব বেশী কারণ দেখছি না, কেননা জনগণের ভাষাতেই রচিত হ'লেও খুৰ কম সংখ্যক লোকই সেগুলো পড়ত। তবে এ কথা ৰলৰ, মাতৃভাষায় পুস্তক রচিত হ'লে তার চাহিদা কম হ'ৰে–এই কথা ভেবে' যিনি অধিক প্রচলিত ভাষার মাধ্যমে সাহিত্যর্চ্চা করতে চান তাঁকে সাহিত্যিক ৰলৰ না, কারণ সঙ্গে চলার মনোভাব তাঁর মধ্যে নেই। এ রকম লেখককে রচনা ব্যবসায়ী ৰলাই অধিকতর সঙ্গত।

সংঘর্ষের মাধ্যমেই শক্তির স্ফুরণ। যে জীবন সংঘর্ষবিমুখ, লড়বার তাগিদ যেখানে কম প্রাণের স্ফুরণও সেখানে অস্ফুট হ'য়ে আছে। নানান ধরণের প্রাকৃতিক, সামাজিক, মানসিক তথা অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষের মনীষা জেগে' উঠেছে। উদ্বোধন যে চায় তার তাই সংগ্রামকে ভয় পেলে চলে না। মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক বা মানসিক তত্ত্বগুলোর প্রত্যেকটাই যুগে যুগে বল্লে চলেছে। অতীতের অভিজ্ঞাতায় শক্তিশালী হয়ে' মানুষ ভবিষ্যতের সম্পদ গড়ে'

তুলতে চাইছে–এটা সত্য, এটা তথ্য, একে অস্বীকার করবার জো নেই। যাঁরা অতীতকে সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলে দিয়ে কোন কিছু তৈরী করতে চান ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে, তাঁরা সে প্রচেষ্টায় সফলকাম হবেন না। কারণ, সাহিত্য বা কলাশিল্পের যে কোন সৃষ্টিই হোক না কেন, তাকে একটা পূর্বাপর সম্বন্ধ রেখেই পৃথিবীতে নিজের আসনটুকু করে' নিতে হবে। হঠাৎ খাপছাড়াভাবে সে আসে, খাপছাড়াভাবেই সবকিছুকে ওলট–পালট করে' দিয়ে চলে' যায়। তার এই আকস্মিক আসা–যাওয়ার পরিবর্তনের দরুণ একটা বিশেষ লাভ–ক্ষতি সমাজের হয় বটে, কিন্তু সে পরিবর্তনটাকে কোন ঘটনমূলক সাধনার সিদ্ধি বলে' গণ্য করতে পারি নে।

সাহিত্যিক তত্ত্বদর্শী, তাই খাপছাড়াভাবে কোনো কাজ তার কাছ থেকে আশা করতে পারিনে। তার অবদানের মধ্যে আমরা চাই প্রজ্ঞার প্রার্থর্য, বিবেচনাপূর্ণ সতর্কতা, দরদী মনের মধুর স্পর্শ।

সমাজ যেখানে কুসংস্কারের আবর্তে পড়ে' পাক খেয়ে' মরছে, অজ্ঞতার অন্ধকারে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে' ফেলেছে, সাহিত্যিক বা শিল্পীকে সেখানে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে' এগিয়ে' আসতে হবে। আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে' অন্যকে'পথের

নিশানা দেখিয়ে' দিতে হবে, হোঁচট খাবার ভয়ে জবুথবু হয়ে' বসে থাকলে চলবে না। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আপোষবিহীন সংগ্রাম চালিয়ে' সে মানুষকে সামনের পানে এগিয়ে' নিয়ে যাবে। স্পষ্ট কথা বলার অপরাধে সমাজদেহের বিভিন্ন অংশের কায়েমী স্বার্থবাহীর দল তার ওপর খড়্গহস্ত হ'তে পারে কিন্তু তাতে তা'কে দমে গেলে চলবে না। লক্ষ লক্ষ মানুষের আশা–আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে যুগের গণ্ডী কাটিয়ে' তা'কে জনসাধারণের সামনে যুগান্তরের সম্ভাবনাটুকুই তুলে' ধরতে হবে। এ কাজে পরিশ্রম যতখানি, দায়িত্বও তার চাইতে কিছু কম নয়। মানুষের হৃদয়বৃত্তির স্ফুরণের স্বাভাবিক পথটুকুকে সমঝে' বুঝে নিয়েই তাকে সেইরকমভাবে সাধারণের বোধগম্য ভাবে বা ভাষায় আর্দশকে রূপ দিয়ে' যেতে হবে।

সাহিত্যের আবির্ভাব যে যুগে, যে পরিবেশের মধ্যে হয় তার সে লেখনী সে পরিবেশের প্রভাব কাটিয়ে' সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন ভাব বা ভিন্ন ভাষাকে আশ্রয় করে' সাহিত্য–সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষের রুচি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে' এগিয়ে' যাচ্ছে। ভাষা ও বাচন–ভঙ্গী পরিবর্তিত তো হচ্ছেই অধিকন্তু জটিলতর চিন্তাধারার বাহকতার জন্যে তার সরলতাও ক্রমশঃ কমে' যাচ্ছে। আমি সাহিত্যিকের ভাষাগত জাটিলতা সৃষ্টির

অনাবশ্যক প্রয়াসের কথা এখানে উল্লেখ করছিনে। সাহিত্যিক চা'ন বা না চা'ন প্রয়োজনের তাগিদে তা'কে ক্রমশঃ জটিলতর ভাষার ব্যবহারে বাধ্য হ'তে হচ্ছে। এ জিনিসগুলো অতীতেও ছিল, বর্তমানেও রয়েছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই ভাব ও ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে' সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচক অতি সহজেই সাহিত্যিকের ভুলটুকুও ধরে' ফেলেন। এক যুগের ভাষা অন্য যুগে বেমানান ও বেখাপ্পা। বাল্মীকির ভাষার সরলতা নিয়ে' কোন কাব্য আজকের দিনে রচনা করা যায় না। মাইকেলী যুগের নামধাতুর প্রয়োগ আজকের যুগে করতে গেলে পাঠককে খানিকটা হাসির খোরাক জোগান হয় মাত্র। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'–এর ভাব ও ভাষা এককালে বিদগ্ধ সমাজের যথেষ্ট তারিফ পেয়েছিল, রাজসভায় তা' সযত্নে পঠিত হ'ত, কবিও পেয়েছিলেন রাজকীয় উপাধি। কিন্তু আজকের যুগে তা ভাবে ও ভাষায় অশ্লীল, সমাজের মধ্যে অপাঠ্য। আজকের সাহিত্যিক যে কথাগুলো অম্লান বদনে বলে বুঝিয়ে যান, একদিন হয়তো সেই কথাগুলোই সভ্য সমাজে অপাংক্তেয় বলে গণ্য হবে। কিন্তু সাহিত্যিক এ ব্যাপারে একেবারে নাচার, কারণ যুগের ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে' ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব। সর্বযুগে দৃষ্টি প্রসারিত করে' রাখলেও তার স্থূল অস্তিত্বটা তো দাঁড়িয়ে' রয়েছে একটা

বিশেষ যুগে। যে যুগের আলো–হাওয়ার, মাটি–রসে, ফলে–ফুলে তার জীবনটা ভরে' উঠেছে, সে যুগের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে ওঠা তার পক্ষে কীভাবে সম্ভব? জ্ঞানদাস, গেবিন্দদাস, তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টিকালে রাধাকে যে দৃষ্টি নিয়ে' দেখেছিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'*

*বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্লভ কর্তৃক সংগৃহীত

–এর চণ্ডিদাস তাঁকে তার চাইতে অনেক স্থূলভাবে দেখেছিলেন, অথচ সরলতা বা অকপটতায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সত্যিই অনবদ্য, সাহিত্যের দরবারে তা' সে যেমন মূল্যই পাক না কেন।

যুগ এগিয়ে' যায় স্থূল–সূক্ষ্ম–কারণে। পা' যে গতিতে এগোয় হাত হয়তো সেই গতিতে পারে না, মনীষা হয়তো তার চাইতে সহস্রগুণ বেশী এগিয়ে' চলে। তাই একই সময় সমাজের বা ব্যষ্টিবিশেষের জীবনের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন যুগের অভ্যুদয় হ'তে পারে, হয়েও থাকে। এ তথ্যগুলো বিচারের সময় ভালভাবে মনে রাখা দরকার। নইলে কলাস্রষ্টা বা সাহিত্যিকের প্রতি আমরা হয়তো অবিচার করে' ফেলব। বিভিন্ন বস্তুর পরিমাণের জন্যে ভুললে চলবে না। এ কথা ক্ষণেকের জন্যেও ভুললে চলৰে না। কোণার্ক মন্দিরের অপূর্ব

ভার্যস্ক দেখে' যাঁরা মুগ্ধ হন তাঁরাও সেখানকার শ্লীলতাবর্জিত কলানিদর্শনগুলো দেখে' নাসিকা কুঞ্চিত করেন। যুগগত বিচারে তাঁরা হয়তো ঠিক কাজই করেন, কারণ তাঁদের মন আজকের যুগের রুচিতে গড়ে' উঠেছে। কিন্তু সে দিনের সেই ভাস্করের, সেই শিল্পীর মধ্যে যে একাধিক যুগের স্ফুরণ ছিল, এ জাতীয় নির্দশনগুলি যে তারই প্রামাণ বহন করছে একথা ভুললে চলবে কেমন- করে'?

সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শিল্পীমন যেমন যেমন বিকশিত হ'য়ে উঠেছে, তেমনি তেমনি সে নিজেকে শিল্প মাধ্যমে ফুটিয়ে' তুলেছে। আদিম মানুষ এঁকেছে পাথরের সাহায্যে জীব-জন্তু শিকারের ছবি, নিজেদের মধ্যেকার সংঘর্ষের ছবি। আদিম যুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত সেই যে মানবগোষ্ঠী, তারা প্রতি মুহূর্তেই সংগ্রামে জয়ী হ'বার উদ্দেশ্যে ভেৰেছে নিজেদের দলপুষ্ঠির কথা, সংখ্যাবৃদ্ধির কথা। তাই সেকালের শিল্পে দেখতে পাই সংখ্যাবৃদ্ধির প্রতীক হিসেৰে লিঙ্গপূজার আর্বিভাব আর তদাশ্রয়ী শিল্পসৃষ্টি। অনার্য-সমাজে প্রচলিত আদিম মানবের এই লিঙ্গপূজাই সভ্য রুচিজ্ঞানসম্পন্ন আর্যদের কাছে এসে' দার্শনিক ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হয়ে' শিবলিঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে। আদিম মানুষের এই প্রবৃত্তির মধ্যে যে

সরলতা ছিল, উন্নত মানুষের এই দার্শনিক যুক্তি খোঁজার পিছনে রুচিসূক্ষ্মতা থাকলেও পুরোণো মানুষের মত সরলতাটুকু ছিল না। আবার আজকের মানুষের কাছে তাদের দু'পক্ষেরই প্রচেষ্ঠা বা ব্যবস্থা রুচিবিগর্হিত বলে' গণ্য হচ্ছে। এগুলো যুগগত পরিবর্তনেরই ফল। শিল্পীর হাতে–পায়ে ও ধ্যান–ধারণায় যদি একই সঙ্গে দু'টো যুগ চলতে থাকে, তাহলে তার অবদানের প্রাণ–মন–মাধুর্য্য সব কিছুই থাকেবটে, থাকেনা শুধু ক্রিয়া ও সংবেদনগত সমতা। কোণার্কের শিল্পীর ছেনী–হাতুড়ি যে গতিতে সূক্ষ্মত্বের দিকে এগিয়ে' গিয়েছিলো সংবেদন সে গতিতে চলতে পারে নি।

মণীষার সঙ্কল্প–বিকল্পের মধ্য দিয়ে' যে প্রতিভা যুগ থেকে যুগান্তরের দিকে এগিয়ে' চলেছে তা' মানৰ–সম্পদের চরিতার্থতার ৰাণীই বহন করে' চলছে। এর প্রতিটি পদবিক্ষেপে, শ্রান্তি–ক্লান্তির প্রতিটি উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে, স্ব–ভাবেরই সত্যিকারের স্ফুরণ হয়ে' চলেছে। এ স্ফুরণকে রোধ করতে পারে এমন শক্তি কারও নেই! যারা পেছনের দিকে হটবার চেষ্ঠা করে' তাদের মানস সম্পদকে জড়ে, স্থানুতে পরিণত করতে চায় তারা হয়তো একে সাময়িকভাবে ৰাধা দিতে পারে কিন্তু তাতে এর গতির প্রাণশক্তি ধ্বংস হয় না। পরক্ষণেই

তা' সহস্রগুণ শক্তি নিয়ে' ৰাধার সমস্ত বালির বাঁধকে ভাসিয়ে দেয়। তাই বলছিলুম, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তাইতেই হৰে মনীষার উদ্বোধন। এই বাধা পাওয়া মানস-চেতনাই ধীরে ধীরে মানব-সভ্যতার ভিত্তি গড়ে' দিয়েছে, সাহিত্যিক বিচারকে একটা সুষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী নিতে শিখিয়েছে, জীবনরসেই পরম রসের আস্বাদ আনিয়ে' দিয়েছে। শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের অপূর্ব সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে' তাই প্রতি যুগেই সাহিত্য দেখিয়েছে স্ব-ভাবেরই অগ্রগতির এক-একটা বিভিন্ন ধাপ, এক-একটা বিভিন্ন স্তর। যা' স্ব-ভাব বিরোধী তাতে কল্পনার রঙ যতই লাগাও না কেন তা' কোন কালেও মানুষের আপন জিনিস হ'তে পারবে না। তটস্থ সাহিত্যকে যদি বলি পোষাকী কাপড় আর যুগ-সাহিত্যকে যদি বলি আটপউরে কাপড় তাহ'লে এই শ্রেণীর উদ্ভট কল্পনা-বিলাসকে বলতে হয় 'ডাকের সাজের' রুপোলী রাঙা। জীবনে এর কোন প্রয়োজন নেই, স্বভাবের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

এই স্বভাবের ধারপ্রাবাহকে ঠিকভাবে ফুটিয়ে' তুলতে গেলে অন্তর্দৃষ্টি, কলমের জোর আর বুকের জোর-তিনটের চাই। ভীড় সে সর্বদা সামলে' চলতেই অভ্যস্ত, সাহিত্যসৃষ্টি তার কর্ম নয়। স্বভাবের স্ফুরণ ঘটাতে গেলে যে সকল শক্তি মানুষের

প্রাণরসকে শুকিয়ে' মেরে' ফেলতে চাইৰে তার বিরুদ্ধে মানুষ-সাধারণকে সংগ্রামের জন্যে উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানাতে হবে। যার কণ্ঠে সে পৌরুষ নেই কবিতার নামে সে কেবল ছড়ার প্যানপ্যানানি কেটে' যাবে–আকাশের তারা গুণে' বাস্তবের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্ঠা করে' যাবে।

সব কিছুই সামনের পানে এগিয়ে' চলেছে, ৰসে' থাকার জন্যে কেউই আসে নি। তাই সব কিছুতেই এগিয়ে' চলতে হৰে সৰাইকার সঙ্গে সমন্বয় রেখে' একটি সুষ্ঠু ধারাপ্রবাহ মেনে' নিয়ে' ভাবনায়, কর্মে সব কিছুতেই তাই প্রগতিই হচ্ছে মানুষের মূল মন্ত্র। জীবনের যেখানেই আড়ষ্টতা সেখানেই অন্ধকার। তাই ভাবের ক্ষেত্রে বা ভাষার কোথাও সামান্যতম জড়তাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না, জড়তা পুরাতনের মোহেরই নামান্তর মাত্র। কল্যাণের জন্যে, শ্রেয়ের জন্যে এ মোহ ত্যাগ করতেই হবে। ভাবকে যদি ৰলি লোহা, ভাষার গতিশীলতাকে ৰলৰ স্পর্শমণি। সর্বদা নজর রাখতে হৰে যেন এই লোহা স্পর্শমণির ছোঁয়াচ থেকে বঞ্চিত না হয়। তাই কোন উন্নত ভাবকেই প্রকাশ করবার আগে এই স্পর্শমণিটুকুকেই খুঁজে বা'র করে' নিতে হবে, তাকে করায়ত্ত করে' নিতে হবে। ভাব অনেকের থাকে, ভাষার অভাবে তা ফুটে উঠতে পারে না।

ভাব যার আছে সাধনার দ্বারা তাকে ভাষাকে তৈরী করে নিতে হবে। ভাষা যার আছে, তাকে অর্ন্তদৃষ্টি জাগাবার প্রচেষ্ঠায় রত হ'তে হবে। দুয়ের কোনটিরই অভাব থাকলে চলবে না–লোহা যেখানে নেই স্পর্শমণি সেখানে অর্থহীন।

ভাষার জোর বলতে আমি মানুষবিশেষের ভাষার ওপর দখলের কথা বলছি নে, আমি বলছি দুর্বার প্রাণশক্তির কথা। বুকের পাটা যেখানে জোরাল নয় ভাষা সেখানে দ্বিধাজড়িত পদে অতি সামলে', অতি সাবধানে অগ্র–পশ্চাৎ ভেবে' চলতে চায়। প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কার, প্রচলিত ধর্মমতের জড়তা–পূর্ণ আৱেষ্টনী, রাজনৈতিক মতবাদের চাপ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, জাতীয়তার মিথ্যা অভিমান তথা সঙ্কীর্ণ রাষ্ট্রিক আদর্শের ধাক্কায় তার স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ হ'তে পারে না। দুর্বল ভাষা সেই ধাক্কায় প্রতিহত হ'য়ে হয় থেমে' যায়, না হয় পাশ কাটিয়ে' 'সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে' নীতি নিয়ে' অতি–সংকোচে নিজেকে ব্যক্ত করতে চায়। এ দুর্বলতার মূলীভূত কারণ নিহিত রয়েছে ব্যষ্টি জীবনের ভীরুতায় আর পুরাতনের প্রতি অহেতুক মোহে। সাহিত্যিককে বজ্রনির্ঘোষে নিজেকে ফুটিয়ে' তুলতে হবে, উদাও কণ্ঠে মানুষকে আহবান জানাতে হবে, সাহসের সঙ্গে সৱল মন ও

দৃঢ় বাহু নিয়ে সমস্ত পঙ্কিলতার আবর্জনা সরিয়ে' ফেলে' মানুষের মুক্তির পথটুকু তৈরী করে' দিতে হবে, ঋদ্ধির পথে তা'কে হতে হৰে পথিকৃৎ।

এখানে ভাষার গতিশীলতা কথাটা নিয়ে' একটু গোলমাল হ'তে পারে। ভাবের গতিশীলতার সঙ্গে তাল রেখে' ভাষাও যেখানে তরতরিয়ে' এগিয়ে' চলে আমি ঠিক সেই কথাটাই বলতে চেয়েছি। অজ্ঞতা বা প্রচলিত কুসংস্কারের চাপে পড়ে চিন্তা যাদের অবাধে এগিয়ে যেতে পারে না অনেক সময় তাদের ভাষাও বেশ জোরালো, বেশ গতিশীল। গোষ্ঠীমাহাত্ম্য, জাতিমাহাত্ম্য বা তীর্থমাহাত্ম্য নিয়ে' যারা পাঁচালি লেখে তাদের ভাষাও অনেক সময় বেশ হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে থাকে। হাঁচি টিকিটকি বা যাত্রা প্রকরণের পূর্বে–'পূর্বে নাস্তি, উত্তরে উত্তম'–নিয়েও জোরাল ভাষায় বেশ 'থিসিস' লেখা যায়, কিন্তু সে ভাষাকে আমি গতিশীল ভাষা বলে' স্বীকার করতে রাজী নই, কারণ সংস্কারের তথা পুরাতন মোহের লৌহৰেষ্টনীর মধ্যেই সেই ভাষা দৌড়ঝাঁপ করে' বেড়াচ্ছে। সে ভাষার দ্রুতি আছে, গতি নেই। খতিয়ে' দেখলে দেখা যাবে সে কসরৎ অনেক করেছে, কিন্তু এক পা–ও এগোতে পারে নি,–কলুর বলদের মত কুসংস্কারের খুঁটিতে বাঁধা–থেকে' সারাদিন হয়তো বুক

ফুলিয়ে' জোর কদমে পঞ্চাশ ক্রোশ চলেছে, কিন্তু এক পা–ও এগাতে পারি নি।

মানুষের সর্ব সত্তা তার মানসিক বিকাশের জন্যে সর্বদা উন্মুখ হয়ে' রয়েছে। যা' কিছু এই বিকাশের সহায়ক তাকেই সে সাদরে বরণ করে–দূরের বন্ধুকে কাছে ডেকে' আনে, আর তার সাহায্যে নিজেকে ফুটিয়ে' তুলতে চায়। আর যা' কিছু তার এই বিকাশের পরিপন্থী অবস্থার চাপে পড়ে' তার অধীনতা সাময়িক ভাবে স্বীকার করলেও অন্তর দিয়ে' স্বীকার করে না, আর সুযোগ পেলেই তার কবল থেকে রেহাই পাবার জন্যে বিদ্রোহ করে। এটা সর্বযুগের, সর্বকালের মানুষের স্বভাব। মানুষের জন্যে যখনই –যা' কিছু করতে হবে, মানবমনের এই ধর্মটুকুই মনে রেখে' কাজে নাৰতে হবে। সাহিত্যিকের সাহিত্য বা শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি মানুষের সেবাতেই নিয়োজিত, তাই এই তথ্যটা সাহিত্যিক বা শিল্পীকে বেশী করে' মনে রাখতে হবে। তাই তাকে তার বক্তব্য এমন ভাবে ফুটিয়ে' তুলতে হৰে যাতে তা' গহণ করতে গিয়ে' মানুষ নিজের বিকাশের পথে কোন ৰাধা অনুভব না করে। স্বাভাবিকতার মাধ্যমে রসসৃষ্টি করতে হবে। সাধারণ জীবনের স্থূলতার মধ্যেও যে সূক্ষ্ম রসাভাসটুকু আছে নিজের বক্তব্যের

মধ্যে সেটি সুকৌশলে মানুষের চোখে ধরিয়ে' দিতে হবে—মনে তার রঙের পরশ লাগিয়ে' দিতে হবে।

কথাগুলো বলা যত সোজা, করা তত সোজা নয়; কারণ **মনের ধর্ম সব মানুষেরই একই রকম হ'লেও সংস্কারগত কারণে বা পারিপার্শ্বিকতাভেদে তার স্ফুরণ বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্নভাবে হয়ে' থাকে।** মানুষের প্রাণকে প্রাণে ছোঁয়াতে পারলে, মানুষের ভাবকে নিজের ভাবে মেশাতে পারলে, কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ পথে চললে সেটাকে তার সত্যিকারের কল্যাণের পথ বা সত্যিকারের স্ফুরণের পথ বলা যেতে পারে, সেটা বোঝা যেতে পারে। ব্যষ্টি বা সমষ্টি বিকাশের সম্ভাবনাটুকু ঠিকভাবে বুঝতে না পারলে যে কোন মুহূর্তে মানুষের মানবসম্পদের অপচয় হ'তে পারে।

নেতৃত্বের সম্ভাবনা যেসব মানুষের মধ্যে আছে তাদের কাছে নেতৃত্ব অর্জনের প্রকৃত পথ নির্দেশনা তথা তার কল্যাণভিত্তিক প্রতিষ্ঠা কী ভাবে হ'তে পারে সাহিত্যের মাধ্যমে তা' সুন্দরভাবে বুঝিয়ে' দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু নেতৃত্ব যে কেবল ভাল দিকেই হ'তে পারে তা তো নয়- চোর–ডাকাত–শঠেদেরও নেতা থাকে, প্রগতিবিরোধী আন্দোলনেরও নেতা

থাকে। তাই, নেতৃত্বের সম্ভাবনাযুক্ত মানুষ, সে তার নেতৃত্বের ভাবটুকু ফুটিয়ে' তোলবার জন্যে ব্যাকুল। সে যদি সাহিত্যিকের লেখনী–মাধ্যমে প্রকৃত কল্যাণের, প্রকৃত শিবত্বের সন্ধানটুকু না পেয়ে' অকল্যাণের অশিবের মধ্য দিয়ে' বৈয়ষ্টিক প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির কোন সঙ্কেত পায় তবে সে হয়ত সেই পথেই ছুটে' চলবে। বিকশিত তাকে হতেই হবে, তাই ঋদ্ধিকে না পাক, অনৃদ্ধিকেই সে গ্রহণ করবে। কালসমুদ্রের তীরে বসে' ঢেউ গোনবার অবসর তার নেই, কবে কে এসে কল্যাণের পথনির্দেশনা তাকে দিয়ে' যাবে সে আশায় সে তার বৃত্তিকে দমন করে' রেখে' স্থির হয়ে' বসে' থাকতে চায় না বা চাইবে না।

মানুষ চায় তার আন্তর ভাবটুকুর অবাধ বিকাশ। এ বিকাশ কোন্ পথ ধরেছে সে বিচার করৰার সামর্থ্য খুব কম মানুষেরই থাকে। বেশী বয়সে এ সামর্থ্য অনেক কিছু দেখে' ও অনেক কিছুতে ঠেকে কতকটা জাগে বটে, কিন্তু কম বয়সে, কৈশোর ও প্রথম যৌবনে এ সামর্থ্যটা থাকে না বললেই চলে। তাই এ সময় শিল্প বা সাহিত্যের মাধ্যমে চটকদার যা' কিছুই মানুষ পাক না কেন তাকেই সে নিজের ভাব প্রকাশের পথ হিসেৰে গ্রহণ করে বসে। এ নিয়ে কোন

চিন্তা ভাবনা করা তো দূরের কথা, চিন্তা–ভাবনা, বিচার–বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তাও সে ঠিক বুঝতে পারে না বা বুঝতে চায় না।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলে' রাখার দরকার মনে করি যে, একই ভাবের যথাযথ স্ফূর্তির জন্যে কারও সামনে যদি কল্যাণের ও অকল্যাণের দু'টি বিভিন্ন পথ নির্দেশনা দেওয়া হয় তবে সে ক্ষেত্রে সে খুসীর মাধ্যমে জটিলতার মধ্যে না গিয়ে' যেটি ধরে' চলা বেশী সহজ বলে' মনে করে, সেটিকেই গ্রহণ করে। তাই, সাহিত্যিকের বক্তব্য যত শুভ, যত কল্যাণকরই হোক না কেন তা' যদি খুসীর মাধ্যমে, উচ্ছল আনন্দের মাধ্যমে পরিবেশিত না হয় তবে সে দু–পাঁচ জনার গ্রহণযোগ্য হ'লেও সাধারণের কাছে দুষ্পাচ্যই থেকে যাবে। তটস্থ সাহিত্য সম্বন্ধে এই কথা গুলো মোটামুটি খাটলেও যুগ সাহিত্যের বেলায় এই গুলোই হ'ল সব চাইতে বড় কথা। এর অভাব থাকলে, অর্থাৎ সাহিত্যে আর সৰ গুণ থাকা সত্ত্বেও যদি তা' আনন্দের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহ'লে তাকে সাহিত্য বলে' মেনে' নিতে একটু দ্বিধাবোধ করি। কারণ সেখানে হিতের ভাবনা থাকলেও সে ভাবনা

কার্যরূপ নিতে সক্ষম হয় না। এ জাতীয় সাহিত্য বইয়ের দামই বাড়িয়ে' দেয়– মানুষের দাম বাড়াতে পারে না।

পরিবেশনা যেখানে আনন্দের মাধ্যমে, রসাস্বাদনের সুযোগ সেখানে মানুষ ব্যাপকভাবে পেয়ে' থাকে। লেখকের দরদ সেখানে পাঠকের মর্মের সঙ্গে সোজাসুজি সংযোগ স্থাপন করে। লেখকের মধ্যে সত্যিকারের মানবিক–ভাবের অভাব থাকলে, এ ধরণের সুষ্ঠু–পরিবেশনা সম্ভব হয় না। সৎ–অসৎ, শত্রু–মিত্র, কূলনারী–পতিতা লেখকের কাছে সকলেই মানুষ মাত্র। লেখক তাদের অন্তরের আবেদনে সাড়া দেবে, আর তাদের আন্তর ভাবটুকুকেই ফুটিয়ে' তুলবে। তাদের সুখ–দুঃখ, আশা–আকাঙ্খা, ব্যথা– বেদনাবিড়ম্বিত জীবনের ছোট–বড় প্রতিটি ঘাত–প্রতিঘাতকে মানুষের মার্মিক – অভিব্যক্তি হিসাবেই রূপ দেবার চেষ্ঠা করবে। তার কাছে কোনো মানুষটি ছোট বা বড় নয়, কোনো বৃত্তিটাও ছোট বা বড় নয়। সে কেবল সেগুলোর সঙ্গে যথাযথোভাবে মানুষের পরিচয় ঘটিয়ে' দেবে, যাতে করে এই পরিচালনা মূল্যটুকু বুঝে নিয়ে' সে নিজের ব্যষ্টি তথা সমষ্টিজীবনকেও সঙ্গতভাবে মূল্যবান করে' গড়ে তুলতে পারে। শিল্পী বা সাহিত্যিক কোনো অবস্থাতেই যেন মানুষকে মানুষের ঘৃণার পাত্রে পরিণত না করে। পতিতা বা

দস্যুর চরিত্রও যেন পাঠকের মনে একটা গভীর ব্যথামিশ্রিত সহানুভূতির ছাপ রেখে' যেতে পারে।

শিল্পীর যেখানে এই ৰলিষ্ঠ হৃদয়বত্তা নেই, যেখানে সে কুসংস্কারের চশমার মধ্য দিয়ে' মানুষকে বা জগতকে দেখে' থাকে, সেখানে সে মানুষের সঙ্গে মানুষের বা জগতের সত্যিকারের পরিচয় ঘটিয়ে' দিতে অক্ষম হয়। কারণ এই সংস্কারের চশমা তাকে কোনো কিছুরই সত্যিকারের ভাবটুকু ঠিকভাবে দেখতে, বুঝতে, চিনতে দেয় না।

নিজের সংস্কারগত দুর্বলতা পাঁচজনের কাছে ঢেকে রাখবার জন্যে দুর্বলচেতা সাহিত্যিকেরা অনেক সময় বেশ গম্ভীর ভাষার মাধ্যমে বা উদাত্তভাবে পাঠককে আহবান জানাৰার চেষ্ঠা করেন। তাঁরা ভাবেন, হয়ত এই ভাষার জোরেই আসর জমানো যাবে, কিন্তু এটা মস্ত বড় ভুল ধারণা। এর দ্বারা হয়তো অল্পকালের জন্যে কিছুসংখ্যক মূর্খকে প্রভাবিত করা সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর অকল্যাণকর পরিণতি বুঝতে পেরে' জনসাধারণ সযত্নে এই জাতীয় সাহিত্য থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে' নিয়ে' যায়। একটু ভাল করে' খুঁটিয়ে' দেখতে গেলে যে-কোনো মানুষ ধরে' ফেলৰে যে এই জাতীয় গম্ভীরনিনাদী ভাষার পেছনে সব

সময়েই থেকে' যায় একটা বড় রকমের শূন্যতা। সাধারণতঃ সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা অথবা জাতীয়তাবাদের অন্ধ মোহ যাদের দৃষ্টিতে যত বেশী আচ্ছন্ন করে' ফেলেছে এই জাতীয় সাহিত্য সেই শ্রেণীর সাহিত্যিকদের কলম থেকেই তত বেশী বেরিয়ে থাকে।

শিল্পে শ্লীলতা–অশ্লীলতা বা শালনীতা–অশালীনতা নিয়ে' শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মধ্যেও মতভেদ রয়েছে।

দক্ষিণপন্থী শিল্পী বা সাহিত্যিক অথবা শিল্পরসজ্ঞ বা সাহিত্যরসিক এ ব্যাপারে কতকটা যেন বর্ণাশ্রম ধর্মের পরিপোষকদের মত। এরা ভাৰে পাণ থেকে সামান্য চূণটুকু খসলেই যেন শিল্প ও সাহিত্যের জাতিচ্যুতি হৰে। এই জাতবেজাতের ভাবনায় অত্যধিক মাথা ঘামিয়ে অর্থাৎ শ্লীলতা–অশ্লীলতা বা শালীনতা–অশালনীনতা নিয়ে অত্যধিক গবেষণা করার ফলে সাহিত্যের মূল আর্দশ তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। লেখা, রেখা, বা ছেনি–হাতুড়ি যদি তথাকথিত নীতিবাদের কচকচানি নিয়ে' ব্যস্ত থাকে তবে তা জনসাধারণের কোনো অংশের কাছেই কোন আবেদন পৌঁছিয়ে দিতে পারে না। একখানা বই খুলে বসুন তাতে যদি আগাগোড়া লম্বা–চওড়া নীতিবাদের কথাই থাকে তা' হ'লে

পাঁচ পাতা পড়তেই আপনার মাথা ধরে' যাবে। চলচ্চিত্রে যদি আর সব কিছুকে উপেক্ষা করে' কেৰল নৈতিক আর্দশের বুলি কপচে' যাওয়া হয়, জনসাধারণ সেই ছবিকে গ্রহণ করবে না। মোদ্দাকথাটা হচ্ছে এই যে সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টিতে জনকল্যাণের ভাবনাটাই থাকবে প্রধান, আর সে ভাবনা রসসৃষ্টির মাধ্যমেই রূপ পরিগ্রহ করৰে–স্থূল বোদ্ধার মধ্যে সূক্ষ্ম মণীষার উদ্বোধন করে চলবে। তাই শিল্পী বা সাহিত্যিককে যেখানে রসসৃষ্টির মাধ্যমে এগিয়ে' যেতে হবে সেখানে কোনো রকমেই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ৰোধকে আঁকড়ে ধরে' থাকলে চলবে না। তাতে তার অগ্রগতি ব্যাহত হবে। অতিরিক্ত শুচিতা–ৰোধ শুচিবায়ুর মত তাকে চেপে' ধরে' তার প্রগতির পথ রুদ্ধ করে দেবে।

এই শুচিবায়ুগ্রস্ত তথাকথিত দক্ষিণপন্থী লেখক পাহাড়, সমুদ্র বা জ্যোৎস্না নিয়ে' কবিতা লিখৰে, বালিগঞ্জের অভিজাত সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে ড্রইং রুমের রচনা তৈরী করবে কিন্তু গ্রামের অবহেলিত অশিক্ষিত সমাজের শত–লক্ষ লাঞ্ছনা, নীচতা বা পশুত্বের বা নোংরামির কথা লিখতে তাদের কলমে ৰাধৰে কারণ সেগুলো যে অসুন্দর। অনের ক্ষেত্রে অশালীন বা অশ্লীল পতিতায় জঘন্য জীবন, বস্তীর পূতিগন্ধময় আবেষ্টনী, সমাজবিরোধী নরপশুদের পৈশাচিক বুভুক্ষা–

এগুলোর সৰ কটাকেই তাঁরা এড়িয়ে' চলতে চাইবেন, কারণ এদের সম্বন্ধে লিখতে গেলে এমন অনেক কথাই লিখতে হবে যা' শ্লীলতার মাপকাঠিতে বাতিল ৰলে' গণ্য হ'বার যোগ্য।

মানুষ–মনে এমন অনেক ভাব বা বৃত্তি আছে যেগুলো সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু এই "ছুঁবি ছুঁবি সব গেল" মনোভাবের শিল্পী বা সাহিত্যিক এ জিনিসগুলোকে সযত্নে এড়িয়ে' চলতে চান। ভাবেন, সাহিত্যে এগুলোকে স্থান দিলে সমাজে বিপর্যয় দেখা দেৰে। আমি এই দক্ষিণপন্থী মনোভাব সমর্থন করতে পারি নে।

শিল্প জগতে যাঁরা বামপন্থী তাঁরা আবার আরও ভয়ঙ্কর। দক্ষিণপন্থীদের অপরাধ তাদের নিষ্ক্রিয়তা আর বামপন্থীদের অপরাধ তাদের স্বার্থকেন্দ্রিক অতিসক্রিয়তা। এরা যেন জীবনের নোংরা দিকটাই খুঁজে খুঁজে বেড়ান, আর মক্ষিকার মত সমাজের সেই ক্ষতরসগুলোতে নিজেদেরকে পুষ্ট করতে চান। মনে রাখা দরকার মক্ষিকা ক্ষত সারায় না, ক্ষতের বৃদ্ধিই তার কাম্য, কারণ ক্ষতের রসই তাকে প্রাণরস যুগিয়ে দেয়। সমাজের নোংরা দিকগুলিই তাই এই সব সাহিত্যেক বা শিল্পীদের বেঁচে' থাকার একমাত্র পুঁজি।

মানব মনের হীন বৃত্তিগুলোকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টি করলে স্বাভাবিক নিয়মে দলে দলে লোক সেই দিকেই ঝুঁকবে তার ফলে তাদের হাতেও বেশ দু'পয়সা আসবে। শিল্প সৃষ্টির পেছনে এছাড়া আর কোনো সদুদ্দেশ্য এই শ্রেণীর শিল্প বা সাহিত্যিকদের নেই। হীন, অশ্লীল, অশালীন জিনিসগুলো খুঁজে' খুঁজে বার করবার চেষ্ঠা থাকায় শিল্পের মূল আর্দশটুকু এদেরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে' যায়।

আগেকার পুনরাবৃত্তি করে এইটুকুই ৰলৰ যে এ ব্যাপারে মধ্যমপন্থাটাই ঠিক, আর্দশ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া চলবে না, আর সেই কল্যাণের পথ ধরে চলবার সময়ে শালীনতা, অশালনীনতা বা শ্লীলতা, কাকে ছুঁয়ে তুলি, কলম বা ছেনী এগিয়ে' চলেছে তা নিয়ে' মাথা ঘামাৰ না। মাথা ঘামাতে গেলেই দিক্-ভ্রান্তি দেখা দেবে।

সৎ নাগরিকদের কেন্দ্র করেই যে সাহিত্য তৈরী করতে হবে এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম কোনো মতেই মেনে' নিতে পারি নে। হীন, নীচ মানুষগুলোকে যে সব সময়েই পাঠক বা দর্শকদের চোখে ছোট করে' দেখাতে হবে, এমন নীতিও মেনে' নিতে রাজী নই। আমার মতে শিল্পী যা-কিছু তৈরী করবে তাতেই যেন থাকে তার দরদী মনের ষোল আনা স্পর্শ। যারা

নীচ, যারা অবহেলিত, সমাজ যাদি'কে নরকের কীট বলে' মনে করে, মনে রাখতে হবে তাঁরাই বেশী অসহায়, সাহিত্যের মজলিসে তারাই সৱ চাইতে Unrepresented। তারা মূক, তাই তাদের মধ্যে যে ব্যথাকাতর মানুষ–মন লুকিয়ে' রয়েছে তার ভাব ফুটিয়ে' তোলবার গুরুদায়িত্ব শিল্পীকেই নিতে হবে। তার গায়ের ধূলো ঝেড়ে' দিয়ে' সমাজের আর পাঁচটা মানুষের সঙ্গে পঙিক্ততে বসবার যোগ্যতা তাদের মধ্যে এনে' দেবার দায়িত্ব শিল্পী–সাহিত্যিককেই নিতে হবে।

অনেকেই অনুযোগ করেন যে আজকালকার সাহিত্যের বেশ একটা মোটা অংশই সস্তা প্রেমের প্যানপ্যানানিতেই ভর্তি। তাঁদের এ অনুযোগ আমি সমর্থন না করে' পারছি না। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, শিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্বন্ধেই দেখে' মনে হয় তরুণ সমাজের বুঝি এই জাতীয় তথাকথিত প্রেমকে নিয়ে' ব্যস্ত থাকা ছাড়া আর কোনও কাজই নেই। আর কলেজে–পড়া অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিটি কন্যাই বুঝি কোনোপ্রকার শালীনতার বালাই না রেখে' এক শ্রেণীর প্রেমের অভিনয়েই ব্যস্ত রয়েছে। বস্তুতঃ যে সৱ শিল্পী বা সাহিত্যিক এই জাতীয় ছবি আঁকতেই অভ্যস্ত হয়ে' উঠেছেন তাঁদের মনোবৃত্তিতে আমি ক্লীবতাসুলভ মনোভাব ছাড়া কিছুই বলতে

পারি না। প্রেম শব্দের দার্শনিক গূঢ়ার্থ স্বরূপ যাই হোক না কেন, এ কথাটা ঠিক যে প্রেমের স্বরূপ দেহাতীতে, সীমার বন্ধনের বাইরে। শিল্পী যখন প্রেমের এই ভাবটুকুই তন্ময় থেকে' ভাষায়, অলঙ্কারে, মুদ্রাব্যঞ্জনায় তা জন-সাধারণকে বোঝাবার চেষ্ঠা করেন তখন তার মধ্যে শিল্পী-প্রতিভার চরম মাধুর্যটুকু ফুটে' ওঠে। তবে তাঁর সৃষ্টি গণসাহিত্য বা গণশিল্প (বা যুগশিল্প) নামে অভিহিত হ'তে পারে না। কেন না শিল্পস্রষ্টার সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি গ্রহণ করবার মত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই অপরিপুষ্ট। রবীন্দ্র-সহিত্যে কোথাও কোথাও আমরা এই বিশুদ্ধ দেহাতীত প্রেমের আভাস পাই কিন্তু যেখানেই রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখনীতে তা' ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন সেখানেই তিনি জনসাধারণ কাছে দুর্বোধ্য হয়ে' পড়েছেন। উপনিষদের অতীন্দ্রিয় মাধুর্যমণ্ডিত শ্লোকগুলির ভাবও তাই জনসাধারণের কাছে দুর্জেয়। এই যে দেহাতীত প্রেম এ দেশ-কাল-পাত্র সকল সীমার বাইরেই নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে' রেখেছে শাশ্বত কালের জন্যে।

অসীম প্রেম সসীম প্রেমেরই আনন্দোচ্ছল চরম বিকাশ। এই বোধটুকুই শিল্পী যেখানে সাধারণের মনে জাগিয়ে' তোলবার চেষ্ঠা করেন, সীমার সঙ্গে অসীমের, দেহগতে'র

সঙ্গে দেহাতীতেই সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াসে রত হন, তখন তাঁর যে সৃষ্টি তা' বিশুদ্ধ দেহাতীত না হ'লেও তারই মর্যাদা শিল্প ভূমিতে সব চাইতে বেশী। কারণ তা' মানুষ-মনের যে মাধুর্য সহজ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে তাকে ধীরে ধীরে এক ইন্দ্রিয়াতীত স্বাপ্নিক পরিবেশের মধ্যে পৌঁছিয়ে' দেয়। **রবীন্দ্রনাথের 'ঊর্বশী' কবিতাটি ঠিক এই ধরণেরই রচনা।** তাতে স্থূলত্বের অভাব নেই, বোঝাও কষ্টকর নয়, অথচ স্থূলত্ব ধীরে ধীরে সূক্ষ্মত্বের ব্যাপকতায়, **বোঝা ক্রমশঃ বোঝার অতীতে গিয়ে' পৌঁছায়।**

যে প্রেম সম্পূর্ণরূপে দেহগত, দার্শনিক মতে তা প্রেম পদবাচ্যই নয়, তাই দর্শন শাস্ত্র তাকে মোটেই আমল দেবে না, দেওয়া হয়তো উচিতও নয়। কিন্তু শিল্পী কি তাকে উপেক্ষা করতে পারে? ছোট বড় প্রতিটি ঘটনার মধ্য দিয়েই সাধারণ মানুষ হর্ষ-বেদনা অনুভব করে। দেহগত প্রেমও হর্ষ-বেদনা থেকে' সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ধরণের কোনো বস্তু নয়। আর শিল্পী যখন মানুষের এই হর্ষ বেদনাকেই ফুটিয়ে' তুলবে, আশা-আকাঙ্খা, ব্যথা-বেদনার সংঘাতকে রূপায়িত করবে তখন সে এই দেহগত প্রেমকেই বা উপেক্ষা করে কি করে?

এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন কোনো শিল্পী বা সাহিত্যিকই তা' সমর্থন না করে' পারবেন না, –

"ওরে কবি সন্ধ্যা হয়ে' এল,
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক
বসে' বসে' ঊর্দ্ধ্বপানে চেয়ে,
শুণতেছ কি পরকালের ডাক?
কবি কহে সন্ধ্যা হ'ল বটে,
বসে আছি লয়ে' শ্রান্ত দেহ,
ওপারে ওই পল্লী হ'তে যদি,
আজও হঠাৎ ডাকে আমায় কেহ।
যদি হেথায় বকুল তরুচ্ছায়ে,
মিলন ঘটে তরুণ–তরুণীতে,
দু'টি আঁখির পরে দু'টি আঁখি,
মিলিতে চায় দুরন্ত সঙ্গীতে।
কে তাহাদের মনের কথা লয়ে'
বীণার তারে তুলৰে প্রতিধ্বনি,
আমি যদি ভবের কূলে বসে
পরকালের ভালমন্দই গণি।"

সূচীপত্র

এখানে লক্ষ্য করার একটা জিনিস হ'ল এই যে শিল্পী চাইবে সত্যের সহজ রূপটা অন্তরের মাধুর্য দিয়ে' রসঘন করে' জনসাধারণের সামনে তুলে' ধরতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বলতে হচ্ছে আজকালকার একশ্রেণীর শিল্পী (কবিতা, কথান্যাস, সিনেমা, নাটক সব জগতেই এঁদের যাতায়াত আছে) মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতি তো দূরের কথা, স্থূল বৃত্তিগুলিকেও যথোচিত-ভাবে রূপস্রষ্টার মনোভাব নিয়ে' ফুটিয়ে না তুলে স্কুল বৃত্তিরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যেই নিজেদের সমস্ত শিল্প প্রতিভাকে বিনিয়োগ করেন। কোন রকম রক্ষণশীলতা বা ছুঁৎমার্গকে প্রশ্রয় না দিয়েও বলৰ যে এই শ্রেণীর শিল্পী সত্যিই সমাজের পক্ষে একটা বড় রকমের কলঙ্ক।

কিছুদিন আগেও নাট্যরসিক মহল থেকে প্রায়ই একটা অভিযোগ উঠত যে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের পরে তেমন কোন প্রতিভাশক্তি সম্পন্ন নাট্যকার দেখা যাচ্ছে না ও সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলি দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'লেও নাট্য শাখাটি ধীরে ধীরে শুকিয়ে' মরছে। তাঁদের এ অভিযোগ এক কথায় উড়িয়ে' দেওয়া যায় না ও আজকের দিনের নাট্যমোদী জনসাধারণ, নাট্যকার অভিনেতা ও সমাজ হিতৈষীদের এ সম্বন্ধে অনেক কিছুই ভেবে' দেখার রয়েছে।

সূচীপত্র

ভাল নাটক কেন পাওয়া যায় না? রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার স্পর্শে যে নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠেছে তাতে কি 'ভাল নাটক' নেই? 'ভাল নাটক' বলতে অনুযোগকারীরা হয়তো মাঞ্চসার্থক নাটকের কথাই ভেৱে' থাকেন, আর রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকই মঞ্চসার্থক নয় বলে' তাঁরা সেগুলোকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না।

সাহিত্যগত বিচারে নাটক জিনিসটাকে আমরা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ফেলতে পারি! প্রথম–মাঞ্চসার্থক নাটক (প্লে-রাইট) আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে রসসমৃদ্ধ নাটক যা বুঝতে গেলে একটু ৱিশেষ Intellect বা রসজ্ঞানের দরকার পড়ে–ইংরেজী সাহিত্যে যাকে বলা হয় 'ড্রামা'। প্রথমোক্তটি অর্থাৎ প্লে–রাইট বা নাট্য জিনিসটি যুগসাহিত্যেরই অঙ্গবিশেষ। তাই তার রচয়িতার পক্ষে যুগের সমস্যা সম্বন্ধে ভাল রকম অবহিত থাকা দরকার। আর এই যুগের সমস্যাকেই সে নাচ–গান–হৈ-হল্লা, হাসি- তামাসা–ব্যথা–বেদনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে' তোলে, সেখানেই তা মঞ্চসার্থক হয়ে' ওঠে। চরিত্রসৃষ্টিতে ও ভাবের সংঘাত–প্রতিঘাতে ছোট–বড় যদি ত্রুটিও থেকে যায় তাতে এই শ্রেণীর নাটকের জনপ্রিয়তার বিশেষ কোনো ৱাধা আসে না। হাল্কা মনের দর্শক। খানিক ক্ষণের জন্যে হেঁসে',

কেঁদে, নাটক দেখে' আর গান শুণে' খুসী মনে বাড়ী চলে' যায়, নাটকের ভাব বা ভাষার সমলোচনা করবার ইচ্ছাও তার মনে জাগে না। রচনাকারকেও তাই সাধারণ মানুষের চাহিদার পানে চেয়ে কলম ধরতে হয়। সাহিত্যিক বা শিল্পী হিসেবে তাঁর যদি কোন দোষ-ত্রুটিও থাকে, তবে সেগুলোও তিনি অনায়াসে সস্তা আমোদ-প্রমোদের স্রোতে ভাসিয়ে' দিতে পারেন। অর্থাৎ কিনা সাধারণ দর্শকের জন্যে তিনি যা' লিখছেন তা' সাধারণকে খানিকটা খুসী পরিবেশন করে' নিজের অস্তিত্ব সার্থক করে। বর্তমানে ভারতের, বিশেষ করে' মুম্ব্রে-মার্কা অধিকাংশ ছবিরই আকৃতি, প্রকৃতি এই শ্রেণীর নাট্যশ্রয়ী। এতে লোকের তলিয়ে' ভাববার বা বোঝবার কোন কিছু নেই। বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্নও বড় একটা নেই। এমন কি যুগ-সমস্যার ছাপ থাকলে তো ভালই, না থাকলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আগেই বলেছি নাট্য বা প্লে-রাইট বলতে যা বোঝায় তা সর্বাঙ্গসার্থক হয় যদি তাতে সস্তা-হৈ-হল্লার সঙ্গে যুগের আলেখ্যও ফুটে' ওঠে। কিন্তু তা' করতে গেলে অর্থাৎ যুগকে নাটকের অঙ্গীভূত করতে গেলে নাট্যকারের যুগ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। যার তা আছে সে-ই নাট্যকার, তাঁর প্লে-রাইটেই ঘটে

জনসাধারণের চাহিদার সঙ্গে লেখকের মুন্সিয়ানার অপূর্ব সমন্বয়।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনাই কিন্তু–প্লে–রাইট বা নাট্য–পর্যায়ভুক্ত নয়। তিনি ছিলেন কবি, সত্যিকারের কবি, তাই তাঁর তৈরী নাটক যুগের দাবীকে উপেক্ষা না করেও যুগের পরিধির বাইরে থাকতে চেয়েছে আর এই জন্যেই তাঁর নাটক মঞ্চে (যেখানে অধিকাংশ দর্শকই সাহিত্যরস বোঝবার জন্যে যায় না, যায় কেবল খানকটা আমোদ–প্রমোদ করতে) জনপ্রিয় হ'তে পারেনি, কিন্তু শিল্পরসিক বা কলারসিকের কাছে তা' অকুণ্ঠ সমাদর পেয়েছে। দর্শক হিসেবে রঙ্গালয়ে উপস্থিত হয়ে যিনি তাঁর নাটকের রস ঠিকভাবে আস্বাদন করতে সক্ষম হন নি তিনিও পাঠক হিসেবে তাঁর নাটক পড়ে' অদ্ভূত রকমের আনন্দ পেয়ে' থাকেন। এই শ্রেণীর নাটককে, যাকে ইংরেজীতে ড্রামা বলে তার সংস্কৃত নাম দেওয়া যেতে পারে 'নাট্যায়ন'। অর্থাৎ নাট্য বা প্লে–রাইটগুলো এর থেকেই তাদের প্রাণরস সংগ্রহ করে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, যে সকল ড্রামা কতকটা প্লে–রাইটের ধাঁচে লেখা, সেগুলো সাধারণ প্লে–রাইটের চাইতে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আর এ থেকে এটাও বেশ বোঝা যায় যে সাধারণ মানুষ হৈ–হল্লাপ্রিয় হ'লেও

তাদের মধ্যে একটা প্রসুপ্ত রসবোধ আছে যা নাচ–গান ও সাধারণ মানুষের ব্যাথা–বেদনা ও হাসি–আনন্দের মাধ্যমেই ঠিকভাবে তাদের মধ্যে ফুটে' ওঠে। অবশ্য যে কোন দেশেই শিক্ষিত তথা সাহিত্য রসিকের সংখ্যা ৰাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ড্রামা জিনিসটাও মঞ্চে সার্থক হয়ে' উঠতে থাকে। সেক্সপিয়রের নাটক মঞ্চস্থ করলে পূর্বে রঙ্গালয়ের মালিককে বেশ বড় রকমের ঘা খেতে হ'ত। কিন্তু সহিত্য–রসিকের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেক্সপিয়রের নাটকের জনপ্রিয়তা প্লে–রাইটের জনপ্রিয়তাকেও ছাপিয়ে উঠেছে।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাই প্লে–রাইট পর্যায়ভুক্ত। এর কারণ তিনি ছিলেন পেশদারী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ড্রামা অভিনয় করলে যে তৎকালীণ সমাজে তা' বিশেষ সমাদর পাবে না আর ব্যবসার দিক দিয়ে' তাঁকে যে তাতে ঘা খেতে হৰে–এ কথা বিলক্ষণভাবে বুঝেই তিনি প্লে–রাইট রচনার হাত লাগিয়ে' ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন নামকরা অভিনেতা। তাই তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনার প্রতিটি চরিত্রকেই মঞ্চের দর্শকেরা লুফে' নিয়েছিল। তবু্ একথা ভুললে চলবে না যে জীবিকার খাতিরে প্লে–রাইট লিখলেও তাঁর ভেতরে ছিল একটা গভীর শিল্পরসিক কবিমন, তাই

তাঁর বেশীর ভাগ প্লে-রাইটে ড্রামার স্পর্শ লেগেছে ...অতীন্দ্রিয়ত্বের সুর বেজে' উঠেছে। বস্তুতঃ নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে' গিরিশচন্দ্রের রচনাকে বিচার করতে গেলে বলতে হয় ড্রামা ও প্লে-রাইটের একটি মধ্যবর্তী পন্থাই তিনি বেছে' নিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে তাঁর ভাষাতেই বলতে হয় যে-

"আল্লা তারে বোল ওঠে না,

টানলে ছেঁড়ে কোমল তার"।

যাঁরা বলেন মহাকবি গিরিশচন্দ্র গত হ'বার পর থেকে আর কোন ভাল নাটক পাচ্ছি নে, আমি তাঁদের সঙ্গে ষোল আনা একমত হ'তে পারলুম না; তবে তাঁদের অনুযোগ একেবারে অস্বীকার করতেও পারছি নে। তাঁদের ভাষাই একটু শুধরে' নিয়ে' বলব যে গিরিশন্দ্রের পর অনের ভাল ভাল নাট্যকারও পেয়েছি, নাটকও পেয়েছি, কিন্তু গিরিশ-প্রতিভায় যেমন একাধারে একজন শক্তিশালি নট ও নট্যকারকে পেয়েছিলুম, তেমনটি আর পাচ্ছিনে।

আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে একটা খুৱ ৰড় রকমের মতভেদ দেখি। সেটা হ'ল নাচ–গানের প্রয়োজন কতখানি তাই নিয়ে'। অভিনয়ে আবহসঙ্গীত পরিবেশ সৃষ্টির কাজে যে ভাল রকমের সাহায্যে করে এতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। আর এই আৰহসঙ্গীতে ঠিক গান পর্যায়ভুক্ত নয়, জিনিসটা মনকে ভাব গ্রহণে সাহায্যে করবার একটা সূক্ষ্ম কৌশল মাত্র। এতে স্বাভাবিক অস্বাভাবিকের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তারা জেনে'–শুণে অভিনয় দেখতে গেছে, আৰহ–সঙ্গীতকে অভিনয়েরই একটি স্বাভাবিক অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে তাদের মোটেই ৰাধে না। কিন্তু গান জিনিসটা যে নাটকে থাকতেই হবে এমন কোনও বাঁধাধরা নিয়ম আমি মানতে রাজী নই। জনসাধারণের কাছে থেকে সস্তা হাততালি পাবার উদ্দেশ্য যে সব প্লে–রাইট লেখা হয়ে' থাকে তাতে নাচ–গানের অযথা ৰাহুল্য থাকে থাকুক্ অথবা একেবারেই অস্বাভাবিকভাবে প্রতিটি ঘটনা জানবার জন্যে নায়ক–নায়িকাদের মুখে গান দেওয়া হয় হোক, কিন্তু ড্রামা রচনার বেলায় এ সম্বন্ধে খুব বেশী সতর্কতার প্রয়োজন। এমন নাটকও দেখেছি যাতে কোন শোকাবহ ঘটনার পর (প্রিয়জনের মৃত্যুর পর) শোকাতুরা – জননী বা পত্নী রীতিমত তাল–লয় সহযোগে বিলাপ–সঙ্গীতে গাইতে বসে' গেছেন। সূক্ষ্মভাবে বাস্তববিচারে যাঁরা

সাহিত্যরসজ্ঞ তারা বিরক্ত হয়ে' প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করবেন। কারণ জিনিসটা শুধু অবাস্তবই নয়, একেবারে রুচিবিগর্হিত। পূর্ব থেকে যাঁদের ভাল রকম জানাশোণাও ছিল না এই রকম নায়ক–নায়িকাকেও অনেক সময় দ্বৈত সঙ্গীত গাইতে দেখা যায়। তাঁরা কি পূর্ব থেকেই গানের রিহার্সাল দিয়ে' রেখেছিলেন? বস্তুতঃ গীতিনাট্য ব্যতিরেকে অন্যান্য সমস্ত নাটকেই গান ব্যবহার করবার আগে বেশ একটা সংযম ও সুবিবেচনার দরকার। গীতাভিনয় বিবেকের গান বরং বরদাস্ত করা যায়, কারণ বিবেক নাটকের কোন স্বীকৃত চরিত্র নয়। কিন্তু নাটকের নায়ক–নায়িকার মুখে কাহিনীর কোন আনুসঙ্গিক গান একেবারেই বে–মানান। গান, তা সে যতই ভাবসমৃদ্ধ হোক না কেন, নাটকের গতিধারার কোন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানবার কাজে তাকে প্রয়োগ করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ গানও গায়, নাচেও; আর এই নাচ বা গান তার সুখ–দুঃখ, আশা–নিরাশাকেই রুপায়িত করে' থাকে, কিন্তু এই নাচ বা গান মানুষ গেয়ে' থাকে বিশেষ বিশেষ অবস্থায়। শোকের সঙ্গীত যে গেয়ে' থাকে শোকবহ ঘটনা–বলীর অনেক পরে। মড়া কোলে নিয়ে' মানুষ 'মড়াকান্না' কাঁদে, গান গায় না। কোনও আনন্দের খবর পেল চীৎকার করে' ওঠে, লাফিয়েও ওঠে, কিন্তু মুদ্রা–ছন্দ বজায়

রেখে' বিধি-সম্মতভাবে নাচতে আরম্ভ করে না। তাই বলছিলুম, দৈনন্দিন জীবনের অলেখ্য হিসেবে নাটকে নাচ-গান দেওয়া যেতে পারে কিন্তু দেখতে হবে তা' যেন রসজ্ঞ পাঠক বা দর্শকের কাছে অস্বাভাবিক না হয়ে' দাঁড়ায়। মনের সূক্ষ্মতর অংশগুলিকে নিয়েই ড্রামার কারবার, তাই ড্রামার গান অবশ্যই ভাবসমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীতের ধারা অবিকৃত রাখবার খাতিরে ভাবগত দীনতাকে ড্রামার গানে প্রশয় দেওয়া যায় না। প্লে-রাইটের গান জনচিত্তকে আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্য- নিয়েই রচিত হয়, তাই সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলবার নেই। তবে দেখতে হবে তাতে যেন অকল্যাণের বীজ নিহিত না থাকে।

আজকের দিনে মানুষের সময় অল্প। নাটক পড়তে বা অভিনয় দেখতে মানুষ আর খুব বেশী সময় দিতে পারে না। কালজয়ের দুরন্ত আবেগ ক্রমশঃই মানুষকে উগ্রভাবে পেয়ে' বসেছে। তাই নাটক লেখক ও পরিচালকদের তাদের চাহিদা বুঝে' যখন যেমন তখন তেমন' নীতি নিতে হচ্ছে। বড় নাটকে জীবনের আলেখ্য ফুটিয়ে' তোলবার বা চারিত্রিক সংঘাতের সার্থক রূপায়ণের যে অবকাশ আছে, ছোট নাটকে তা নেই। তবু মানুষের সময়ের দাম বেড়েছে বলে' আজ

ছোট নাটকের ওপরেই বেশী করে' জোর দিতে হচ্ছে। ছোট নাটকের প্রসারের মধ্যে বড় নাটকের পরিধির স্থান সঙ্কুলান অসম্ভব। তাই আমরা দেখতে পাই আজকের দিনে যে নাট্যকারই এই জাতীয় প্রচেষ্ঠায় রত হচ্ছেন তাঁরা সবাই প্রায় ব্যর্থ হচ্ছেন। ছোট নাটকে গোটা জীবনদর্শনকে ফুটিয়ে' তোলা অসম্ভব তো বটেই, কোন তথ্য বা সমস্যাকেই সম্পূর্ণভাবে গুছিয়ে' বলাও তাতে সম্ভব নয়। কোন তথ্য বা সমস্যা বা মতবাদের সামান্য একটু ভগ্নাংশ নিয়েই তাকে কাজ করতে হয়, আর ভগ্নাংশগুলির সমন্বয়ে অর্থাৎ অনেকগুলি ছোট নাটককে পাশাপাশি জুড়ে' নাট্যকার কোন একটি তথ্য বা সমস্যা বা মতবাদকে ঠিকভাবে গুছিয়ে' বলবার সুযোগ পেয়ে থাকেন। অনেকগুলি একাঙ্কিক মিলিতভাবে বহু–অঙ্কময় সমাজ–জীবনের দর্পণের কাজ করে' যায়।

নাটকের বিশেষ করে' ক্রাইম–ড্রামার সার্থকতা সাসপেন্স সৃষ্ঠির ওপরে অনেকখানি নির্ভর করে। বিষয় যেখানে খুব বেশী জটিল নয় সেখানে এই সাসপেন্স যদি নাটকের গোড়ার দিকে থাকে তাতে পাঠক বা দর্শকের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না, রসগ্রহণ মোটামুটি বিচারে অব্যাহত থাকে কিন্তু নাটকের কাঠামো যেখানে বিশেষ জটিল সেখানে একেবারে

প্রথমে সাসপেন্স সৃষ্টি না করে' নাটকের কাঠামোটি সম্বন্ধে পাঠক বা দর্শকের মোটামুটি একটা আঁচ দিয়ে' সাসপেন্স তৈরী করা বাঞ্ছনীয় কারণ তাতে পাঠক বা দর্শকের পক্ষে সাসপেন্স-এর পরিধি ও প্রসার বুঝতে সুবিধা হবে, অন্যথায় সাসপেন্সটুকুও যথাযথভাবে বুঝতে না পারায় সাসপেন্স ক্লীয়ারেন্স-এর ঔৎসুক্যও ঠিকভাবে জমতে পারে না। এতে করে 'না-জানার' দরুণ পরবর্তী ঘটনা জানবার আগ্রহের চাইতে কি জানি না সেইটে বুঝতেই সে তার মনঃশক্তিকে বেশী পরিমাণে খরচ করতে থাকে যার ফলে রসগ্রহণে বাধার সৃষ্টি হয়।

আমার মতে নাটক সম্বন্ধে যা কিছু বলা হ'ল তা দৃশ্য বা শ্রব্য দু' ধরণের নাটক সম্বন্ধেই সমানভাবে খাটে। এ দু'য়ের মধ্যে তফাৎ হ'ল এই যে দৃশ্য নাটকের লেখক পরিবেশ সৃষ্টির কাজে মঞ্চ-শিল্পীর কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়ে থাকেন শ্রব্য নাটকের লেখক তা পান না। তাঁকে বিভিন্ন চরিত্রের বক্তব্যের মাধ্যমে পরিবেশ সাজিয়ে নিতে হয়।

ছোট গল্পের পরিধি, প্রসার হুবহু ছোট নাটকের মত। তবে এতে লেখকের বড় জিনিসকে সংক্ষেপে বলবার কায়দাটুকুঠিক-ভাবে জানা থাকা দরকার। নাটকের মত ছোট

গল্পেও সাসপেন্স চমৎকার কাজ করে থাকে। চিত্র (স্কেচ) পর্যায়ভুক্ত ছোট গল্পগুলিতে লেখকের মধ্যেও নাটক রচনার গুণ থাকা দরকার। কেননা বস্তুতঃ চিত্র – জিনিসটি গল্প ও নাটকের একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। কোন কোন সমালোচক চিত্রকে নাটকেরই পর্যায়ভুক্ত ৰলে' মনে করেন। তাঁদের এই অভিমতের বিরোধিতা করবার কোন কারণ দেখতে পাই নে। আসলে নাটক ও গল্পের মধ্যেকার সব চাইতে বড় তফাৎ হচ্ছে এই যে নাটকের নায়ক–নায়িকারা নিজেরাই জীবন্ত রূপ নিয়ে' পাঠক বা দর্শকের সামনে এসে' কথা বলে' যায় আর গল্প কথান্যাসে কথা লেখক নিজে অথবা তাঁর মানসসৃষ্ট নায়ক নায়িকার মাধ্যমে করেন। নাটক, সে অপেরা, ব্যাস্কে, ড্রামা, প্লেরাইট, ছায়ানাট্য, অথবা অন্য যা কিছুই হোক না কেন নাটকের এই মূলধর্ম অর্থাৎ কতকগুলি জীবন্ত চরিত্রের আত্মপ্রকাশ, তাতে থাকতেই হবে।

কোন ঘটনা বা কাল্পনিক কাহিনী গুছিয়ে' ও রসিয়ে বলে' যাবার সুযোগ সাহিত্যিক যখন যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে' থাকেন তখনই তাঁর সৃষ্টিকে ৰলি বড় গল্প। সংস্কৃত ভাষার বড় গল্পকে বলা হয় 'কথা' ও ছোট গল্পকে বলা হয় 'কথানিকা'। গল্প–লেখকের দায়িত্বের চাইতে কথানৈয়ায়িকের

দায়িত্ব কিন্তু অনেক বেশী। এখানে কেৰল গুছিয়ে গল্প বলাটাই বড় কথা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ তথা চরিত্র সংঘাতগুলিও যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয়। গল্পকে কেন্দ্র করে' তটস্থ সাহিত্যের সম্ভাবনা ব্যাপকভাবেই থেকে যায়। 'নবেল' জিনিসটা কথান্যাসেরই প্রকারভেদ মাত্র। 'কথান্যাস' ও 'নবেল' শব্দ দু'টির যর্থাথ সংস্কৃত প্রতিশব্দ পাওয়া মুস্কিল। ৰাঙলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় প্রচলিত কথান্যাস শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় কাছাকাছি ন্যস্ত করা অথবা 'মুখবন্ধ'। ৰাংলা-হিন্দীতে শব্দটির অর্থ-বিভ্রান্তি ঘটেছে। ভারতের কোন কোন ভাষায় কথ্যান্যাস অর্থে 'কাদম্বরী' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়। ৰোধ হয় সংস্কৃত পুস্তক কাদম্বরী-র সহিত সম্পর্কযুক্ত এই অর্থেই শব্দটির ব্যবহার হয়ে' আসছে। নবেল সাহিত্য বলতে যা বোঝায় ঠিক তেমনটি জিনিস প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ছিল না। তাই এরও কোন পুরোণো পরিভাষা নেই।

সাধারণতঃ দেখা যায় বড় রকমের কোন একটা ৰিপর্যয়ের পরে মানুষের চিন্তাশক্তি কতকটা ভোঁতা হয়ে' যায়। অল্পকালের ব্যবধানে দু'টো বড় রকমের যুদ্ধ ও তজ্জনিত নানা রকমের দুঃখ-কষ্টে ভুগে, বর্তমানের মানুষ জাতটারও

অবস্থা এই রকমের হয়ে' দাঁড়িয়েছে। সিরিয়াস কোন কিছুকেই মানুষ যেন আর ভাবতে পারছে না–পড়তে বা বুঝতে চাইছে না। যে সব শিল্পী বা সাহিত্যিক সিরিয়াস কোন কিছু ভাবতে বা রূপায়িত করতে পারেন তাঁরাও জনসাধারণের কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়া যাবে না জেনে' এ কাজে আগ্রহ ৰোধ করছেন না। শিল্পী একেবারেই নেই এ কথাটা ডাহা মিথ্যা–শিল্পী আজও বেঁচে' মরে' আছে, নেই উৎসাহদাতা। "প্রকৃত শিল্পী কারুর কাছ থেকে উৎসাহ পাবার আশা নিয়ে' শিল্পরচনা করে না"– এ কথাটা মেনে' নিয়েও ৰলৰ প্রাণের আবেগে বা মরমীশিল্পী নিজের শিল্পবিকাশে আত্মহারা হৰার সাধনাতে যখন সৃষ্টিতে হাত লাগায় তখনও তার প্রাণ–শক্তির স্ফুরণের জন্যে রসদ যুগিয়ে' যাওয়া দরকার। এই রসদের অভাব ঘটলে শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেরও অকালবিয়োগ ঘটে। তাই শিল্পীদের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে' বা সস্তা ভাষায় তাদের অযোগ্যতাটাই জাহির না করে' এই ব্যাপারে যেটি সব চাইতে বড় সত্য সেটিকেই স্বীকার করতে হৰে অর্থাৎ কিনা নিজেরা সিরিয়াস কোন কিছু ভাবতে বা বুঝতে পারছি নে বলে' সত্যিকারের খানদানি জাতশিল্পীদের আজ ধ্বংসের পথে ঠেলে' দিচ্ছি।

কবিতা বা কাব্য–সাহিত্যে মূল সুরটি হচ্ছে মর্মাশ্রয়ী। তাতে হৃদয়াবেগের প্রাধান্য থেকেই যায়। গদ্যে যে জিনিসটা সোজা ভাষাতে বলা হয়, কবিতায় তাকে মর্মের রঙে রাঙিয়ে' ফুটিয়ে' তুলতে হয়, অজানার ইঙ্গিত দিতে হয়–দূরগতের সঙ্গে অনাগতের গতি–ধর্মী সম্পর্কটুকু হৃদয়বত্তার সাহায্যে বুঝে' নিতে বলা হয়। কাব্য তাই কাণে শুণে' বোঝা যায় না, কবির মর্মে মর্ম ছুঁইয়ে ৰুক্তে হয়। বাস্তবের কশাঘাত মানুষকে যত বেশী নিপীড়িত করে' চলেছে কাব্যের রসাস্বাদন করবার সামর্থ্য মানুষ তত বেশী হারিয়ে' ফেলছে। বস্তুতঃ কাব্যসাহিত্য, বিশেষ করে' মহাকাব্য আজকের দিনে একেবারেই অচল হয়ে' পড়েছে। অথচ নৈসর্গিকতার সঙ্গে অনৈসর্গিকতার সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াস যখন মানুষ প্রথম করতে শুরু করেছিল– সূক্ষ্ম রসবোধের উন্মেষ যখন প্রথম তার মধ্যে হয়েছিল সেদিন তার সাহিত্যের ঝাঁপি কাব্যের কড়িতেই পূর্ণ করা হয়েছিল। আজকের দিনে কিন্তু সে কড়ি অচল, ৰাজারে তার কোনো দাম নেই। কবিতা সাহিত্যও ধ্বংসপ্রায়। কবিতার বই কেউ পয়সা খরচ করে' কিনে' পড়ে না। তবু কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে মানুষের মধ্যে যখন হৃদয়াবেগের কিছুটা প্রাধান্য থাকে, সে বয়সে আজও লোকে কবিতা পড়ে থাকে, হৃদয়ের মাধুর্য নিয়ে' তা বোঝবার বা

সূচীপত্র

আবৃত্তি করবার প্রচেষ্টা করে। কিন্তু প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের ঘাত–প্রতিঘাতে সংবেদনশীল মন যখন পুড়ে' ঝামা হয়ে' যায় কবিতায় রসগ্রহণের সামর্থ্য তখন আর থাকে না। তখন তার ভাল লাগে কেবল সেই সমস্ত জিনিস যার সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক আছে, যেখানে হৃদয়াবেগের দাম এমন কিছু নেই। এর যে ব্যতিক্রম একেবারেই নেই এমন কথা বলছি না। তবে সাধারণতঃ দেখে' থাকি বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়েরা যখন কোন কবিতা আবৃত্তি করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটি বা সেগুলি তাঁর কৈশোরে বা প্রথম যৌবনে মুখস্ত করা হয়েছিল। কবিরা এই ধাক্কা কাটিয়ে' উঠবার জন্যে বাস্তবধর্মী কবিতা রচনার দিকে কিছু কিছু ঝোঁক দিচ্ছেন, এটা মন্দ জিনিস নয়। এতে করে' কবিতাসাহিত্য দীর্ঘায়ু হ'বার পথ খুঁজে পাবে।

গীতিকারদের দৈন্য এখন আর ততটা নয় কারণ সিনেমা, রেডিও, গ্রামোফোন ও রঙ্গালয়ের দওলতে গানের বাজার এখনও আছে ও আশা করা যায় থাকবে। অবশ্য পরিশ্রমের মূল্য হিসেবে গীতিকার যা পান পরিশ্রমের তুলনায় তা কিছু নয়; তবু তাঁদের অবস্থা কবিতাকারদের চাইতে ভালো। সিরিয়াস সব কিছুই নষ্ট হ'তে বসেছে, ভাষার চটক আছে,

রাগ-রাগিনীর বালাই থাক বা না-থাক মিশ্র সুরের জৌলুষ আছে কিন্তু ভাব-সম্পদের দিক থেকে আধুনিক গান ক্রমশঃ যেন দেউলে হয়ে' চলছে।

বিষয় যার গুরুগম্ভীর সে ধরণের প্রবন্ধেরও আজকে চাহিদা নেই, কদরও নেই। হাল্কা গল্পের মত হাল্কা চটুল প্রবন্ধ মানুষ চাইছে। তাই কথানৈয়ায়িক বা প্রৰন্ধকারও তাদের মন যুগিয়ে' চলবার উদ্দেশ্যে রম্যরচনায় হাত লাগিয়েছেন। এই রম্যরচনায় সিরিয়াস কোন কিছুই থাকবে না। ঝরঝরে ভাষায় রচনাকার পাঠককে গল্প শুণিয়ে যাবেন ছোট বড় খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে', আর সেই গল্পরচনার ফাঁকে ফাঁকে থেকে' যাবে খানিকটা পাণ্ডিত্যের ঝিলিক, জুতা-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে। এ রম্যরচনা-লেখকের সামনে কোন বাঁধধরা নিয়ম নেই, কোন গঠনধর্মী প্রয়াস নেই, তাই কোন দায়িত্ব নেই। লেখক তাঁর বিষয়বস্তুকে গৌণ করে' রেখে' বা, ভাষার খেলাকেই যেন মুখ্য স্থান দিয়ে' থাকেন।

বক্তব্য যেখানে কিছুটা সাহিত্যিক রসবোধের উন্মেষ ঘটায় অথবা লেখকের কিছুটা দায়িত্ববোধের পরিচয় বহন করে সেই ধরণের রচনার নাম দিতে পারি' রসরচনা'। রম্যরচনায়

ভাবসম্পদ তেমন কিছু না থাকলেও এতে লেখককে বেশ কুশলী ও মজলিসী ঢঙে কথা বলবার অভ্যাসটুকু আয়ত্বে আনতে হয়। তাই দেখি, অনেক সময়ে–অনেক ভাল কথানৈয়ায়িকও রম্য-রচনাকার হিসেবে নিজের ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে' থাকেন।

সাহিত্যের আর একটা দিক্ ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে' উঠেছে–সেটা হচ্ছে শিশুসাহিত্য। সাহিত্যের অন্যান্য যে কোন ধারার চাইতে শিশুসাহিত্যে রচনাকারের দায়িত্ববোধ ও যোগ্যতা দু'য়েরই প্রয়োজন বেশী করে দেখা দেয়। শিশুসাহিত্যে প্রতিটিবাক্যে থাকবে একটা অদ্ভুত আকর্ষণী-শক্তি, একটা স্বচ্ছ সরলতা, একটা প্রাণ খুলে' কথা বলবার প্রয়াস। জীবনটাকে যে কতখানি সরলভাবে নেওয়া যেতে পারে শিশুসাহিত্যিককে সেইটেই জানিয়ে' বুঝিয়ে' দিতে হবে তার ভাষায়–ভাবে। শিশুমন কল্পনাপ্রবণ, তাই সাহিত্যিককেও তাদের জন্যে কল্পনার আকাশে ডানা মেলে হয়তো উড়ে' চলতে হবে কিন্তু তার চলার পথে জটিলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। সুদূরের যে পিপাসা অজানাকে জানবার যে ঐকান্তিক আগ্রহ শিশু–মনে থাকে; তার চরম পূর্ত্তি ঘটিয়ে দিতে হবে রঙ-বেরঙের রূপকথা মায়ালোকের ছবি এঁকে'।

বাস্তব-অবাস্তব এখানে বড় কথা নয়, ৰড় কথা হ'ল শিশুমনকে আনন্দ-স্রোতে ভাসিয়ে' নিয়ে যাওয়া, আর তারই মাঝে মাঝে খুব সহজভাবে দুনিয়াটাকে চিনিয়ে' দেওয়া। অতি কঠোরতাকে বা কঠোরতাকে কোথাও প্রশ্রয় দিলে চলবে না, শিশু তা' পড়তে চাইবে না, শুণতে চাইবে না। তার মনের রাজপুত্র নীল আকাশে ডানা মেলে', চাঁদ-সূর্যের দেশ ছাড়িয়ে'ডাইনী বুড়ির রাজ্যে এসে' মুক্তাগাছের সোণার ডাল-পালায় ঘোড়া বেঁধে রেখে' এগিয়ে' চলে নিঝুম রাজপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার সন্ধানে, জীবনকাঠি-মরণকাঠির খবর জেনে' রাজকন্যার যুগ-যুগান্তরের ঘুম ভাঙ্গিয়ে' সে সেই প্রসুপ্ত রাক্ষস-পুরীর সৰ কিছু জেনে' নেয়-কোথায় কোন্ ভোমরার মধ্যে কোন্ রাক্ষসের প্রাণ নিহিত আছে তার সবটুকু তথ্য জেনে' ফেলে' সে বীরের মত নিজেকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ছবির পর ছবি, রঙের পর রঙ এটা তার চাই-ই। শিশুদের মধ্যে যারা একটু বড় অর্থাৎ কিশোর বয়সের, তাদের ক্ষেত্রে শ্লেষাত্মক প্রহসনও বেশ ভাল কাজ দেয়। তাতে তাঁরা আর্দশ নির্ধারণের ও চরিত্র গঠনের সঙ্কেতটুকুও ভালভাবে বুঝে' নিতে পারে। কিন্তু যারা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সের তাদের জন্যে যা' কিছু লিখতে হবে তাতে সরলতাই হৰে সৰ চাইতে বড় কথা। শব্দের খেলা বা

কোন রকমের অলঙ্কারকে বেশী প্রশ্রয় দিতে গেলে বা একটানা দীর্ঘকাল ধরে' উপদেশ দিতে গেলে শিশুসাহিত্য

শিশু–সাহিত্যে একটা অনাদৃত অংশ হচ্ছে ঘুমপাড়ানী গান, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোক–ছাড়ার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সাহিত্য হিসেবে এরও একটা স্বকীয়তা আছে, একটা বিশেষ ধর্ম আছে। যে স্বাপ্নিক পরিবেশের মধ্যে শিশুসাহিত্য গড়ে' তুলতে হয় সে পরিবেশ তো এতে থাকেই, বরং পট–পরিবর্তন আরও দ্রুত তালে হয়ে' থাকে। নিজের মানস–মুকুরে ছবির পর ছবি, ছবির পর ছবি দেখতে দেখতে শিশু ঘুমের কোলে ঢলে' পড়ে। তাই ঘুমপাড়ানী গানের রচয়িতাকে মনে প্রাণে হ'তে হৰে একজন পাকা চিত্রকর–

"শান্ত হয়ে' শোণরে খোকা বলে' গেছে তোর দাদা
কিনে' দেৰে দুইটি ঘোড়া কালো আর শাদা।।
সকাল বেলায় শাদা ঘোড়ায় বেড়াৰে তুমি চড়ে',
কালো ঘোড়ায় চড়ৰে যখন বেলা যাৰে পড়ে'।।

শিশুর মন ঘোড়া, ঘোড়ার রঙ, ৰেলা, ৰেলার রঙ আর সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে' বেড়াবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে' যায় ও এই সকল ছবির কথা ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে' পড়ে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ঘমুপাড়ানী গানগুলোতেও বীরত্ব-ব্যঞ্জক ভাব আছে, জানৰার কথাও আছে, কিন্তু ভয় দেখাবার ভাব নেই। ভুল করেও যদি কোথাও ভীতম্মন্যতা সৃষ্টির প্রয়াস থাকে তবে তা ঘুমপাড়ানী গান রূপে গণ্য হ'তে পারে না। ঘুমপাড়ানী গানে শিশুর সঙ্গে প্রকৃতির খুব কৌশলে পরিচয় ঘটিয়ে' দেওয়া যায়। আর সে পরিচয় শিশুর কাছে পৃথিবীকে মোহময়ী করে' তোলে।

"ৰোলতা ঘুমায়, ভোমরা ঘুমায়, ঘুমায় মউমাছি,
শিউলী ফুলের গাছটি ৰলে আমি জেগে' আছি"
খোকা- "শিউলী কেন জাগে?
ঝরে পড়ৰে হ'লে ভোর,
সেই সময়ে সোণার খোকা ঘুমটি যাৰে তোর।"

ঘুমপাড়ানী ছড়ায় খুৰ কৌশলে হাশিখুশীর মাধ্যমে সংসারের অতিপ্রয়োজনীয় কাজকর্মগুলিও শিখিয়ে' দেওয়া যায়, যেমন–

"ছি ছি ছি ছি রাণী রাঁধতে শেখেনি,
শুক্তোনিতে ঝাল দিয়েছে অম্বলেতে ঘি,
জ্যাঠাইমাকে বলে ঝোলে মশলা দোৰ কি?
(আর) পরমান্ন রেঁধে ৰলে ফ্যান ফেলৰ কি?
(এদিক) ভোজবাড়ীতে খোঁজ পড়েছে
এখন উপায় কী?"

অনেক সময় এই জাতীয় ছড়ার মধ্যে সমাজের বাহ্যিক সমৃদ্ধির পাশে মানুষের ব্যথাভরা ক্লান্ত রূপটুকুও ফুটিয়ে' তোলা যায়। তবে সেটাও বলে যেতে হবে বেশ হাসিখুশীর মাধ্যমে।

"খুকুর দোৰ বিয়ে আমি হট্টমালার দেশে
তারা গাই–ৰলদে চষে,
হীরেয় দাঁত ঘষে।
রুইমাছ–পটোল তাদের ভারে ভারে আসে,
(কিন্তু) খুকুকে আনতে গেলে খুকুর শ্বাশুড়ী
পিছন ফিরে বসে।।"

সূচীপত্র

তাই বলি, শিশুর চরিত্রঘটনের কাজে এই অনাদৃত লোকছড়া বা ঘুমপাড়ানী গানগুলিতে মূল্য যথেষ্ঠ রয়েছে, বিদগ্ধ সাহিত্যিক সমাজের এদিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

সূক্ষ্ম রসানুভূতির পথেই মানুষের মধ্যে শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস জেগেছিল। ইন্দ্রিয়বোধের সীমা পেরিয়ে অতীন্দ্রিয়ত্বের প্রতিষ্ঠাই শিল্প-সাধকের কাম্য, শিল্প-সাধকের আদর্শ। তাই এই শিল্প-সাধক, আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে, ললিতকলার উপাসক যদি তার চলার পথটি ঠিক রাখতে চায় তৰে তাকে অধ্যাত্মসাধক হ'তেই হবে। আধ্যাত্মিক ভাব যে গ্রহণ করেনি অথবা আধ্যাত্মিকতার আদর্শ যে গ্রহণ করতে চায় না, তার পক্ষে ললিতকলার চর্চা করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। জীবনটাকে বা জগতের সব কিছুকে যে অধ্যাত্ম ভাব নিয়ে' দেখে' থাকে সে-ই সব কিছুই মধ্যে একটা সূক্ষ্ম রসঘন সহজ সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে। এই সহজ সত্তাকে যে যত বেশী উপলব্ধি করেছে, যত বেশী আপন বলে' বুঝেছে কলাস্রষ্টা হিসেৰে যে তত বেশী সর্থকতা লাভ করেছে। প্রতিভাশক্তির অধিকারী হয়েও যে এই সূক্ষ্ম সহজসত্তাটুকুকে খোঁজে না, ভাবধারা যার দিভ্রষ্ট- পালছেঁড়া তরণীর মত, তার পক্ষে সার্থক শিল্পসৃষ্টি একেবারেই অসম্ভব। কারণ তার

মানসদেহের দিক্লান্তি লেখায়–লেখায় প্রতিফলিত হয়ে' এক অদ্ভুত কিম্ভুতকিমাকার বস্তুই সৃষ্টি করে' বসে। এ ছাড়া ব্যষ্টিগত জীবনেও সেই সকল শিল্পীর দারুণ বিপর্যয় নেবে' আসে কারণ সাময়িক সূক্ষ্মতাবোধ ও সাময়িক জড়–ভোগাভিলিপ্সা এই দোটানায় পড়ে' সূক্ষ্মতা ও শিথিলতার বিপরীতধর্মী চাপে পড়ে' সে চারিত্রিক দৃঢ়তা হারিয়ে' ফেলে। তাই পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা দেখে' থাকি যে যিনি যত বড়ই প্রাতিভা শক্তিসম্পন্ন কবি, সাহিত্যিক বা শিল্পী হোন না কেন যাঁদেরই জীবনে আধ্যাত্মিক আর্দশনিষ্ঠা তথা আধ্যাত্মিক সাধনার অভাব ছিল তাঁরা শিল্পী হিসেবে যতটুকু প্রতিষ্ঠা অর্জন করে' থাকুন না কেন চারিত্রিক শিথিলতার জন্যে মানুষ হিসেবে জনসমাজের শ্রদ্ধেয় হতে পারেন নি। এই চরিত্র গত দৃঢ়তার অভাবেই অনেক ভালভাল গায়ক, নর্তক, অভিনেতা ও বিভিন্ন প্রকারে শিল্পীর প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হবার আগেই শুকিয়ে মরেছে। আগেই বলেছি অতীন্দ্রিয়ের স্পর্শ যাতে যত বেশী শিল্পী হিসেবে তার সার্থকতা ততবেশী। কারণ মানুষের মন জ্ঞাত সারেই হোক আর অজ্ঞাত সারেই হোক অতীন্দ্রিয়ত্বের পানেই ছুটে চলেছে, সে অজানারই পিয়াসি, – জানাকে তার ভালো লাগে না। আর এই জন্যেই দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলোকে নিয়ে যেখানে শিল্পী সৃষ্টির

প্রয়াস তাতে আর যাই থাকুক না কেন মানব মনের সূক্ষ্ম বোধিসত্তার কাছে তার আবেদন গিয়ে পৌঁছায় না।

প্রাতিভশক্তি না থাকলে কি শিল্পী হওয়া যায় না, অথবা শিল্প কি কেৰল সাধনার ধন?–এটা বেশ জটিল প্রশ্ন। তবে আমার মনে হয় এর উত্তর আধ্যাত্মিক ক্ষুধাতেই নিহিত রয়েছে অর্থাৎ প্রাতিভশক্তিসম্পন্ন ব্যষ্টি জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক একটা বড় রকমের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিয়েই জন্মেছে। আর এ ক্ষুধা যার নেই. তার পক্ষে কেৰল মেজে' ঘষে' চেষ্টা–চরিত্র করে' শিল্পী হ'ৰার অভিলাষ একেবারেই অর্থহীন। তবে হ্যাঁ, যার মধ্যে প্রাতিভশক্তি নেই সে–ও যদি কোন প্রকারে বড় রকমের আধ্যাত্মিক এষণা জাগিয়ে' তুলতে পারে সে ক্ষেত্রে তার পক্ষে প্রাতিভশক্তি অর্জন করা মোটেই অসম্ভব নয়।

কিছু দিন থেকে শিল্প সম্বন্ধে আরও একটা কথা খুব বেশী রকমের শুণতে পাচ্ছি। সেটা হচ্ছে শিল্প ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা। অনেকের মতেই সাধারণ অবস্থায় মানুষ যেভাবে খায়, ঘুমায়, কথা বলে শিল্পীকেও হুবহু সেই জিনিসটিকেই সেইভাবেই ফুটিয়ে তুলতে হৰে। অন্যথায় তা নাকি কলা–দোষে দুষ্ট হয়ে'পড়ৰে। অভিনয়–জগতে এই

মতবাদটির ওপর আজকাল অত্যধিক জোর দেওয়া হচ্ছে। আবৃত্তি ও অন্যান্য শিল্পকৃতিতেও এই মতবাদের ঢেউ লেগেছে। এঁদের এই মতবাদকে আমি কিন্তু ষোল আনা সমর্থন করতে পারলুম না। বক্তব্য, তথা বিষয়বস্তুর তারতম্য অনুযায়ী অভিনয়-পদ্ধতিতেও বৈচিত্র আসাই স্বাভাবিক। স্থূল ভাব প্রকাশ করতে গেলে দৈনন্দিন জীবনে স্থূল ভাষা-মুদ্রা-ব্যঞ্জনার আশ্রয় নিতে হয়। সূক্ষ্ম ভাবানুভূতিকে প্রকাশ করতে গেলে ওই স্থূল ভাষা, মুদ্রা ব্যঞ্জনাগুলি মোটেই কাজ দিতে পারে না। সেরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের ভাষা, উচ্চারণ-ভঙ্গি, মুদ্রা প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে' পড়ে ও এরূপ ক্ষেত্রে অভিনয়কে স্বাভাবিকতার আলেখ্য হিসেবে না দেখে' অভিনয়কে অভিনয় হিসেবে দেখলেই হয়তো রসগ্রহণে সুবিধা হবে, অন্ততঃ আমার তো এই ধারণা। বস্তুতঃ শিল্পীর ভাবটুকু ফুটিয়ে তোলাই বড় কথা, আর এই উদ্দেশ্যে 'যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমনি' পথই বেছে' নিতে হবে। স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতা নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। বিশ্বের প্রখ্যাত নটেরা কেউই স্বাভাবিকতা বা অস্বাভাবিকতা নিয়ে কোন কালেই মাথা ঘামান নি-আজও ঘামান না। এ ফতোয়া নাট্যজগতের রুই-কাতলাদের কাছ থেকে আসে নি, এসেছে শফরীদের তরফ থেকে। ভাষা ও মুদ্রা-এ দু'য়ের সমবায়েই

অভিনয়ের সৃষ্টি। তাই অভিনয়-শিল্পীকে এ দুটো জিনিসকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে হবে। স্বাভাবিকতার মুখ চেয়ে ভাষাকে অগোছালো বা ব্যষ্টিকে মুদ্রাহীন করতে গেলে চলবে না, কারণ ব্যষ্টিগত জীবনে (তথাকথিত স্বাভাবিক অবস্থায়) আমাদের লক্ষ্য থাকে নিজের ভাবকে ব্যক্ত করার দিকে। অন্যের কাছে সে ভাব পৌঁছিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যটা সে সময় গৌণ ভাবে থাকে। কিন্তু অভিনয় কালে অন্যের কাছে নিজের ভাবটুকু পৌঁছিয়ে দেওয়াই মুখ্য জিনিস।

সঙ্গীত সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলতে হয়। গীত, বাদ্য ও নৃত্য-এই তিনের মিলিত নাম সঙ্গীত। গীত যেখানে শাদামাটা জীবনের হাসি-অশ্রু নিয়েই রচিত সেখানে তা সাধারণের কাণে বা মর্মে পৌঁছিয়ে দিতে কোন অসুবিধা নেই। সাধারণ ভাষায় সাধারণ সুরের মাধ্যমেই সে তার কাজ সেরে' চলে'যায়। কিন্তু অনুভূতি যেখানে গূঢ় ও সূক্ষ্ম, শরীরের অণু-পরমাণুতে, তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে যেখানে স্পন্দন সৃষ্টি করতে হয় সেখানে গীতকেও আপাতঃ দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক পথ বেছে নিতে হয়। তাই গীতবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম অনুভূতি গ্রহণে যে অসমর্থ তার কাছে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের আলাপ 'প্রলাপ' ছাড়া আর কিছুই নয়। গীতকে যদি স্বাভাবিকতার শ্লোগান দিয়ে'

স্বাভাবিক স্বরেই নাবিয়ে' আনতে হয়, তাহলে গীত জিনিসটার বিলোপ সাধন করে' ছড়াকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আধুনিক সঙ্গীতের নামে দেশে আজকাল যে জিনিসটা চলছে, সেটা ভাল ভাষায় লেখা এই ধরণের ছড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাষা, ছন্দ ও সুর গীতের অত্যবশ্যক অঙ্গ–এদের কাউকে বর্জন করলে চলবে না।

নৃত্য জিনিসটা মুদ্রাপ্রধান ও ছন্দপ্রধান ভেদে মোটমুটি বিচারে দু'টো শাখায় বিভক্ত হ'লেও মুদ্রাবিহীন ছন্দময় নৃত্যকে নৃত্য বলে' মেনে নিতে অনেকেরই ৰাধৰে। নৃত্যের স্বরূপ বিচার করতে গেলে বলতে হয় যে মুদ্রা ও ছন্দ দু'টোই তার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। মুদ্রা দেৰে ভাবের অভিব্যক্তি, ছন্দ দেৰে তাকে গতিশীলতা।

বাদ্যের সঙ্গে গীতের তফাৎ হচ্ছে এই যে, গীতে ছন্দ, সুর ও ভাষা তিনই আছে কিন্তু বাদ্যে ছন্দ প্রধান, সুর অপ্রধান আর ভাষা একেবারেই নেই।

নৃত্য যেখানে ছন্দবর্জিত মুদ্রাসর্বস্ব তখন তাকে আর নৃত্য বলা চলে না। তাকে বলা হয় মূকাভিনয়। নৃত্য যেখানে মুদ্রা–বর্জিত তাতে কলাজ্ঞানের পরিচয় থাকে না বললেই

চলে। সুতরাং এ জাতীয় তথাকথিত নৃত্যকে বিশেষ ধরণের ব্যায়াম ছাড়া কিছুই বলতে পারি না।

আবৃত্তি আর অভিনয়ে সব চেয়ে বড় তফাৎ হ'ল এই যে অভিনয়ে ভাষা ও মুদ্রা দুই-ই থাকে। আবৃত্তিতে আছে কেবল ভাষা, তাই অভিনয়ের চাইতে আবৃত্তিতে উন্নততর রসবোধের পরিচয় মেলে।

স্থাপত্যবিদ্যায় সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ত-বিজ্ঞানেও রীতিমত দখল থাকার প্রয়োজন রয়েছে। তাই স্থাপত্য রয়েছে স্থূল ও সূক্ষ্ম বিদ্যার অপূর্ব সংমিশ্রণ। স্থাপত্য জিনিসটাতে তাই সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় যত বেশীই থাকুক না কেন কোন অবস্থাতেই তা-অস্বাভাবিক হবার সুযোগ পায় না। কিন্তু শিল্পকলার যে বিদ্যাকে সৱ চাইতে সূক্ষ্ম বলা হয় সেই চিত্রাঙ্কণ বা ভাস্কর্যে সত্যিই মানব-মনের অদ্ভুত রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থিরতার মধ্যেই সেখানে হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা, মুদ্রা-ভাষা সবকিছুই ফুটিয়ে' তুলতে হয়। এই চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যই লোকায়তকে লোকোত্তরের সঙ্গে মধুরভাবে সংযুক্ত করে।

অভিনয়ের মত এই চিত্র-বিদ্যা ও ভাস্কর্যেও স্বাভাবিকতার বা অস্বাভাবিকতার প্রশ্ন ওঠে। এখানেও কিন্তু সেই একই উত্তর। ভাব যেখানে যেমনধারা তার প্রকাশ ভঙ্গিও তদনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। এখানে স্বাভাবিকতা বা অস্বাভাবিকতার প্রশ্ন ওঠাই অন্যায়। স্বাভাবিক দেহবিজ্ঞানমতে শরীরের যে অংশ যেমন হওযা উচিত শিল্পী তার মানস -প্রতিমার ভাব পরিস্ফুটনের সময় সে ঔচিত্য মেনে' চলতে বাধ্য নয়। তার কাছে ভাবকে রূপ দেওয়াই বড় কথা। সে দেহ-বিজ্ঞানের শিক্ষক নয়। ভাবকে রূপলোকে নাবিয়ে 'আনাই তার-সাধনা।

শিল্পী-সাহিত্যিকেরা সমাজের পথ-প্রদর্শক, আর তাই তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা ও অস্তিত্ব রক্ষার কার্যে তাদের সাহায্যে করা সমাজের পবিত্র কর্ত্তব্য। আর এই কর্ত্তব্যৰোধ সব চাইতে বেশী কৰে' থাকা দরকার সেইখানে যেখানে শিল্প বা সাহিত্যসাধনা শিল্পীর নিছক নেশা বা পেশার পর্যায়ে পড়ে' থাকেনি- সেখানে তা' সেবা-ধর্মের অঙ্গরূপে গৃহীত হয়েছে। শিল্প ও সাহিত্য যেখানে জনসেবাতেই উৎসর্গীকৃত সেখানে জনসাধারণ তাঁদের এ দায়িত্ব কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারেন না। রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে জনসাধারণের

বা জনসাধারণের ইচ্ছায় পরিচালিত সেখানে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের এ পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। সরকারকে যেখানে অর্থকৃচ্ছ্রতা-নিৰন্ধন নানা প্রকারের অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে সেখানে অথবা রাষ্ট্র যেখানে আদর্শগত কারণে বা অন্য যে কোনও কারণে শিল্পকলাকে উৎসাহ দিতে অনিচ্ছুক সেখানে বেসরকারী জনসাধাণকেই সোজাসুজি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। শিল্পের বিভিন্ন শাখা নিয়ে 'যাঁরা সাধনা করে' চলেছেন, তাঁদের আর্থিক অবস্থার কথা ভাবতে গেলে দেখি যে এঁদের মধ্যে যাঁরা সঙ্গীত সাধনা করনে আজকাল তাঁদের অবস্থাই স্বচ্ছল। সিনেমা, রেডিও বা গ্রামোফোনে তো আছেই, তাছাড়া জলসা বা বিচিত্রানুষ্ঠানে নিজেদের কলানৈপুণ্য দেখিয়েও এঁরা অর্থোপার্জনের, মোটের ওপর ভাল রকমের সুযোগই পেয়ে থাকেন।

নর্তক বা যন্ত্র-সঙ্গীতসাধকদের মধ্যে যাঁরা উঁচুদরের গুণী তাঁদের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু সাধারণদের অবস্থা সাধারণ গায়কদের চাইতে কিছুটা খারাপই, অন্ততঃ ভাল তো নয়ই। অথচ কলা হিসেৰে এগুলি গীতিবিদ্যার চাইতে অধিকতর সূক্ষ্ম।

আবৃত্তিকারদের অর্থ উপার্জনের কোন সুযোগ নেই বললেই চলে। তাই প্রতিভাশালী আবৃত্তিকাররা সমাজে যথোচিত উৎসাহ না পাওয়ার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের সাধনা মধ্যপথেই থামিয়ে' দেয়।

অনেকে হয়ত ভাববেন শিল্পীদের মধ্যে এখন অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরই জয়-জয়কার। এ কথা মুষ্টিমেয় ব্যষ্টির ক্ষেত্রে সত্য হ'লেও সামগ্রিকভাবে সত্য নয়। সিনেমা বা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে যাঁরা খুব বেশী সুনাম অর্জন করেছেন অর্থোপার্জন তাঁরা ভালই করেন-খুবই ভাল করেন, কিন্তু অভিনয়ের লাইনে অর্থোপার্জনের সুযোগ সাধারণতঃ প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতাদের সামনে খুবই সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী-গণকে কেউই সুযোগ দিতে চান না। আর দিলেও যে পরিমাণ পারিশ্রমিক দিতে চান তা' লোভনীয় তো নয়ই, গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্তও নয়। আসল কথা এই যে, অধিকাংশ পরিচালকই নতুন লোককে নাৰিয়ে' ঝুঁকি নিতে চান না। পরিবেশক ও প্রদর্শকেরাও পুরাণ শিল্পীর নাম ভাঙ্গিয়েই ছবির কাটতি বাড়ানো বেশী সুবিধাজনক বলে' মনে করেন। প্রযোজকদের মধ্যে যাঁদের চিত্র ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে তাঁদেরও অনেকেরই এর শিল্পগত মান সম্বন্ধে

ভাল ধারণা নেই। তাই তাঁরাও নতুন শিল্পীকে সাহায্যে করতে এগিয়ে' আসতে পারেন না। সেজন্যে মোটামুটি বিচারে পৃথিবীর সব দেশেই অভিনয়কুশলী নবাগতদের একমাত্র ভরসা হচ্ছে পেশাদারী ও অপেশাদারী রঙ্গমঞ্চ। অপেশাদারী রঙ্গমঞ্চ তাদের আর্থিক অভাব দূর করতে পারে না, আর পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে' না ওঠায় যে দেশে রাষ্ট্রের বিশেষ সাহায্যে পায় নি সে দেশে মুমূর্ষু অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সুতরাং নতুন অভিনেতাদের ব্যাপকভাবে সুযোগ দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাই অভিনয়শিল্পীকে যদি সুষ্ঠুভাবে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে হয় বা অভিনয়শিল্পীকে যাদি বাঁচিয়ে'রাখতে হয় তা' হলে সকল দেশের পক্ষেই বলিষ্ঠ নীতি নিয়ে, কাজে নাৰা দরকার। আর এই বলিষ্ঠ নীতির প্রথম পদক্ষেপই হবে দেশের প্রতিটি বড় বড় গ্রাম ও শহরে সরকারী ও আধা-সরকারী সহায়তায় রঙ্গমঞ্চ গড়ে তোলা ও থিয়েটারের ওপর কোন প্রমোদ-কর ধার্য না করা। অবশ্য জনসাধারণ তাঁদের কাছে একটা বিষয়ে একটু উদারতাই আশা করে। সেটা হচ্ছে নাটকের বিয়ষবস্তু নির্বাচনে শিল্প রসজ্ঞ বেসরকারী ব্যষ্টিদের স্বাধীনতা পূর্ণভাবে মেনে নেওয়া। অবশ্য নাটকের মাধ্যমে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেই প্রচার করা চলবে না এমন

ধারা কোন শর্ত আরোপ করা হ'লে তা দোষের ত' নয়ই, বরং ভালই।

নাট্যশালার সংখ্যা বাড়াতে গেলে ও নাটকাভিনয় জনপ্রিয় করতে গেলে নাটকের প্রয়োজনও দেখা দেৰে। এতে প্রতিভাশালী লেখকরা নাটক লিখতে উৎসাহিতও হবে। নাটকের বিক্রী হয় না বলেই শক্তিশালী লেখকেরা নাটক লিখতে চান না। তাছাড়া নাট্যশালার সংখ্যা বেড়ে' গেলে তখন দু'চারটে বড় বড় রঙ্গমঞ্চের মালিকের কৃপা-কটাক্ষের পানে চেয়ে' বসে' থাকতেও হবে না। যে কোন একটি রঙ্গালয়ের মাধ্যমে নাটকটির সার্থকতা প্রমাণ করে' দিতে পারলেই বই বিক্রীর জন্যে তাঁদের ভাবতে হবে না। নাট্যকারগণকে উৎসাহ দেবার জন্যে আমার মতে এর সঙ্গে আরও একটা ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে; সেটা হচ্ছে পেশাদারী বা অপেশাদারী রঙ্গমঞ্চ যত দিন ধরে যে নাটকের অভিনয় করবে ততদিনের প্রাত্যহিক দক্ষিণা-স্বরূপ নাট্যকারকে কিছু অর্থ সাহায্যে করা উচিত। এর ফলে যখনই নিজের কোনও বইয়ের অভিনয় হৰে তখনই নাট্যকার কিছু কিছু অর্থোপার্জনের সুযোগ পাৰেন ও গ্রাসাচ্ছাদানের চিন্তা থেকে

নিজেকে কতকটা মুক্ত রেখে' মানুষ–সমাজের জন্যে নতুন নতুন নাটক লেখায় মনোনিবেশ করতে পারবেন।

কাব্য বা কবিতার যুগ আর নেই–অন্ততঃ ব্যবসায়ের দিক দিয়ে' নেই। কবিতার বইয়ের বিক্রী নাটকের চাইতেও কম। 'অধিক কবিতা পড়ুন' অন্দোলন চালিয়ে'কতখানি ফল পাওয়া যাবে বলা শক্ত। তবে আমার মনে হয়, বিভিন্ন সামাজিক উৎসবে উপহার হিসেৰে কবিতা–গ্রন্থ দেবার রীতি প্রবর্তিত হ'লে ভাল ফলই পাওয়া যাবে। উষ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিভিন্ন কবিতা–পুস্তককে সামগ্রিকভাবে নির্বাচনে করলেও কবিরা যথেষ্ঠ উৎসাহ পাবেন। একই পুস্তকে বিভিন্ন কবির রচনা সংগ্রথিত হ'লে কোন কবিরই আর্থিক দিক দিয়ে' কোনও সুবিধা হয় না।

কলা–জগতে যেটি সব চাইতে সূক্ষ্ম সেই ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনবিদ্যা জনসাধারণের উৎসাহ ও সহানুভূতি থেকে সব চাইতে বেশী ৰঞ্চিত হয়ে' রয়েছে। বলা যেতে পারে যে, যে সকল দেশেমূর্তি–পূজার প্রচলন রয়েছে সে সকল দেশের ভাস্করেরা জনসাধারণের সাহায্যেই তো শিল্পটা বাঁচিয়ে' রাখতে পেরেছে। নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যার ও তাদের সমাধান হচ্ছে কোনও সরকারী সাহায্যের অপেক্ষা না রেখে'। এটাই কি

জনসমর্থনের চরম নিদর্শন নয়? আমি কিন্তু মূর্তিপূজক দেশের জনসাধারণকে ভাস্কর্য-বিদ্যার সমন্দার তথা উৎসাহ-দাতা বলে' এক কথায় মেনে' নিতে পারলুম না। মূর্তিপূজক-দেশের জনসাধারণ মূর্তি-শিল্পের কাছে এসে' পয়সা খরচ করে' জিনিস নিয়ে' যায় ৰটে, কিন্তু সেটা সে করে' যাকে 'রেলিজন'-এর প্রেরণায়, শিল্প-প্রিয়তায় নয়। শিল্প-প্রিয়তাই যদি এখানের সত্যিকারের মনোভাব হ'ত তাহ'লে তারা পূজান্তে সেই শিল্প-নির্দেশনগুলিকে জলে ভাসিয়ে' দিত না। অবশ্য সে সকল ক্ষেত্রে লোক স্থায়ী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্যে ধাতু, কাঠ বা প্রস্তর মূর্তি ক্রয় করে সেখানে এ প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু সেক্ষেত্রেও ক্রেতার মনোভাব শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া নয়, কারণ কেনবার সময় মূর্ত্তির সৌন্দর্য বা ভাব-মাধুর্যের দিকে ক্রেতা কিছুটা নজর দিলেও ভাস্করকে তার শিল্প-রচনার অবাধ স্বাধীনতা দেয় না,-শিল্পীকে সৰ সময় ধ্যানমন্ত্রের চতুঃসীমার মধ্যে আটকে, থেকে কাজ করতে হয়। ভাবগত মৌলিকতা দেখাবার সুযোগ তার নেই বললেই চলে। তাই মূর্তিপূজক দেশে জনসাধারণ মূর্তি ক্রয় করে' শিল্পকে উৎসাহ দেয়-এ কথা ঠিক নয়। তারা এক শ্রেণীর শিল্পীকে বেঁচে' থাকতে সাহায্যে করে। মূর্ত্তি-শিল্পকে উৎসাহ দিতে হ'লে শিল্পী হিসেবে ভাস্করকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। অন্যথায় তার

সৃষ্টি অর্ডারি রচনার মত নেহাৎ মামুলী ধরণের জিনিস হয়ে' যাবে, যা হয়ে থাকে। অর্থাৎ মানুষ, প্রকৃতি জীবজন্তু, স্বাভাবিক–অস্বাভাবিক সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে' শিল্পী স্বাধীনভাবেই তার মূর্তি গড়ে' চলবে। স্বাধীনভাবেই সে নতুন নতুন ভাবের রূপায়ণ করতে গিয়ে' নিত্য–নতুন দেবতা তৈরী করে' চলবে। তার শিল্প–নিদর্শনকে কেন্দ্র করেই সেই দেবতা বিশেষের ধ্যানমন্ত্র গড়ে' উঠবে, তবেই হবে সার্থক শিল্পায়ন। শিল্পীর রচনা মন্দিরের অভ্যন্তরেই কেবল থাকৰে না, সমাজ–জীবনের সর্বত্রই সে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে' থাকৰে। প্রতিকৃতি বা দেবতা বা অন্য কিছুই হোক না কেন, তারা স্থান লাভ করবে জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনীয় ভূমিতে, মানুষের ঘরে, বৈঠকখানায়, ক্লাৰে, বিদ্যালয়ে, পার্কে, সর্বত্র। মধ্যে বড় বড় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেও এই ভাস্কর্য–শিল্পকে জনপ্রিয় করে' তুলতে হবে।

মূর্তি–পূজার দওলতে মূর্তি–শিল্পটি উৎসাহ পাক বা না পাক একদল মানুষ তবু গ্রাসাচ্ছদনের সুযোগ পেয়ে' যাচ্ছে কিন্তু চিত্রাঙ্কন–বিদ্যা নিয়ে' যারা সাধনা করে' এসেছে তাদের সামনে এ ধরণের কোন সুবিধাই আজ আর নেই। অথচ এককালে এই বিদ্যাকে কেন্দ্র করে' পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে

ছোট ছোট গোষ্ঠী গড়ে' উঠেছিল। যেমন ধরুন, বাংলাদেশে। এখানে এক শ্রেণীর মানুষ জাতিগত বৃত্তি হিসেৰেই চিত্রাঙ্কনকে গ্রহণ করেছিল। সমাজে এ জাতিটি চিত্রকর বা পটুয়া নামে পরিচিত ছিল। দেব-দেবীর মূর্তি অঙ্কনের সময় এদের অবশ্যই ধ্যান-মন্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হ'ত ও সেক্ষেত্রে ভাব ফুটিয়ে' তোলবার সুযোগ খুব কমই থেকে' যেত। তবু দেবমূর্তি ছাড়া আরও অনেক কিছুই এরা আঁকত ও আঁকবার সময় শিল্পীর সমস্ত সুযোগ সুবিধা ও স্বাধীনতা নিয়েই কাজে হাত লাগাত। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ অনান্য বৃত্তিজীবীকে যেভাবে আর্থিক দিক দিয়ে পোষণ করত এই পটুয়াদেরও ঠিক সেই ভাবেই করত। হাটে-বাজারে অন্য পণ্য ক্রয় করবার সঙ্গে সঙ্গে তারা গ্রামীণ পটুয়াদের আঁকা এক-আধটা পটও কিনে নিয়ে আসত। আজ আর সেদিন নেই। বিভিন্ন মানসিক ও অর্থনৈতিক কারণে পটুয়াদের পট আজ তাদের পূর্ব মর্যাদা হারিয়েছে। ব্লক ছাপার উন্নত পদ্ধতি আবিস্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সস্তায় চাকচিক্যময় বিভিন্ন ধরণের ছবি সংগ্রহ করা লোকের পক্ষে খুব সহজ হয়ে' দাঁড়িয়েছে। আর এতে করে' দু'পাঁচজন নামজাদা চিত্রশিল্পী অর্থোপার্জনের সুযোগ পেয়েছে ও তারা কিছুসংখ্যক ব্যবসায়ীকে অর্থোপার্জনের সুযোগ দিয়েছে বটে, কিন্তু সমাজ থেকে পটুয়া-

সম্প্রদায়টিকে উচ্ছন্ন করে' দিয়েছে। ঠিক সমন্দার মনোভাবের অভাবও এই শিল্পটির ধ্বংসের আরেকটি কারণ–মুখ্য না হোক, গৌণ কারণ। গ্রামীণ পটুয়ার আঁকা যে ছবিকে অতি সাধারণ বা অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলে' ভারতবাসী সমাদর করে নি, দূর দেশের কোন নামজাদা শিল্পীর হাত থেকে ঠিক সেই জাতীয় জিনিস বা তার চাইতে অনুন্নত ধরণের জিনিস বেরিয়ে এলে আমরা চড়া দামে তা কিনে' থাকি। শিল্পী যামিনী রায়ের ছবিগুলিকে পূর্বে লোকে কালীঘাটের পট বলে' অবজ্ঞা করত, কিন্তু পরে যখন জনৈক দূর দেশের নামজাদা

ভদ্রলোক শিল্প হিসেৱে এই কালীঘাটের পটের অকুণ্ঠভাবে তারিফ করতে লাগলেন, · তখন জনসাধারণও তাঁর পানে তাকিয়ে দেখল। যামিনী রায় আজ যে স্বীকৃত পেয়েছেন সেটা তাঁর বহু পূর্বেই পাওয়া উচিত ছিল। বস্তুতঃ চিত্রশিল্পে গুণাগুণ তার বৈশিষ্ট্য বা ভাব–মাধুর্য সম্বন্ধে জনসাধারণেৰ এক বিরাট অংশ সম্পূর্ণভাবে চোখ বন্ধ করে' রয়েছেন। আর তাই এই শিল্প বা শিল্পীগণকে বাঁচিয়ে রাখা রাষ্ট্র বা সাংস্কৃতিক–সংস্থাগুলিরই কর্তব্য। তাদের কর্তব্য শুধু এখানেই শেষ নয়, জনসাধারণের শিল্প–মনোভাব জাগিয়ে' তোলা অর্থাৎ কি না শিল্প সম্বন্ধে তাদের সমন্দার করে' তোলাও এই

প্রতিষ্ঠানগুলিরই করণীয়। শিল্পী হিসেবে নন্দলাল বসু বা অবন ঠাকুরের আসন আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। তবু আমার ধারণা রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃত না থাকলে জনসাধারণ তাঁদের চিনতে আরও বেশী দিন সময় নিত।

শিল্পীদের আঁকা মূল ছবিগুলো কেনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণেৰ সামর্থ্যের বাইরে। তাই শিল্পপ্রিয়তা থাকা সত্বেও এঁরা সাধারণতঃ দুখের সাধ ঘোলে মিটিয়ে' থাকেন। অর্থাৎ কি না মূল চিত্রের প্রতিলিপি কিনে' ঘর সাজিয়ে' থাকেন। এতে শিল্পীদের সব সময়েই যে আর্থিক দিক দিয়ে' লাভ হয় তা নয় বরং শিল্পী হিসেবে (আর্থিক বিবেচনায় বলছি নে) অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্তও হ'তে হয়। এর প্রতিবিধানকল্পে বড় বড় ক্লাব বা লাইব্রেরীর সঙ্গে যদি চিত্রাগার রাখা হয় তাতে হয়তো কিছুটা ভাল ফল হ'তে পারে। লাইব্রেরীতে যে ধরণের বই 'ইসু' করা হয় ঠিক সেইভাবে নিদিষ্ট সময়ের জন্যে সদস্যগণকে মূল চিত্রও 'ইসু' করা যেতে পারে। আমার ধারণা এতে করে' শিল্পীরা, বিশেষ করে' নতুন শিল্পীরা খুবই উৎসাহ পাৰে। যে চিত্রগুলি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে' উঠবে সেগুলিকে ব্লক করবার ঝুঁকিও তারা নিতে পারবে।

শিল্পীদের মধ্যে যারা দলে বেশী ভারী, আর আজকের দিনে যারা সব চাইতে বেশী মুখর সেই সাহিত্যিকদের তাদের পানে তাকালে দেখি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্যসাধনা তাদের অন্নসমস্যার সমাধান করতে পারে নি। তাদের লাভের গুড় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকাশক-পিঁপড়ের দলই আত্মসাৎ করে। চারিদিকেই শুণি বইয়ের বাজার মন্দা। নতুন লেখকদের 'রয়্যালটির' যা হার তা জন-সমাজে বলবার মত নয়। যাঁরা সমাজের পথিকৃৎ, যাঁরা অতীতকে বর্তমানের আর বর্তমানকে ভবিষ্যতের সামনে তুলে' ধরেন, যাঁরা বর্তমান মানুষকে ভবিষ্যৎ চিত্রের আভাস দেন, তাঁরা যদি অনাহারে বা অর্ধাহারে থাকেন সেটা সমাজের পক্ষে আর যাই হোক পৌরুষের কথা নয়। তবে আমার মতে এ সমস্যার সমাধান সাহিত্যিকগণকেই করতে হবে। প্রতিভাশালী ব্যষ্টি নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকুক, এ অবস্থা ভাবতেও ভাল লাগে না। সাহিত্যিকদের উচিত পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায়টি নিজেদের হাতেই গ্রহণ করা ও তা সামবায়িক ভিত্তিতে পরিচালনা করা। দুঃস্থ সাহিত্যিকদের পক্ষে এককভাবে এই ধরণের ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়, তা বাঞ্ছনীয়ও নয়, কারণ সেক্ষেত্রে তার পক্ষেও পুঁজিবাদী মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হবার সম্ভবনা থেকে' যায়। কারণে-অকারণে গবর্ণমেন্টকে দোষ

দেওয়াও আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি না। পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায়টি গবর্ণমেন্টের হাতে – চলে' গেলে সাহিত্যিকদের পক্ষে লাভের চাইতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। ব্যবসায়টি সম্পূর্ণ বেসরকারী সংস্থার হাতে রাখতেই হবে। অন্যথায় সাহিত্য আর সাহিত্য থাকবে না, তা দলীয় ছাঁচে ঢালা বুলেটিনে পরিণতি হবে– যেমন পৃথিবীর কোন কোন দেশে বর্তমানে হয়েছে ও হচ্ছে।

শিল্পীর বা শিল্পের সমালোচনা করবার অধিকার সকলের আছে। যে সকল শিল্পী সমালোচনা পচ্ছন্দ করেন না, বুঝতে হবে তাঁদের ভবিষ্যৎ বলে'কোন জিনিস নেই। কিন্তু সমালোকদের সম্বন্ধে বলবার দু' একটা কথা থেকে' যাচ্ছে। প্রথম ও প্রধান কথা হচ্ছে এই যে, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে সমালোচনার দ্বারা শিল্পীকে সাহায্যে করা। তাঁকে ভগ্নোদ্যম করে' দেওয়া বা হেয় প্রতিপন্ন করা নিশ্চয়ই সমালোচনার উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে সমালোচনা করতে গেলে শিল্প বা সাহিত্যকে ঠিকভাবে বোঝবার জন্যেও একটা সাধনা থাকা দরকার। না পড়ে না লিখে সমালোচনার পুস্তক পড়ে' তার ওপর নিজস্ব মতবাদ চালাতে যাওয়া আমার মতে অনধিকার–চর্চা। তবু সাহিত্য সমালোচনার একটা মস্ত বড়

সুবিধা এই যে সাহিত্য সম্বন্ধে যার যথোচিত জ্ঞান নেই সেও ওপর-ওপর ভাসা-ভাসা জ্ঞান নিয়েও অনেক বড় বড় কথা বলে' যেতে পারে ও বলে' নিয়ে' পারও পেয়ে' যায়। বিজ্ঞান, দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গেলে এ ধরণের ওপর-চালাকিতে কোন কাজ হয় না, কারণ তাতে সহজেই নিজের বিদ্যা ফাঁস হয়ে' যায়। তাই এই সমালোচকদের চাপে পড়ে' অনেক সময় ধৈর্যশীল, বিচারশীল তথা স্ব-ত্রুটি সংশোধনেচ্ছু শিল্পীও বিশেষ বিব্রত বোধ করেন। এ প্রসঙ্গে আরও একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়, আর সেটা হচ্ছে এই যে ডজনের পর ডজন বই লিখেও যাঁরা সার্থকনামা হ'তে পারেন নি অন্যের সমালোচনায় তাঁরাই সব চাইতে বেশী মুখর হয়ে থাকেন অর্থাৎ কিনা সমালোচনার মাধ্যমে তাঁরা নিজেদেরই দীর্ঘকালের ব্যর্থতাই প্রকাশ করে' থাকেন। এ শ্রেণীর তথাকথিক সমালোকদের কাছ থেকে কোন সাহায্য বা কোন দেশনা পাবার আশা বৃথা। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই মনে রাখা দরকার যে যেখানে নিজের অধিকার ফলাতে যাচ্ছি, সেখানে দায়টাও আমাকে নিতে হবে। রাস্তায় চলবার অধিকার আমাদের আছে আর তাই মিউনিসিপ্যালিটি গড়ে' রাস্তা সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়ও আমাদেরই। শিল্পকে ও শিল্পীকে যারা ভালবাসে তারা দরদ ভরা মন নিয়েই

সমালোচনা করবে। সে সমালোচনায় কটুৰাক্য থাকতে পারে, নিন্দাবাদ থাকতে পারে বা বড় রকমের দোষ ত্রুটিও থাকতে পারে, তবু তাদের বক্তব্যের পেছনে যে দরদী মনটুকু থাকে যে কোন সাহিত্যিক বা শিল্পী যেন তা' অতি সহজে বুঝে' নিতে পারেন ও তাঁরা সেই সমালোচককে খুৰ সহজ ভাবেই নিজের আপনজন হিসেৰে গ্রহণ করে' নিতে পারেন। আজকের দিনে আমাদের এই শ্রেণীর সমালোচকেরই দরকার। সাহিত্য-সরস্বতী আজ মাথা থেকে পা পর্যন্ত লক্ষ্মীর হ্যাণ্ডনোটে বাঁধা পড়ে' গেছেন-আজ তাঁর মূল্যামূল্য নির্ভর করছে লক্ষ্মীর কৃপা-কটাক্ষের ওপর। লেখা যেমনই হোক না কেন, প্রকাশক যদি বেশ বনেদী ধরণের হয় ৰিচিত্রধরণের বিজ্ঞাপন-কৌশলের সাহায্যে বই ৰাজারে কাটবেই। দুঃস্থ সাহিত্যিক তাই লজ্জা-ঘৃণার মাথা খুইয়ে' নাম-করা প্রকাশকদের দ্বারস্থ হয়ে' থাকেন। প্রকাশকেরাও ঝোপ বুঝে' কোপ মারেন। ব্যবসায়ীর প্রচার-কৌশলের ফলে আজ সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন্ বইটা ভাল আর কোনটা মন্দ বোঝা অসম্ভব হয়ে' দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই উন্নত ধরণের সমালোচনা-সাহিত্যের বা সমালোচনা-পত্রিকার অভাব অত্যন্ত বেশী। ৰাজারে বইয়ের কাটতি হয় প্রচার-কৌশলের জোরে অথবা বই বিশেষের বৃত্তিরুজ্জীবনীশক্তির জোরে আর কোন কোন ক্ষেত্রে তার

প্রাকৃতজনের মনোরঞ্জনের স্থূল ক্ষমতার গুণে। তাই আমরা দেখি, যে লেখক নিজে যে বইয়ের প্রকাশক সে বই যতই ভাল হোক না কেন ৰাজারে তার কাটতি নেই। অথবা লেখকের বক্তব্য বা ভাষা যেমনই হোক না কেন যৌনবৃত্তির খোরাক থাকলে সে বইয়ের বিক্রী ভালই হৰে। আর প্রাকৃত জনসাধারণের মনোরঞ্জনের স্থূল প্রচেষ্টার কথা বিশেষ করে বলৰার দরকারই দেখি না। বাংলা ভাষার যে কোনও একটি প্রথম শ্রেণীর পুস্তকের চাইতে শশধর দত্তের মোহন সিরিজের বা দীনেন রায়ের রহস্যলহরী সিরিজের বিক্রী যে এক কালে অনেক বেশী হ'ত তা পাঠকমাত্রেই জানেন। তাই বইয়ের বিক্রী দেখে' তার শ্রেষ্ঠতা যাচাই করবার জো নেই। সাধারণ পাঠক, ক্রেতা ও গ্রন্থাগার-পরিচালকদের কাছে পুস্তক-নির্বাচন তাই একটা বড় সমস্যা। আর প্রথম শ্রেণীর সমালোচনা সাহিত্য বা বা সমালোচনা-পত্রিকা যতদিন না বেরুচ্ছে ততদিন এ সমস্যা সমাধানের কোনও সম্ভাবনাই নেই।

ব্যবসায়িক বা দলীয় ঘূর্ণাবর্তে পড়ে' সাহিত্যিকদের আর একে ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে। সমালোচনা বা অসৎ সমালোচনা (যদিও আমার মতে সামালোচনা মাত্রেই সমালোচনা আর তাকে সর্বদাই রচনাত্মক হ'তে হবে)-যাই

হোক না কেন সমালোচনা–সাহিত্য লেখককে পাঠকের সঙ্গে পরিচিত করে দেয়। কিন্তু যেখানে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্যকে অস্বীকৃতি দেওয়া হয় অর্থাৎ কোন রকম সমালোচনা না করে পাঠককে লেখকের থেকে দূরে রাখা হয় সেটাই লেখকের পক্ষে সৰ চাইতে অসহনীয় অবস্থা। যত দূর মনে হয়, এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই আজকের লেখকের দল খানদানী প্রকাশকদের দুয়ারে এত বেশী ধর্ণা দিতে আরম্ভ করেছেন। সাহিত্য–জগতের পক্ষে এটা কিন্তু মোটেই সুস্থতার লক্ষণ নয়।

সাহিত্যিকদের দুঃস্থতার সুযোগ নিয়ে' সুপ্রাচীনকাল থেকেই তাদের ওপর বিভিন্ন ধরণের শোষণ, চলে' এসেছে। সেকালে রাজা–মাহারাজার দলও সভাকবি পুষেছেন, তাঁদের নিষ্কর সম্পত্তিও দান করছেন, আর তার বিনিময়ে তাঁদের মাথা আর হাত কিনে' নিয়েছেন। তাই দেখেছি, প্রাতিভশক্তি সম্পন্ন সাহিত্যিক বা শিল্পী অবস্থায় চাপে পড়ে' পৃষ্ঠপোষকের মনোরঞ্জনের জন্যে নিজের ধর্মবিরোধী কাজ করেছে। দুশ্চরিত্র পৃষ্ঠপোষকের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে অশ্লীল কাব্য রচনা করেছে, অশ্লীল মূর্ত্তি গড়েছে। পৃষ্ঠপোষকের শত্রুকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্যে তার নামে কলঙ্ক লেপন করেছে।

পৃষ্ঠপোষকের জাতি, বর্ণ, কুল, গোত্র ও পোষাককে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করবার জন্যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, দেবতার প্রত্যাদেশের কথা শুনিয়েছে। সাহিত্যিকের এই অবস্থা আজও চলেছে। দু' একজন বাদে আজকের দিনেও অধিকাংশ সাহিত্যিক সমাজের নীচের তলাকার মানুষ। স্বাধীনভাবে কাজ করবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেরই মাথার ঘিলু থেকে আঙ্গুলের গাঁট পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বাঁধা পড়ে' গেছে। লেখা পড়ে' যাদের তেজস্বী বলে' মনে হয়, তারাও অবস্থার চাপে পড়ে' বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে' চলেছে।

আগেকার তুলানায় পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র আজকাল সাহিত্যিকদের জন্যে বেশী পরিমাণ পুরস্কার বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু যত বিপদ এখানেই। গবর্ণমেন্ট মাত্রই–তা' সে রাজতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র যাই হোক না কেন, একটি বিশেষ মতবাদ নিয়ে' চলে। সুতরাং সাহিত্যিককে পুরস্কার দেবার সময় গবর্ণমেন্টগুলির পক্ষে হঠাৎ নিরপেক্ষ সাধু হয়ে' যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁরা দলীয় চশমা পরেই সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার করবেন আর সাহিত্যিক তার পেটের জ্বালা মেটাবার জন্যে আর্দশ বিসর্জন

দিতে বাধ্য হবে। এই কথাগুলো বিভিন্ন শ্রেণীর রাষ্ট্রে সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে প্রযোজ্য হলেও গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিতে মতবাদের সংঘর্ষ বেশী ও সেই কারণে মতৰাদ প্রচারের প্রয়োজনীয়তাও বেশী, আর এইজন্যে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি সাহিত্যিকগণকে নিজেদের প্রচার যন্ত্ররূপেই দেখতে চায়। বলা বাহুল্য মাত্র, এই শ্রেণীর অর্ডারী রচনা সাহিত্য পদবাচ্য হয় না। রাজনৈতিক রচনাগুলির পক্ষে সাহিত্য পদবাচ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। গর্বণমেন্ট যেখানে সৎ-সাহিত্যিককে উৎসাহ দেবার জন্যে সত্যই উদ্‌গ্রীব সেখানে তাঁদের উচিত অরাজনৈতিক শিক্ষাব্রতীদের নিয়ে বোর্ড গড়ে' পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা সেই বোর্ডের মাধ্যমেই করা। অবশ্য এ কাজটা তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমেও করে' নিতে পারেন, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মোটামুটি অরাজনৈতিক রঙ এখনও আছে। তবু এ ব্যাপারে আমি অরাজনৈতিক বোর্ড নিয়োগের ব্যাপারটাই বেশী সমর্থন করি, কারণ গর্বণমেন্টের কাছ থেকে ভাল রকমের এককালীন বা পৌনঃপুনিক দান পাবার আশায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পক্ষ থেকেও রাজনৈতিক নেতৃগণকে খোসামোদী করে' চলবার একটি প্রবৃত্তি আজকাল দেখা দিয়েছে। যোগ্যতা থাক বা না থাক মন্ত্রী-উপমন্ত্রীগণকে একটু

ঢালাওভাবে 'ডক্টরেট উপাধি দিয়ে' তাঁরাও ক্রমশঃ যেন নিজেদের নিরপেক্ষতা হারিয়ে' ফেলছেন।

এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাঁরা সাহিত্যিককে কোন বিশেষ গণ্ডীভুক্ত হ'তে দেখলেই আতঙ্কে শিউরে' ওঠেন। তাঁদের বক্তব্য–সাহিত্যিক যখন সবাইকার জন্যে, তখন সে গোষ্ঠীবিশেষের অন্তর্ভুক্ত হ'তে যাবে কেন? আমার মত কিন্তু অন্য ধরণের। সাহিত্যিকের আর্দশ হচ্ছে জীবনের সামূহিক কল্যাণ। এই কল্যাণ–প্রচেষ্টার ধরণ সবাইকার যে এক রকম হ'তেই হবে এমন কোন কথা নেই। যাদের সেবার ধরণ একই রকমের তারা যদি নিজেদের সুবিধার জন্যে গোষ্ঠীৰদ্ধ ভাবে এগিয়ে যেতে চায় তাতে তার বিরুদ্ধে কার কী বলবার থাকতে পারে! যাঁরা 'এ্যান্টি–অমুক আর এ্যান্টি–তমুক নাম দিয়ে' বিভিন্ন সাহিত্য–গোষ্ঠী গড়েছেন বা গড়েন তাঁদের পন্থাযাঁদের চোখে ভাল লাগে না, আমি তো ৰলৰ, তাঁদের মধ্যে সহিষ্ণুতার অভাব রয়েছে, নাগরিককতা–ৰোধেরও অভাব রয়েছে। তাঁরাও অনায়াসে 'প্রো'–অমুক বা 'প্রো' তমুক গোষ্ঠী গড়ে' নিতে পারেন, কেউ তাতে ৰাধা দিতে যাবে না।

মানুষ জাতির সামুহিক অগ্রগতির সব চাইতে বড় বাধা তার ব্যষ্ঠি–মানসের অজ্ঞতা। জ্ঞান হবে সবাইকার জন্যে

অৰাধ অবারিত আকাশের আলো-হাওয়ার মত। এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, এই জ্ঞান বিতরণের বা জ্ঞান গ্রহণের সব চাইতে বড় মাধ্যম সগ্রন্থ। বস্তুর মূল্য নির্ধারিত হয় প্রয়োগ ভূমিতে একথা অবশ্যই সত্য। আর সেই কারণে জ্ঞানেরও মূল্য নিরীক্ষার সব চাইতে বড় উপায় হচ্ছে তার ব্যবহার-ভৌমিক সার্থকতা। ৰন্ধ্যা জ্ঞানকে জ্ঞান বলে' স্বীকার করতে পারি না-হয় তা' স্বগত প্রলাপ অথবা অলস বিলাস মাত্র। স্বীকৃত মূল্য-জ্ঞানও কেউ যদি অর্জন করে' তা নিজের মনের কোণেই বস্তাৰন্দী করে' রেখে' দেয় তবে সেও তার মূল্য খুইয়ে' বসে। অবশ্য নিজের অনুভূতি বা অধীত বিদ্যা প্রকাশের ভাষা যায় নেই তার বিরুদ্ধে আমি কোন অনুযোগ করছি নে। তবু আমি ৰলৰ যে যিনি যা জানেন তাঁর উচিত জগৎ-কল্যাণে সেইটেই নিজের সহজসাধ্য উপায়ে সুষ্ঠুভাবে জনসাধারণের মর্মে পৌঁছে' দেবার ব্যবস্থা করা। যিনি তা না করেন আমার তো মনে হয় তিনি তাঁর সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে ঠিকমত সচেতন নন। অবশ্য এ ব্যাপারে কারও যদি অন্য কোন ধরণের অসুবিধা থাকে সে কথা স্বতন্ত্র। যিনি নিজের অনুভূতিকে জনসাধারণের সামনে ঠিকভাবে উপস্থিত করে' এই সামাজিক কর্ত্তব্য-ৰোধের পরিচয় দেন তিনিই সার্থকনাম সাহিত্যিক। মানুষ-সমাজের আভ্যন্তরীণ

দুর্বলতার কারণই হ'ল তার অজ্ঞতা, আর এই এই অজ্ঞতা যে সম্বোধিতে দূর হয় তা' ভূমামানসের ভাবনা ছাড়া আর কিছু নয়। এই ভূমামানসিকতায় প্রতিষ্ঠিত হ'বার সুযোগ প্রাকৃত জন যে সকল সূত্র থেকে পেয়ে' থাকে শিল্প–সাহিত্য তাদের অন্যতম। একের মনকে অন্যে যদি না জানল, বহুর মন একের কাছে এসে যদি ধরা না দিল তবে অনেক বহুত্বের সমন্বয়ে একত্বের প্রতিষ্ঠা কী করে সম্ভব! তাই যুগ–যুগান্তর ধরে শিল্পী–সাহিত্যিকের চলেছে বহুর মাঝে একেকে দেখার সাধনা, বহুকে একের পথে নিয়ে যাবার প্রয়াস। এ প্রয়াসে কোন চাপ নেই, কোন Imposition নেই, কোন আইনের বিধান বা শাসনের রক্তচক্ষু নেই, আছে কেবল একটা মধুর সহযোগ–সূত্র। অনেক দেশে, অনেক রাষ্ট্রে, অনেক ধর্মে, অনেক সম্প্রদায়ে বা অনেক ভাষায় বিভক্ত থাকলেও মানুষ জাত একটা অখণ্ড সত্তা। প্রতিটি মানুষের মন সেই অখণ্ড মানসেরই বৈচিত্রপূর্ণ পাত্রিক অভিব্যক্তি মাত্র। আজকের দিনে আমরা সেই শিল্প, সেই সাহিত্যিকের আসা–পথ চেয়ে' বসে' আছি যে এই সত্যটিকে আরও মধুরতর ভাষায় আরও নিবিড়ভাবে মানুষের মর্মে পৌঁছিয়ে' দেবে। মানুষ জাত এগিয়ে' চলেছে দুর্বার গতিতে। বিভিন্ন ধরনের ভেদ–বুদ্ধিকে কেন্দ্র করে' যারা রচনা তৈরী করে' গেছে, মানুষ আজ

তাদের ভুলে' যেতে চায়। আর সে তার সর্বদৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে' রাখতে চায় তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে–সে ভবিষ্যৎ অণু-চিন্তা বা গোষ্ঠী-চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে' সমস্ত দেশ-রাষ্ট্রের সীমা ডিঙ্গিয়ে' অনেক মানুষের ভাগ্যকে একটি ভাগ্যে পরিণত করবে। মানুষ আর দৈবে ভরসা রাখতে চায় না, ব্যষ্টিগত পুরুষকারও আজ তার পৌরুষ হারাতে চলছে। আজকের মানুষ বুঝতে শিখেছে জয়ধ্বনি যদি কারও প্রাপ্যই হয় তবে তা মানুষভাবটিরই প্রাপ্য। এশিয়ার কবি চণ্ডিদাস আজ থেকে সাতশ' বছর পূর্বে বাংলার এক অখ্যাত কোণ থেকে এই সম্ভাবনার কথাই গেয়ে' গেছেন–

"শুণহে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

আজ এশিয়া-আমেরিকার মধ্যস্থিত প্রশান্তমহাসাগরও আর দুরতিক্রম্য নয়। এশিয়া আর আমেরিকা একে অন্যের মনকে ধরেছে, ছুঁচ্ছে, দরদ নিয়ে' একে অন্যকে আপন জন বলে'

ভাবতে শিখছে। ইয়ুরোপ-আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া, বুধ- বৃহস্পতি-তারকা-ণক্ষত্র-ধূমকেতু-কেউ আর কারও পর নয়, কারও দূর নয়। অখণ্ড মানসের স্পন্দন সবাই ধীরে ধীরে বুঝতে আরম্ভ করছে। মানুষের ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন নয়-এ বিশ্বাস আমি রাখি, আর এই তমসার পরপারে যে অনির্বাণ দীপশিখা অতন্দ্রভাবে জেগে'রয়েছে তার সন্ধান প্রতিটি মানুষই পাৰে...... পেতেই হবে। এ সন্ধান যারা মানুষকে দেবে তারা সকলেই মানুষ জাতির স্মরণ্য, বরেণ্য। এই স্মরণ্য ও বরেণ্য পুরুষদের সম্ভাবনা আমি সাহিত্যিক-শিল্পীদের মধ্যে দেখে' থাকি। তাই তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি। আমেরিকার কবি কার্ল স্যাণ্ডৰার্গ বলেছেন-

There is only one man in the world
And his name is all-men.
There is only one woman in the world
And her name is all-women.
There is only one child in the world
And the child's name is all-children.

ঠিক একই সুরে আরও মধুর ভাষায় এক কথাই বলে' গিয়েছেন এশিয়ার কবি সত্যেন্দ্রনাথ–

"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।
একই পৃথিবীর স্তন্যে পালিত
একই রবি–শশী মোদের সাথী।

শীতাতপ, ক্ষুধা–তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি।
কচি–কাঁচাগুলি ডাঁটো করে'
তুলি বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো
জলে ডুৰি, ৰাঁচি পাইলে ডাঙা।।
কালো আর ধলো বাহিরে
কেবল ভিতরে সবাই সমান রাঙা।।

বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ

সূচীপত্র

ভিতরের রঙ পলকে ফোটে।
ৰামুণ–শূদ্র, বৃহৎ–ক্ষুদ্র
কৃত্রিমভেদ ধূলায় লোটে।।
রাগে–অনুরাগে নিদ্রিত জাগে।
আসল মানুষ প্রকট হয়।
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ
নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।।"

আজকের মানুষ চণ্ডিদাস, স্যাণ্ডৰার্গ, সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে', কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে' একসঙ্গে এগিয়ে' চলৰে মহামানবত্বের পথে, তার অস্তিত্ব–ৰোধের চরম মূল্য নিরীক্ষার পথে।

"নিবিড় ঐক্যে যায় মিশে' যায়
সকল ভাগ্য সব হৃদয়।
মানুষে মানুষে নাইকো প্রভেদ
নিখিল মানব ব্রহ্মময়।।"

সূচীপত্র

নৃত্য–বাদ্য–গীত তিনে সঙ্গীত

একবার একটা ছেলে আমাকে অনুরোধ করেছিল–সঙ্গীত ও নৃত্য সম্বন্ধে কিছু বলুন। আমি বললুম যে বিষয়টা খুবই গূঢ়। আমি এ সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ পরে রচনা করৰ–সেটাই ভালো হবে। এখন সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বলছি।

সবাই জানে যে বিশ্ব সঙ্গীত শাস্ত্রের আদি গুরু, আদি প্রবক্তা হলেন সদাশিব। সেই সদাশিবই আয়ুর্বেদের, নৃত্যের, গীতের, বাদ্যের ও আরও অনেক কিছুরই প্রবক্তা। কেন সদাশিব গীত, বাদ্য, নৃতশাস্ত্র তৈরী করতে গেলেন? শুধু তাই নয়–তার সঙ্গে শ্বাসের আগমন–নির্গমনের (নিঃস্বাস–প্রশ্বাসের) সঙ্গেও নৃত্যের, সঙ্গীতের ও বাদ্যের কী সম্পর্ক তাও নিরুপণ করে দিয়েছিলেন। ওটাকে বলা হয় স্বরশাস্ত্র।

সূচীপত্র

গীত, বাদ্য, ও নৃত্য–এই তিনের মিলিত নাম হল সঙ্গীত। 'গৈ'ধাতু 'ক্ত' প্রত্যয় করে 'গীত' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। আমি আগেই বলেছি, আর অনেকৰাৱই বলেছি যে আমাদের হচ্ছে বৈবহারিক সন্তলনের মাধ্যমে মূল কারণের দিকে যাওয়া। ("Subjective approach through objective adjustment".) 'সন্তুলন' মানে হচ্ছে কী! সব কিছুকে এমনভাবে গুছিয়ে মানিয়ে নেওয়া যা' গ্রহণযোগ্য হতে পারে। খুব বেশী তেঁতো হল না, ঝাল হল না, টক হল না– এমনভাবে সৰ কিছু রয়েছে অথচ মানিয়ে নিয়েছে। তোমরা সন্তুলনটা জানতে পারৰে, ডাল রাঁধতে গেলে মাঝখানে ডাল সাঁতলে নিতে হয়। কোথাও বলে সম্বরা দেওয়া–কোথাও বলে সাঁতলানো। সাঁতলানো মানে সন্তুলন করা। ফোঁড়ন–টোড়ন দিয়ে এমন করা যাতে সেটা গ্রহণযোগ্য, ভোজনযোগ্য হয়।

সদাশিব যখন অধ্যাত্মবিদ্যার প্রচলন করলেন তখনই তাঁকে ভাবতে হল যে, এই যে ধর্মসাধনা যারা করবে তাদের বৈবহারিক জীবনে সন্তুলনের দরকার। বৈবহারিক জীবনে সন্তলন না থাকলে মন খিঁচড়ে থাকৰে, মন বিশ্রী হয়ে থাকৰে–সাধনায় মন বসবে না। বৈবহারিক জীবনে জিনিসগুলোর মধ্যে থেকে উনি এমন তিনটি জিনিস বেছে

নিলেন যা বৈবহারিক জগতেও চলছে ও আধ্যাত্মিক জীবনেও সাংঘাতির রকমের সাহায্যে করছে। এটা হ'ল সেই 'সঙ্গীত'। যা'র প্রথম চরণ, প্রথম অংশের নাম 'গীত'। গীত হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা স্থূল জগতের মধ্যে রয়েছে–কিন্তু তরঙ্গটা বার বার

মানস জগতের ভেতরে এসে পড়ছে। আর মানস জগৎটা হচ্ছে কী?–না, চিত্তাণুসৃষ্ট জগৎ Ectoplasmic World। তার মধ্যে ঠিক সেই ধরণের ভাবতরঙ্গ উত্থিত হচ্ছে যা' শেষ পর্যন্ত সরলরেখাকারে গিয়ে আত্মাকে ছুঁচ্ছে, আত্মাকে স্পর্শ করছে। এখন আত্মাকে স্পর্শ করতে গেলে যেমন গীতের মধ্যে ছন্দ থাকৰে, সুর থাকৰে–তার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে ভাবও থাকৰে। সুতরাং ভাৰবর্জিত হলে গীতের মাধুর্য্য সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই গীতকে ভাবযুক্ত হতে হবে। এর সঙ্গে উনি দিলেন কী–না, বাদ্য আর নৃত্য। যা আর্যভারতীয় সঙ্গীত নামে খ্যাত, যা' আর্যাবর্ত বা হিন্দুস্তানী সঙ্গীত বা দক্ষিণাত্য ও কর্ণাটক সঙ্গীতে–এই দুই শাখায় বিভক্ত। একই ধরণের রাগরাগিনীকে আশ্রয় করে বিভিন্ন প্রজাতির অভিব্যক্তি হ'ল এই দুই শাখায় মূল ধর্ম। এর মধ্যে আবার বিভিন্ন ঘরানা আছে। অর্থাৎ এক একটা মানুষ এক একটা বিশেষ ধরণে

তার লক্ষ্য পরমপুরুষকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস করে গেছে। এইগুলোকে বলে এক একটা বিশেষ 'ঘরাণা'। ৰাঙলাতে 'বিষ্টুপুরী ঘরানা' ধ্রুপদের রয়েছে। কীর্তনেও মনোহরশাহী, রাণীহটি, গরাণহাটা, মন্দারণ ইত্যাদি বিভিন্ন 'ঘরানা' রয়েছে। ঘরাণাগুলো হ'ল বিভিন্ন রাগ–রাগিনীকে আশ্রয় করে নিজের মনের বিশিষ্ট মনোভাবকে ঠেলে দেওয়া সামনের দিকে। গীতে যেমন ভাব রয়েছে, তার সঙ্গে ছন্দও রয়েছে, সুর রয়েছে– কিন্তু সে ভাবাশ্রয়ী। বাদ্য কিন্তু সে ধরণের ভাবাশ্রয়ী নয়। কিন্তু বাদ্য কি করবে! মনকে তরঙ্গায়িত করে সোজাসুজি চিত্তানুকে (Ectoplasmic) তরঙ্গায়িত করবে ও ভাবের সঙ্গে সে সমন্বয় রেখে চলবে। বাদ্যের যদি এই ভাবের সঙ্গে সমন্বয় রাখার ধর্মটা ফুরিয়ে যায়, তা' হলে রাদ্যের আর মূল্য থাকবে না।

নৃত্য জিনিসটা হ'ল কী! মানসিক ভাবকে ভাষায় সাহায্যে না নিয়ে অভিব্যক্ত করা–ছন্দ ও মুদ্রার মাধ্যমে। Occidental Dance অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য দেশীয় নৃত্য মুখ্যতঃ ছন্দের মাধ্যমেই নিজেকে অভিব্যক্ত করে। তাই সেখানে ছন্দমাধুর্যটা একটু বেশী থাকে কিন্তু প্রাচ্য নৃত্য অর্থাৎ Oriental Dance ছন্দ ও মুদ্রা, দুইয়েরেই সাহায্যে নিচ্ছে। আর তার ছন্দগত বৈশিষ্ট্য,

ছান্দসিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মুদ্রা থাকার ফলে মুদ্রা এত বেশী উন্নত হতে পেরেছে। যেমন কাউকে কিছু দিতে যাচ্ছি। এক বিশেষ মুদ্রায় সেটা দেওয়া হলো–নাম সম্প্রদান মুদ্রা। এইরকম ভাবে দিলুম তো 'তরকা' মুদ্রা। অন্যভাবে দিলে' 'প্রক্ষেপ' মুদ্রা। যেমন 'থেমে যাও' বললে আর একধরণের মুদ্রা। এই কথাটা বিভিন্ন ভাবে মুদ্রা দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে। অর্থাৎ ভাষায় সাহায্য না নিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করে চলেছি।

এখন এই মুদ্রাগুলো আসছে কি রকম ভাবে! শব্দের আদিমূল পরাশক্তি। এটা মুখে বলবার নয়– অনেক বড় জিনিস। তারপর 'পশ্যন্তী শক্তি' অর্থাৎ যা বলৰ তা' মনে দেখে নিচ্ছি। তারপর 'মধ্যমা শক্তি'। ভাবটাকে ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করার চেষ্ঠা করছি। তাকে ভাষায় রূপান্তরিত করতে হলে বাক্‌–যন্ত্রের সাহায্য নেব। তারপর 'শ্রুতিগোচরা শক্তি'। তারপর প্রথমে বলার চেষ্ঠা করছি। কী বলতে চাইছি জানছি, কিন্তু বলতে পারি, আবার নাও পারতে পারি। তোমাদের অনেক সময় এমন হয় না! যে মনে হয়–ধরো, হরিবাৰু ৰলে একজন লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল। নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। কী যেন, কী যেন, নামটা এইরকম, এইরকম করছে। এটাকে বলা হয় 'দ্যোতমানা

শক্তি'। তারপর 'শ্রুতিগোচরা শক্তি' প্রকৃতপক্ষে যা অনুভব করছ–যা' বলতে চাইছে এইবার তা–ই ব্যক্ত করলে। তা' এই যে শ্রুতিগোচরা তা' শেষে হ'ল। এখন এইটাকে ভাষায় ব্যবহার না করে মুদ্রায় ব্যবহার করা হচ্ছে। নৃত্যের লক্ষণ অর্থাৎ নৃত্যের মুদ্রাটা সোজাসুজি এক্টোপ্লাজমিকের সঙ্গে সম্পর্কিত। সেইজন্যে প্রাচ্য নৃত্যের বৈশিষ্ট্য সকলের চোখে পড়ে যায়। এই যে Objective adjustment, বৈবহারিক জগতে আমাদের নৃত্য–বাদ্য–গীত এই তিনটিকে এমনভাবে চালাবার ব্যবস্থা করে নিলেন যা' ectoplasm কে আন্দোলিত করতে পারে ও যাতে করে সেই ectoplasmic movement একটা বিন্দুতে এসে আত্মিক বিন্দুতে স্পর্শ করে। সে জন্যে সঙ্গীতকে অর্থাৎ নৃত্য–গীত–বাদ্যকে প্রাচীনকাল থেকে মহাপুরুষেরা উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। ইতিহাসেও দেখা যায়, মহর্ষি নারদ বীণাও বাজাচ্ছেন, গানও গাইছেন, আবার নাচছেনও। খুৰ আধুনিক যুগে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও এই তিনটিকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন–এই যে গানটা হবে, তার ভাবটা হবে এমন যা প্রত্যক্ষভাবে পরমপুরুষ সংক্রান্ত। আর প্রত্যক্ষভাবে পরমপুরুষ সংক্রান্ত যে গান, সেইটারই নাম দেওয়া হয়েছে 'কীর্তন'। আবার যে গান প্রত্যক্ষভাবে পরমপুরুষ সংক্রান্ত কিন্তু একটা আইডিয়াকে নিয়ে

চলছে না, অনেকগুলো আইডিয়াকে নিয়ে ঘুরেফিরে একটা আইডিয়াতে আসছে, সেই ধরণের যে ঈশ্বরবিষয়ক গান তাকে বলা হয় 'ভজন'। ভজন আর কীর্তনে এইটাই হ'ল মূলগত পার্থক্য। এই ব্যাপারে পূর্বসুরীদের যা মত আমি তার থেকে মোটেই ভিন্নমত নই। তাই আমিও এই তিনটিকেই উৎসাহ দিই।

মানুষের শরীর কোন রকমের ক্লান্তি না এনে কীর্তনের সঙ্গে সন্তুলন রাখতে পারে ললিত–মার্মিক নৃত্য। তাই কীর্তনে এই নৃত্যের বিধান দেওয়া হয়েছে। মহাপ্রভুও কীর্তনে এটার প্রচলন করেছিলেন। 'মার্মিক' মানে যা' মর্মকে অর্থাৎ অন্তরের অন্তস্থলকে স্পর্শ করে–তাই এটার নাম ললিত–মার্মিক। ললিত নাচটার প্রবক্তা ছিলেন পার্বতী। আর শিব নিজে তাণ্ডৰ নৃত্যের উদ্ভব করেন। তাণ্ডব নৃত্য উদ্ভবের পিছনে ভাবটা রয়েছে যে ধ্বংস তো সত্যই; কিন্তু আমি সংগ্রামের ভিতরে দিয়েই ধ্বংসের বিরুদ্ধে লড়ে যাৰ। এক হাতের নরকপাল, আরেক হাতে কৃপাণ। কপাল হ'ল ধ্বংসের প্রতীক, কৃপাণ হ'ল যুদ্ধের প্রতীক, অর্থাৎ আমি কালের কাছে, মৃত্যুর কাছে, ধ্বংসের কাছে আত্মসমর্পণ করছি না। আমি কৃপাণের সাহায্যে লড়াই করে যাচ্ছি। এটার প্রবক্তা হলেন শিব। আর মানুষের

নানান ছোটখাট রোগ–আধি–ব্যাধি থাকে সেইজন্যে সাধনার বড় রকম না হলেও ছোটখাট ৰাধা আসে। তাই অনেকগুলো ওই ধরণের শরীরসংক্রান্ত ৰাধা....টুক্টাক্ ব্যাধি, লিবারের অসুখ, এগুলো সাধনায় অনেক সময় অল্প–স্বল্প ৰাধা দেয়। এই 'ৰাধার' বিরুদ্ধে লড়াই করৰার জন্যে আমি ছয় সেপ্টেম্বর (১৯৭৮) কৌষিকী নৃত্যের আবিষ্কার করেছি। এটা বাইশটা রোগের ঔষধ। এগুলো হচ্ছে–জাগতিক সন্তুলনের ভিতর দিয়ে মানুষের মর্মকে অর্থাৎ Ectoplasmic Stuff –কে নাড়িয়ে দেওয়া, তাকেআন্দোলিত করা ও তাকে শেষ পর্যন্ত একটা বিন্দুতে পর্যবসিত করা, পরমপুরুকে স্পর্শ করা।

মোটামুটিভাবে ছেলেটি আমাকে যা' জিজ্ঞেস করেছিল এটা তারই উত্তর।

(আনন্দ বচনামৃতম, ৪র্থ খণ্ড)

নন্দন বিজ্ঞান ও সঙ্গীত

সূচীপত্র

নন্দন বিজ্ঞান মোটামুটি তোমরা জান Aesthetic Seience.। কোন একটা জিনিসকে অভিব্যক্ত করা হচ্ছে স্বাভাবিক ভাষায় নয়, সূক্ষ্মতর অনুভূতিকে সূক্ষ্মতম ব্যক্তিকরণের মাধ্যমে। কোন একটা জিনিস আপাততঃ দেখলুম, ভালো লাগল। সেই যে ভালোলাগা, সেই ভালো লাগার পেছনে যে ভাবটুকু রয়েছে, কেন ভালো লাগল, সেইটাকে মাধুর্যপূর্ণ সূক্ষ্ম ভাষায় যেখানে অভিব্যক্ত করা হ'ল সেটা হ'ল 'নন্দনবিজ্ঞান'। কতকগুলো ফুলকে ৰাড়ীতে এমনি মেঝেতে ছড়িয়ে রাখাও যায়। তা' না করে ফুলগুলোকে কুড়িয়ে সযত্নে সাজিয়ে রাখলে, এটা নন্দনবিজ্ঞানের মধ্যে চলে এল। ৰাড়ীতে টেবিল-চেয়ার সবকিছুই রয়েছে। এখানে কোন একটা, ওখানে কোন একটা-এরকমভাৰে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে দিয়েছ। দেখতে ভালো লাগল না। গুছিয়ে রেখে দিলে তা নন্দনবিজ্ঞানের মধ্যে এসে গেল। সব জিনিসের ভেতরের যে সুন্দর অংশটুকু যেটা সৰাইকার ভালো লাগে সেই নিসগুলোকে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখলে, শুধু রাখলে নয়, সেইগুলোকেই সুন্দর মিষ্টি ভাষায় বুঝিয়ে দিলে বা মিষ্টিভাবে বুঝিয়ে দিলে তাও নয়,-তুলি দিয়েও, কলম দিয়েও তো সেটা অভিব্যক্ত করা যায়। এই হলো নন্দনবিজ্ঞান। নন্দনবিজ্ঞানের পেছনের ভাবটা রয়েছে কী?-না, ভালো লাগছে, ভালো লাগছে এই ভাবটা।

সূচীপত্র

কিন্তু ভালো লাগার পেছেনে কী তত্ত্বটা কাজ করছে যাতে আমার ওই জিনিসটাকে ভালো লাগছে? আমার এই ফুলটাকে ভালো লাগছে, আমার এইভাবে সাজিয়ে রাখাটাকে ভালো লাগছে, আমার এইভাবে কথা ৱলাটাকে ভালো লাগছে–এইভাবে নাটকের সূত্রপাত হয়েছিল, এইভাবে আবৃত্তি মানুষ আবিস্কার করেছিল। এই আমার ভালো লাগছে আমি সেখানে কর্তা আর যাকে ভালো লাগছে সেটা হলো কর্মকারক। এই রকমের অবস্থা চলতে চলতে এমন একটা অবস্থা এসে যায় যে ওই জিনিসটার কাছে আমি ভালো লাগছি। উল্টো হয়ে গেল। হতে হতে এমন একটা অবস্থা এসে যায় যে, নিজেকে মানুষ হারিয়ে ফেলে। যতক্ষণ আমার ভালো লাগছে ততক্ষণ আমি তো ঠিক আছি। আমি আছি, তাই না ভালো লাগছে ওই জিনিষটার কাছে আমি ভালো হয়ে যাচ্ছি এই করতে করতে আমার 'আমিত্ব' ওই জিনিসটার কাছে যায় হারিয়ে। এই যে হারিয়ে যাওয়া, যার কাছে হারিয়ে যাওয়াটা হলো, এই যে হারিয়ে যাওয়ার পালা, যার কাছে হারিয়ে যাচ্ছি সে হলো 'মোহন'। পরমপুরুষ হলেন মোহন, কারণ সবাইকে মুগ্ধ করে রেখে দিয়েছেন। পরমপুরুষ যদি এই জগৎটাকে মুগ্ধ না করে রাখতেন, তাহলে কেউ আর এই পৃথিবীতে থাকতে চাইত না। কত সমস্যা ৱল দেকিনি; সমস্যার জ্বালায় অস্থির

হয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইত সব মানুষ। কিন্তু তা করছে না কারণ ওই মোহনের পাল্লায় পড়েছে, পরমপুরুষের পাল্লার পড়েছে, ছেড়ে পালাতে পারছে না পৃথিবীটা। ভালো না লাগলেও পরমপুরুষকে ভালো লাগছে। আর পরমপুরুষকে যখন ভালো লাগছে, পরমপুরুষের কাছে সে যখন ভালো তখন যাৰেই বা কোথায়! এই জিনিসটার ভিত্তিতে বলা হয়েছিল, এই মোহনটাকে ভালো লাগার মোহনের পাল্লায় পড়ার ফলে মানুষ ধর্মের আবিষ্কার করেছিল। এইভাবে মানুষের জীবনে প্রথম ধর্মের আর্বিভাব হয়েছিল। (আ.ব.ম্)

(কলিকাতা, ২৩-১২-৫৯)

সঙ্গীত ও মোহনবিজ্ঞান কি অচ্ছেদ্য?

উচ্চৈঃস্বরে পরমপুরুষের গুণগান করাকে কীর্তন বলা হয়। সংস্কৃতে 'কীৎ' ধাতুটার মানে হ'ল জোরে জোরে উচ্চারণ করা যাতে অন্যের কর্ণে প্রবেশ করে। এইভাবে পরপুরুষের গুণগান করাকে কীর্তন বলা হয়।

সূচীপত্র

এখন কথা হচ্ছে এই যে পরমপুরুষ তো কারো কীর্তনের অপেক্ষায় বসে থাকেন না। পরমপুরুষ তো কাউকে বলেন না, কীর্তন করো। তাহলে কীর্তন মানুষ করে কেন, করবে কেন? এর পেছনে যে বিজ্ঞান রয়েছে সেটা হচ্ছে এই মানুষ স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে যেতে চায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষ স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্মকে খোঁজে। আবার যে সূক্ষ্মটাকে পায় তার ভেতরে থেকে সূক্ষ্মতরকে খোঁজে। এইভাবে এগিয়ে যায়। সেই আদিমকালের মানুষ–তার কাণেও গান ভাল লাগত। তারও নাচতে ইচ্ছে যেত। কিন্তু সেকালকার সেই মানুষের গানও ছিল খুব স্থূল, নাচও ছিল খুব স্থূল, কিন্তু সেই স্থূলের ভেতর দিয়ে সূক্ষ্মকে পাবার এই যে এষণা, এই যে চেষ্ঠা, এর ভেতর দিয়ে মানুষ কী করল–নৃত্যের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ছন্দের আবিষ্কার করল। ছন্দের মধ্যেও বিভিন্ন ধরণের আঙ্গিকের সন্ধান পেল। আবার ঠিক তেমনি গানের ভেতর দিয়েও সূক্ষ্ম রসানুভূতির সন্ধান পেল। গানকেও ধারানিৰদ্ধ করে দিলে.. বিশেষ রাগ–রাগিনীর প্রবর্তন করলে। এগুলো করেছিলেন সদাশিব। তারপরে গানের সঙ্গে নৃত্যের সমাবেশ ঘটানো হ'ল যাকে বলা হয় 'তাল'। শিব বিশেষ নৃত্যের প্রবর্ত্তন করলেন–তাণ্ডব, পার্বতী বিশেষ নৃত্যের প্রবর্তন করলেন–'ললিতলাস্য'। এইভাবে স্থূল থেকে সূক্ষ্মতর লোকের

দিকে যাবার যে প্রচেষ্ঠা একে বলা হয় নন্দন–বিজ্ঞান (aestheic science)। সূক্ষ্মতর লোকে যে এল তার আর স্থূল জিনিসকে ভাল লাগল না। ভাজা–পোড়া এসব শিখেছিল মানুষ। আসলে তারা সব কিছুই পুড়িয়ে খেত সেকালে, রান্না জানত না। তারপরে রান্না শিখল নানান মশলা দিয়ে, সুস্বাদু করে রাঁধতে শিখলে ঘন্ট, শুক্তো এসব কিছু তৈরী করতে শিখল। যে ভাল জিনিসটা, সূক্ষ্মতর জিনিসটার স্বাদ পেল, টের পেল, আর সে স্থূল জিনিসটা খেতে তার আর ভাল লাগল না। তেমনি সুন্দর জিনিসটা শোণৰার সুযোগ এল, স্থূল জিনিসটা তার আর ভাল লাগল না। নির্বাক চিত্র দেখছিল। তারপর যেই সবাক চিত্রের সংস্পর্শে এল আর নির্বাক চিত্র দেখৰে না। এখন যদি কোন শহরে কোন সিনেমা হাউসে বিনা পয়সায়, বিনা দক্ষিণাতেও নির্বাক চিত্র দেখানো হয়, লোক বিশেষ জুটবে না। ৰলৰে যে না থাক, আমার অন্য কাজ রয়েছে; কিন্তু সবাক চিত্রের জায়গায় দেখৰে, ব্ল্যাক মার্কেটেও টিকিট কিনছে। সূক্ষ্মতর লোকের সন্ধান পেলে আর স্থূলটি ভাল লাগে না। এই যে সূক্ষ্মতর লোক থেকে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দিকে মানুষের অব্যাহত গতি, এই গতিশীলতাই হ'ল নন্দন বিজ্ঞানের রূপরেখা। এইভাবে চলতে চলতে এমন একটা স্তরে মানুষ আসে যখন টেষ্ট (Taste),

সুন্দর অনুভূতি, সুন্দর অভিজ্ঞতার ভেতরে দিয়ে যেতে যেতে চির সুন্দরের অধিকতর নিকটে এসে পৌঁছোয় তখন আর সে সুন্দরতার আস্বাদ নেবার অবস্থা তার থাকে না অর্থাৎ গানটা তো ভারী সুন্দর লাগছে, নাচটা তো ভারী সুন্দর লাগছে–এই স্তরটা আর থাকে না, কারণ সুন্দর যার লাগে সে তো মানুষ। তখন এমন একটা স্তর আসে যে নাচটা তাকে পাগল করে দেয়। সে নিজেকে খুইয়ে বসে, নিজেকে হারিয়ে বসে, নন্দন বিজ্ঞানের এই যে ঊর্ধ্বতর অবস্থা এইটাকেই বলা হয় মোহন বিজ্ঞান। অথাৎ এতে নিজেই মোহিত হয়ে যাচ্ছে, তার আর আস্বাদ গ্রহণের অবস্থা থাকছে না, সে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। মানুষ কত রকমের নাচ–গান আবিষ্কার করেছে, ভবিষ্যতেও কত কী করবে এসবই নন্দন– বিজ্ঞানের মধ্যে নিজে আনন্দ পাবার জন্যে। কিন্তু কীর্তন জিনিসটার আবিষ্কার হয়েছিল পরমপুরুষকে আনন্দ দেবার জন্যে। আর এই আনন্দ দিতে দিতে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই কীর্তন আসছে মোহনবিজ্ঞানের মধ্যে।

মোহন–বিজ্ঞান কী? মানুষের জীবভাবকে পরমপুরুষের শাশ্বত ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেওয়া। তাই সমস্ত সঙ্গীতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো কীর্তন, আর সঙ্গীত

মানেই হলো–নাচ–গান–বাজনা এই তিন নিয়ে। তাই কীর্তন তো কেবল গান নয় তাতে বাজনাও আছে। তাই নাচ–গান বাজনা মিলিয়ে এমনই একটা অনবদ্য স্বর্গীয় পরিবেশ তৈরী করে দেয় যা মানুষকে কী করে?–না, নিজেকে ভুলিয়ে দেয়। এইখানে কীর্তনের মাধুর্য, এইখানেই কীর্তনের শ্রেষ্ঠতা। পৃথিবীতে যাঁরাই জ্ঞানী–গুণী, যাঁরাই সত্যিকারের বুদ্ধিমান মানুষ তাঁরা অবশ্যই লোকের সামনে অথবা লজ্জা থাকে তো লুকিয়ে লুকিয়ে কীর্তন করবেন।

(আনন্দবচনামৃতম, ৮ম খণ্ড)

শিল্প ও বিজ্ঞান

শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের মধ্যে মৌল পার্থক্যটি হ'ল এই যে প্রথমটি হ'ল মনের সূক্ষ্ম –তর অভিপ্রকাশ আর দ্বিতীয়টি হ'ল

প্রতি পদক্ষেপে কার্য–কারণ তত্ত্বের ওপর আধারিত বিচার–সমর্থিত অভিব্যক্তি।

শিল্প কাকে ৰলৰ? তুমি কত কিছু করছ। এখন তুমি যদি সেই কাজগুলো খুৰ সুন্দরভাবে কর, সূক্ষ্মভাবে কর তৰে তাকে ৰলৰ শিল্প। সুন্দরভাবে কিছু বলছ, সূক্ষ্ম –তর কিছু লিখছ–এই সবই শিল্পের আওতার মধ্যে এসে পড়ে। আর যখন তুমি বিচার–সমর্থিত পথে, যুক্তির ভিত্তিতে কিছু করছ, সঙ্গে সঙ্গে কার্য–কারণ তত্ত্বের দিকেও মনোযোগ দিচ্ছ তখন তাকে ৰলৰ বিজ্ঞান।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই কার্য–কারণ তত্ত্বের আওতায় এসে যায়। কোন কিছুই কারণহীন নয়। যে বিষয়গুলিকে দেখে আমরা চিনে বা বুঝে নিতে পারছি তাদের কার্য–কারণ তত্ত্বও আমরা পেয়ে যাচ্ছি। মনে করো, তুমি চীনী দেখলে। চীনীর উৎপত্তির কারণ কী, –না, তার কারণ আখ অথবা বীট। যেখানে আখ বা বীট হ'ল কারণ তত্ত্ব সেখানে চীনাটা হ'ল কার্যতত্ত্ব। আবার আখ বা বীট হ'ল যেখানে কার্যতত্ত্ব, সেখানে তাদের বীজগুলি হ'ল কারণতত্ত্ব। তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোন না কোন কারণ থাকৰেই। বিজ্ঞান কাকে বলৰ? বিজ্ঞান তাকেই ৰলৰ যা বিচার সমর্থিত ভাবের

ওপর প্রতিষ্ঠিত ও যা কার্য–কারণ তত্ত্বের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। আজ থেকে ২০০০ বছর আগে মহর্ষি কণাদ বলেছিলেন–

"কারণাভাবাৎ কার্যাভাবঃ" অর্থাৎ, যেখানে কোন কারণতত্ত্ব নেই সেখানে কোন কার্যতত্ত্বও থাকতে পারে না।

আধ্যাত্মিক সাধনাও বিজ্ঞানের পর্যায়েই পড়ে। যে মহান বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম এই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানকে আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর নাম সদাশিব। আজ থেকে প্রায় ৭০০০ বৎসর পূর্বে তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল পার্বতী। প্রাচীন চীনে এই পার্বতী 'তারা' নামে অভিহিত হতেন। এই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান দু'টি ভাগে বিভক্ত–তারা যেন একটি পাখীর দু'টি ডানা। তার একভাগের নাম নিগম, অন্য ভাগের নাম 'আগম'। পার্বতীর প্রশ্নগুলি 'নিগম' নামে আর সদাশিবের উত্তরগুলি 'আগম' নামে সুপরিচিত।

একবার পার্ব্বতী শিবকে প্রশ্ন করেছিলেন, "হে শিব, জীবনের নানা ক্ষেত্রেই আমরা দেখি, কোন না কোন বিষয়ে যোগ্যতার সুনির্দিষ্ট সর্বনিম্ন মান থাকে। যেমন, ডাক্তার হবার আগে তাকে অবশ্যই চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক হতে হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই স্নাতক মানটি হল তার চিকিৎসক হৰার অধিকার অর্জনের ন্যূনতম যোগ্যতা। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যোগ্যতার একটা সর্বনিম্ন মান রয়েছে। তাই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান অনুসারে যোগ্যতার সর্বনিম্ন মানটি তবে কী? এ ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই যোগ্যতার কোন সর্বনিম্ন মান অবশ্যই রয়েছে।"

শিব উত্তরে বলেছিলেন, একজন মানুষের পক্ষে মনুষ্য দেহ লাভ করা ও ভক্তি জাগিয়ে তোলাই হল তার ন্যূনতম যোগ্যতা ও একমাত্র চরম যোগ্যতা। অন্তর্মুখী যাত্রার ধারাপ্রবাহে, সৃষ্ট জগতের এই প্রতি–সঞ্চরাত্মিক গতিতে, সবকিছুই স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে এগিয়ে চলেছে। জড় জগতে অন্তহীন সংঘর্ষ ও সমিতির মধ্যে দিয়ে আদিম প্রোটোজোয়া বা প্রোটোজোয়িক কোষগুলির বিকাশ ঘটছে। আরও অধিকতর সংঘর্ষ ও সমিতির ফলস্বরূপ এই সৰ প্রোটোজোয়িক কোষগুলি রূপান্তরিত হচ্ছে মেটাজোয়িক কোষগুলিতে। পরিশেষে, বৌদ্ধিক এক মানকে বজায় রেখে মেটাজোয়িক কোষগুলি মানুষে পরিণত হচ্ছে। অন্যান্য জীবিত প্রাণীসমূহে, জীবিত প্রাণীর সংরচনায় বুদ্ধি আছে, কিন্তু তাতে বোধির অভাব। মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু বুদ্ধিও আছে, ৰোধিও রয়েছে। মানুষের স্বভাবটাই

এক অদ্ভুত ধরণের। তাদের মনের কতকাংশ সচেতন, আবার কতকাংশ অচেতন। আর এই অচেতন স্তরেই নিহিত রয়েছে তার যাবতীয়, সামর্থ্য ও গুণাবলী।

সকলের মনে রাখা উচিত যে মানুষ যখন একটা আধার পেয়েছে তখন সেই মানবাধারে তার ভক্তির বলে মানুষ এক চরম স্তর বা পরম আধ্যাত্মিক অবস্থা অবশ্যই অর্জন করতে পারে। এ ব্যাপারে কেউই কারও তুলনায় উচু বা নীচু নয়। সেই নির্গুণ পরমাবস্থা বা চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোটা মানুষ মাত্রেরই জন্মগত অধিকার।

যখন কোন মানুষ তার সর্বস্ব পরম পুরুষের চরণে সমর্পণ করে তখন তার মনের সৰ সমর্পিত বৃত্তিগুলি তাকে ভক্ত করে তোলে। আর তখন তার মানসিক গুণগুলি ভক্তি রূপে পরিগণিত হয়। পরম পুরুষের কাছে সমর্পিত ওই সৰ বৃত্তির সামবায়িক নামই হল ভক্তি, কেননা সেগুলি তখন পরম পুরুষকেই তো সমর্পণ করে দেওয়া হযেছে! শিব তাই উত্তরে বলেছিলেন:

"আত্মজ্ঞানং বিদুজ্ঞানং জ্ঞানান্যানিযাণিতু।
তানি জ্ঞানাবভাসানি সারস্য নৈব ৰোধনাৎ।।”

দেখো, এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটা কথা বলে নিচ্ছি।আমি এখানে পালি ভাষা ব্যবহার না করে সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকটি বললুম। কারণ, পালির চেয়ে সংস্কৃতই অধিকতর সহজবোধ্য। তাই সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার করলুম। যাই হোক, মানুষ যখন কোন কিছু জানছে, তখন তার এই জ্ঞান–প্রক্রিয়াটা কী ধরণের হয়? জ্ঞান–ক্রিয়ার বিজ্ঞানটা হল, ব্যাহিক তরঙ্গ বা তন্মাত্রের আত্মস্বীকরণ। বাহ্যিক স্পন্দন বা অনুভূতির আভ্যন্তরীণ রূপ পরিগ্রহকেই বলে জ্ঞান। দার্শনিক ভাষায় তুমি বলতে পার, বিষয়–ভাবকে বিষয়ী ভাবে আত্মস্বীকরণ করাকেই বলে জ্ঞান। তোমার মনের এক অংশ হল জ্ঞাতা; আর যখন তুমি কোন বাহ্যিক বিষয়কে জানছ, তোমার মনের অন্য অংশটা জ্ঞেয়তে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তখন তুমি নিজেকে জানতে অর্থাৎ আত্মোপলব্ধির ব্যাপারে কী করবে? তোমার মনের জ্ঞাতা অংশটুকু হল বিষয়ী–মন যা হাতী দেখছে, গোরু দেখছে, কিন্তু সে মনটা নিজেকে অর্থাৎ আত্মসত্তাকে দেখছে না সেটা বাইরে অসংখ্য বস্তুকে দেখছে কিন্তু নিজেকে দেখছে না। এখন প্রশ্ন হল, আত্মজ্ঞান কাকে বলে? কেউ যখন তার বিষয়ী সত্তাকে নিজের আত্মার বা

চৈতন্যের দৃক্‌-শক্তির দ্বারা দর্শন করে তাকে বলে আত্ম-উপলব্ধি।

তাই শিব ৰলছেন, প্রকৃত জ্ঞান হ'ল নিজেকে জানা, নিজের বিষয়ী-অংশকে জানা। কোন কোন ত্রুটিপূর্ণ দর্শন মনে করে যে এই জড় জগৎটাই হ'ল সৰকিছু। যখন জড়কেই সৰকিছু ৰলে মনে করা হয় তখন জড়ই হয়ে যায় জীবনের লক্ষ্য। ফলস্বরূপ, মানুষের অস্তিত্ব, তার চৈতন্য, তার মনের বিষয়ী অংশ প্রভৃতি সৰকিছুই পাথর বা মাটির মতই হয়ে যায়। তাই এ ধরণের দর্শন মানুষের প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকারক। শ্রদ্ধেয় কার্ল মার্ক্স এ ধরণের ভুল দর্শন প্রচার করে গেছেন। তোমাদের উচিত এ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ দর্শনের ৰন্ধন-জাল থেকে নিজের মনকে মুক্ত রাখা, কারণ এই জাতীয় দর্শন সাধারণভাবে মানবতা-বিরোধিই নয়, নৈতিক দিক থেকেও মানবতা-বিরোধী। এ তত্ত্বটা মানব-অস্তিত্ব ও মানব-প্রগতির পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক।
তোমরা এ কথাটা যেন ভুলে যেও না।

শিব তাই বলেছেন, মনের বিষয়ী-ভাব যখন চৈতন্যে রূপান্তরিত হয় তখনই হয় প্রকৃত জ্ঞান। সেটাই আত্ম-জ্ঞান, অন্য সব জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। তাই তিনি বলেছেন-

"আত্মজ্ঞানং বিদুজ্ঞানম্”।

তোমরা যারা বিজ্ঞানের ছাত্র রয়েছ তারা নিশ্চয়ই জান যে ছায়ার দুটি অংশ–প্রচ্ছায়া (Umbra) ও উপচ্ছায়া (penumbra)। শিব বলছেন, এই প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া কোনটিই সত্যিকারের জ্ঞান নয়। সমস্ত জাগতিক জ্ঞান, যা বাহ্য বিষয়কে আত্মস্থীকরণের মাধ্যমেই ঘটছে, সেগুলি সত্যিকারের জ্ঞান নয়। তাতে রয়ে গেছে প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার আভাস। এই প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া দর্শন করে তুমি আসল বস্তু সম্পর্কে ধারণা করতে পার না। মনে করো, এখানে একটা লিচু (ঌচু) গাছ রয়েছে, তার পাশে একটা পেয়ারা গাছও রয়েছে। দুটি গাছের ছায়া দেখে তুমি বুঝে উঠতে পারবে না যে কোন ছায়াটা লিচু গাছের আর কোনটি পেয়ারা গাছের। তা বুঝতে হলে তোমাকে আসল গাছের দিকে তাকাতে হবে। শিব এই উত্তরই 'তারা'কে দিয়েছিলেন। আর এই শিবই প্রথম তন্ত্র সাধানার প্রচলন করেন।

শিবের কাছে পার্বতীর অপর প্রশ্নটি ছিলঃ

"হে প্রভু, লোকেরা বলে থাকে যে এ স্থানটা পবিত্র, ও স্থানটা অপবিত্র। মানুষ সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় নানান তীর্থের সন্ধানে। এ ব্যাপারে মানুষের আসলে কি করা উচিত?

শিব উত্তরে বললেন–

"ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসাঃ জনাঃ।
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষ ৰরাণনে।"

কত মানুষ পৃথিবীর নানা স্থানে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে কিন্তু তারা জনে না যে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রে তাদের আপন আপন অস্তিত্ববোধের মাধ্যেই লুকিয়ে আছে। তীর্থস্থানের সন্ধানে মানুষের অন্য কোথাও যাবার দরকার নেই।

এইমাত্র তোমাদের বললুম যে ভৌতিক জ্ঞান বা বাহ্যিক জ্ঞানের অর্থই হল বাহ্য বিষয়কে আত্মস্বীকরণ করা। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের ক্ষেত্রে কী ঘটে? শিব বলছেন, সে ক্ষেত্রে বিষয়ী মনই চৈতন্যে, জীবাত্মায় বা পরম জ্ঞাতৃসত্তায় মিশে যায়। তাই পরম লক্ষ্যটি চরম জ্ঞাতৃসত্তায় মিশে যায়, পরম

সূচীপত্র

'আমি'-তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর এই পরম 'আমি'-ই হল সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান; বরং বলতে পারি একমাত্র তীর্থক্ষেত্রে। সেটা তোমার 'আমি'-বোধের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে।

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই তার 'আমি আছি' বা অস্তিত্ব-বোধ রয়েছে। এই 'আমি আছি' বোধটি ব্যক্ত জগতের স্থূল থেকে সূক্ষ্মের ধারার সর্বোচ্চ প্রকাশ। ব্যক্ত জগতের এই সর্বোচ্চ প্রকাশের ঊর্ধ্বে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে পরম চৈতন্য সত্তা বা আত্মা। তাই আত্মাই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ, আত্মা হলেন সবচেয়ে বড় তীর্থ, একমাত্র তীর্থক্ষেত্র।

তোমরা সকলেই আধ্যাত্মিক সাধক। তোমাদের মনে রাখা উচিত যে তোমাদের জীবনের গতিটা সূক্ষ্ম থেকে স্কুলের দিকে নয়, বরং, স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে। তোমরা নিশ্চয়ই এই স্থূল জগতকে অবহেলা করবে না, কারণ তোমাদের অস্তিত্বকে পরিপুষ্ট করে চলেছে এই স্থূল জগৎ। তাই তোমাদের এই স্থূল জগতকেও যথাযথ মর্যাদা দেওয়া উচিত। আমিও তাই ৰলি যে বিষয়গত সামঞ্জস্য রেখে বিষয়ীর দিকে চলাই হল আমাদের পথ।

(১৬ ই আগষ্ট, ১৯৭৯, তাইপে, তাইওয়ান)

সূচীপত্র

শিবোপদেশ

(শাস্ত্রের ভূমিকা)

"ন মুক্তিঃ শাস্ত্রব্যাখ্যান ন মুক্তির্বির্ধিপূজনে।
কেবলং ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ সঃ মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ"।।

"শাসনাৎ তারয়েৎ যস্তু সঃ শাস্ত্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ"- সকল সংরচনাই একটি নিয়ন্তসত্তা থাকা দরকার। নিয়ন্ত্-সত্তা না থাকলে সংরচনার বিভিন্নি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মূল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; যার ফলে মূল দেহের অবক্ষয় ত্বারান্বিত হয় ও শেষ পর্যন্ত সে অকালে বিনষ্ট হয়। এই মূল দেহের নিয়ন্ত্রীশক্তি তিন লোকে তিন ধরনের। জড়জগতের নিয়ন্ত্রীশক্তি হ'ল কোন জীবিত ব্যষ্টিসত্তা অথবা তন্নির্মিত বা তন্নিয়ন্ত্রিত কোন যান্ত্রিক সত্তা। ভাবজগতে এই নিয়ন্ত্সত্তা হচ্ছে একটা বাস্তবাধৃত বা বাস্তবধর্মী দর্শন; ও অধ্যাত্ম জগতে বা অধ্যাত্মলোকে এই নিয়ন্তসত্তা হচ্ছে ঈশ্বরমুখী প্রাণিনতা।

সূচীপত্র

এই ঈশ্বরমুখী প্রাণিনতা যাদের আছে তারাই বলতে পারে, –

"আমারই জয় করিৰ এই ভুৰন
রণমুখী নয়, হরিমুখী করি' মন।"

তরবারির জয় দু'দিনের। তরবারিতে মরচে ধররার অনেক আগেই তরবারির জয় শূণ্যে মিলিয়ে যায়। হ্যাঁ, ৰলছিলুম, এই জাগতিক লোকে নিয়ন্ত্রকের প্রয়োজন হয়, ও সেই নিয়ন্ত্রক হয় ব্যষ্টিবিশেষ অথবা ব্যষ্টি বিশেষের দ্বারা নির্মিত বা নিয়ন্ত্রিত কোন যান্ত্রিক সত্তা। ব্যষ্টিবিশেষ অল্পকালিক, যান্ত্রিক সত্তাও অল্পকালিক। তাই তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোন সত্তাই দীর্ঘ কালিক হতে পারে না।

একটু আগেই ৰলছিলুম, তরবারির দ্বারা, অথবা কোন প্রকারে সামরিক শক্তির দ্বারা, কিংবা লৌহজাল বা লৌহবর্মের দ্বারা কোন সংরচনাকে দৃঢ়নিৰন্ধ করে রাখার সামর্থ্য ব্যষ্টিরও নেই, যন্ত্রেরও নেই, সমারাস্ত্রেরও নেই।

"স্বরাজ শুধু আত্মা হতেই অন্তরেতে মুক্তি চাই,
অসির বলে, মসীর বলে, পেশীর বলে মুক্তি নাই"।

তাই দীর্ঘকাল আগে বলেছিলুম, আজও সেই বলার পুনরাবৃত্তিকরে বলছি– পুরমাণু ৰোমা থেকে মানুষের

ঘাবড়াবার কিছু নেই। পরমাণু বোমা মানুষের তৈরী একটি যান্ত্রিক সত্তাবিশেষ। কালবশে তার অবক্ষয় হবে। তার আস্তিত্বিক মূল্য, তার ভয়াবহতার প্রতিরোধশক্তি স্বাভাবিক নিয়মেই যে মানুষ তাকে আবিষ্কার করেছিল সেই মানুষের মস্তিষ্ক থেকেই আবিষ্কৃত হৰে।

হ্যাঁ, সকল অস্ত্রই যেমন বেশ কিছু মানুষকে মারতে পারে- কেউ একশ'জনকে, কেউ এক সহস্র জনকে, কেউ এক লক্ষ লোককে–এইভাবে অস্ত্রের ভয়াবহতার মান নির্ধারিত হয়। কিন্তু সে অস্ত্র যতই ভয়াবহ হোক না কেন, একদিন তার সমস্ত প্রতাপ শূণ্যে মিলিয়ে যাবে। একদিন মানুষ তীর–ধনুককে ভয় পেত। আজকের মানুষ তীর–ধনুকের যুদ্ধের কথা শুণলে মুচকে হাসে। তা যে–যুদ্ধে যে অস্ত্রের যেমন প্রখরতাই থাকুক না কেন বা যে সংরচনার নিয়ন্ত্রক যতই ৰলদৃপ্ত হোক না কেন তার নিয়ন্ত্রণ–প্রগ্রহ একদিন শিথিল হয়ে যাৰে, ও সেই সংরচনা দেওয়ালের বালি ঝরার মতই ঝরে পড়তে পড়তে একদিন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

তবু নিয়ন্ত্রকের প্রয়োজন জড়জগতেও রয়েছে–খুব বেশী রকমেরই রয়েছে, কারণ এই জড়জগতেই পশুবৃত্তি ক্ষ্যাপা কুকুরের মতই অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। এই

জড়জগতেই ভাবজড়তা (dogma) প্রেষিত হয়ে মানুষ দেহধারী জীব বিধবার একমাত্র সন্তানকে আছড়ে মারে। এই জড়জগতেই অর্থগৃধ্নু পিশাচেরা সরল, ঋজু একতাহীন মানুষদের তিলে তিলে শুকিয়ে মারে। এই জড়জগতেই সবল দুর্বলের জিহ্বা উৎপাটিত করে তার মুখে ভাষা কেড়ে নেয়....তার প্রাণের আকুতিকে ভাষায় রূপ দেৰার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। তাই এই জড়জগতের জন্যে কঠোর শাস্ত্রের প্রয়োজন। এই শাস্ত্র যে কেবল সব সময়েই বিশেষ ধরণের পুস্তকাকারে হবে এমন কথা নেই। একজন শুভঙ্কর ভাবদৃপ্ত মানুষই এই ধরণের ক্ষেত্রে পুস্তকরূপী শাস্ত্রের চেয়ে বেশী কাজ করতে পারে।

তৰে হ্যাঁ, এ কথাটা বার বার বলছি জড়জগতে কোন একটা সংরচনাকে বেশী দিন জিইয়ে রাখা যায় না। নামেমাত্র বজায় রাখা বা টিকিয়ে রাখা যায়। সেই বজায় রাখা বা টিকিয়ে রাখাটাও মূল রূপ থেকে দূরত্ব বাড়াতে বাড়াতেই করে যেতে হয়। অর্থাৎ কোন সংরচনার অস্তিত্ব যদি দীর্ঘকাল থাকে তাহলে দেখা যায় বিবর্তনের ভেতরে দিয়েই সে বেঁচে রয়েছে। যদি বিবর্তনও না আসে তাহলেও কচিৎ কখনো কেউ টিকে থাকতে পারে। তবে সে টিকে থাকাটা উন্নতধী

বলদৃপ্ত মানুষদের গৌরবমণ্ডিত বেঁচে থাকা নয়। সে বেঁচে থাকাটা, টিকে থাকাটা মহীলতার মত পদদলিত হয়েই বেঁচে থাকা।

"শাসনাৎ তারয়েৎ যস্ত সঃ শাস্ত্রঃ পরিকীর্তিতঃ”–শাস্ত্ররূপী পুস্তকের পরিবর্তে যদি কোন শুভঙ্কর মানুষ শাসনের দ্বারা সংরচনা রক্ষা করতে চায়, তৰে তাকে শাস্ত্রর মতই শুভঙ্কর হতে হৰে অর্থাৎ যেখানে শুভাশুভের প্রশ্ন সেখানে আর্দশ থেকে এক ইঞ্চিও সৰৰ না ও অন্যকে এক ইঞ্চিও সরতে–নড়তে দোৰ না। কে নিন্দে করবে, সংবাদপত্র কী লিখৰে, অথবা ভোট প্রাপ্তিতে কীরূপ প্রতিক্রিয়া হৰে সে কথা ভাবতে গেলে কল্যাণকৃৎ হওয়া যায় না।

মানসিক জগতের সংরচনাগুলো তৈরী হয়ে থাকে বিশেষ বিশেষ আর্দশের ভিত্তিতে। যদিও 'আর্দশ' শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে, যা দেখে বা যাকে দেখে পথ চলতে হয় তা। কিন্তু কালবশে কী হয়ে থাকে!

আর্দশকে খতিয়ে দেখলে আমরা তার দু'টো রূপ দেখি। একটা তার বাহ্যিক রূপ, আর একটা তার আন্তরিক রূপ।

সূচীপত্র

যেখানে আর্দশ প্রচারিত হয় অন্তরের সঙ্গে বাইরের মধুর সমন্বয়ের জন্যে, অন্তরের মধুরিমাকে বাইরে উৎসারিত করার জন্যে, সেখানে অন্তর–বাহিরের অভিন্নতা–নিৰন্ধন তা কালজয়ী হয়ে থাকে। আজকের জগতে বসে আমরা দেখছি অতীতের পৃথিবীতে এই ধরণের কোন আর্দশ ছিল না বললেই চলে, অথবা ছিল না বললে তেমন কোন ভুল হবে না।

তাই মানুষ তথাকথিত কোন আর্দশকে রূপ দিতে গিয়ে পদে পদে প্রতিঘাত পেয়েছে। আমি সংকটের বিরুদ্ধে যে ৰাধা আসে তার কথা বলছি না। সে ৰাধা তো সহায়ক শক্তি। আমি বলছি তথাকথিত আদর্শই যেখানে ৰাধা দিচ্ছে সেই কথা। অহিংসার এমন অনেক মূর্ত প্রতীককে আমরা এই ধূলির ধরণীতে দেখেছি যাদের কথন ও বাচন দেখে মনে হ'ত, এঁরা নিশ্চয়ই ধরণীর ধূলিকণাকে চিন্ময় রেণুতে পরিণত করেবেন। মানুষ তাদের অন্তরের সমস্ত মাধুর্য্য, সমস্ত শুভ চিকীর্ষা তাঁদের চরণতলে লুটিয়ে দিয়েছে। পরে দেখেছে, তারা মানুষকে দুঃসময়ে ত্যাগ করে অন্য ধরণের কথা বলেছে। অন্য অভিব্যক্তির দ্বারা তাদের রসনাকে কলুষিত করেছে। মানুষ পথের কাঙ্গাল হয়ে পথের ধূলোয় বসে পড়েছে।

মানুষ সাধারণতঃ পেয়েছে ভেতরের কালিমাকে দর্শনের ফাঁকা বুলির দ্বারা ঢেকে রাখবার জন্যে ব্যবহার করা চকচকে রাঙতাকে। এই কালিমা ঢাকবার রাঙতা কোনটা সোণালী, কোনটা রুপোলী, আর কোনটা শতসহস্র বর্ণালীর সমারোহ। প্রথমের দিকে মানুষ–পথহারা, দিভ্রষ্ট মানুষ–মৃগতৃষ্ণিকাতাড়িত জীবের মতই বর্ণের আকর্ষণে ছুটে চলেছে। তারপর সর্বরিক্ত হয়ে হাঁটু ভেঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়েছে। হতাশার দাবদাহে মৃত্যুকে বরণ করেছে। কখনও হয়তো সে মৃগতৃষ্ণিকার স্বরূপকে চিনে তারপরে মরেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মৃগতৃষ্ণিকার স্বরূপকে তারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়েও চিনতে পারেনি। ত্রুটিপূর্ণ দর্শনের মানবঘ্ন সংবৃত্তি তাদের কাছে চিরদিনের জন্যেই অজানা, অচেনা থেকে গেছে। ভাবজগতে মূঢ় দর্শনের এটাই হচ্ছে বিভীষিকাময় কর্মান্বয়ণ।

মানুষ মনপ্রধান জীব। লৌকিক জগতের সম্প্রেষণার চেয়েও ভাবজগতের আকুতি ও অধ্যাভোগ তাকে বেশী প্রভাবিত করে–আত্মপ্রসারের সুযোগ এনে দেয়। আর যে সম্প্রেষণা বা আকুতির দ্বারা তার ভাবজগৎ পরিচালিত হচ্ছে তা'তে যদি সামান্যতম ত্রুটি থেকে যায় তৰে তা একককে নয়, একটা বিরাট গোষ্ঠীকে, ও তা অল্পকালের জন্যে নয়–

সুদীর্ঘকালের জন্যে হতাশার চোরাবালিতে নিমজ্জিত করে। সেই চোৱাৰালিকে চিনে যাবার পরে সে যখন তার সর্বগ্রাসী জাল থেকে বাঁচবার চেষ্ঠা করে, পায়ের' পর পা ফেলে ওপরে ওঠার চেষ্ঠা করে, তখন সে অধিকতর পঙ্কে আমজ্জিত হতে থাকে। তখন মৃত্যুই তার সুনির্দিষ্ট বিধিলিপি হয়ে দাঁড়ায়। সেই জন্যে জড়জগতের চেয়েও ভাব–জগতের তথা মানসিক জগতের নিয়ন্ত্রন–ব্যবস্থা আরো ভাল হওয়া উচিত।

মানুষকে কেউ যদি সৎ নির্দেশ দিতে না পারে সে যেন মানুষকে অসৎ নির্দেশ না দেয়। মানুষের মনোজগতের নরম অংশটুকুকে নাড়া দিয়ে তাকে বিপথগামী না করে। যেমন, জড়জগতের শাস্ত্রটিকে কঠোর নিয়ন্ত্রক হওয়া দরকার ও এই শাস্ত্রটি পুস্তকাগত না হয়ে ৰলিষ্ঠ মানুষ হলেই বেশী ভাল হয়, মনোজগতে কিন্তু শাস্ত্র হিসেবে দর্শন ও দর্শনাধারিত ব্যষ্টি উভয়েরই প্রয়োজনগত মূল্য ও ব্যবহারগত মূল্য প্রায় সমান।

মানুষের সামনে থাকবে একটি সুষ্ঠু সর্বস্পর্শী দর্শন–যে দর্শনে যতদূর সম্ভব মনের কোন ভূমিতেই কোন ফাঁক (loop hole) থাকবে না। ঠিক তেমনি সেই দর্শনকে রূপায়িত করৰার জন্যে এগিয়ে আসবেন একজন দৃঢ়চেতা সুপণ্ডিত অগ্রপুরুষ। দর্শনটিতে যদি কিছুটা ত্রুটি থাকে, কিন্তু যদি

সেই অগ্রপুরুষটিতে কোন ত্রুটি না থাকে, তাহলে অগ্রপুরুষের জীবিতকালে দর্শনের ত্রুটি জনগোষ্ঠীর তেমন কোন ক্ষতি করে না। ক্ষতিটা হয়ে থাকে অগ্রপুরুষের তিরোধানের পরে। কিন্তু দর্শনের ত্রুটি যদি না থাকে, কিন্তু তার রূপায়ণের ভার যে নেয় (অবশ্যই তাকে অগ্রপুরুষ বলতে পারছি না) সে যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে উন্নত দর্শন পুস্তকেই সীমাবদ্ধ থাকে। সমাজ দ্রুত পদবিক্ষেপে রসাতলের দিকে প্রধাবিত হয়। তাকে তখন বাঁচাবার কেউ থাকে না। চোখের জলে বুক ভিজিয়ে, মানস-মুক্তির রুদ্ধ দুয়ারে কপাল ঠুকে মরে গেলেও সামনে পরিত্রাণের পথ থাকবে না।

অতীতে অজস্র দর্শন এসেছে। ওই দর্শনশাস্ত্ররাই মানুষের মানসিক সংরচনাটা গড়ে দেয়। চিন্তাজগতেও উৎসের কাজ করে। সাধারণতঃ মানুষ চেষ্ঠা করেও সেই দার্শনিক চিন্তার প্রভাবটা এড়াতে পারে না। অর্থাৎ যা কিছু বলুক বা যা কিছুই ভাবুক, সমস্তই মনের মধ্যে জেঁকে বসা সেই দর্শনেরই চারিপাশে ঘুর ঘুর করতে করতে বলে বা লেখে। সুতরাং মানুষকে বা মানবগোষ্ঠীকে যাঁরা কোন দার্শনিক অভিজ্ঞা দেবেন তাঁদের খুব বেশী দায়িত্ব নিয়েই তা করতে হবে। অর্থাৎ এই কাজটা করতে গেলে দার্শনিক পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে

চাই প্রচণ্ড দায়িত্ব-বোধ ও মানবজাতির প্রতি ত্রুটিহীন মমতা।

এককালে মানুষকে শেখানো হয়েছিল যে পৃথিবীটা মানুষের ভোগের জন্যে। সুতরাং এ পৃথিবীতে উদ্ভিদ, পশুপক্ষী, যারাই আছে, তাদের অস্তিত্ব কেবল মানুষের ভোগোপকরণ যুগিয়ে যাওয়াতে। তাদের আশা-আকাঙ্খা, তাদের বাঁচবার এষণা, তাদের সুখ-দুঃখ-ভালোবাসা, তাদের মায়া মমতায় ভরা পরিবারিক বা গোষ্ঠীজীবনের কোন দাম নেই। ছাগলছানার বাঁচবার ইচ্ছে যতই থাকুন না কেন, ছাগলছানার শরীর কত ওজনের মাংস রয়েছে সেটাই বিবেচ্য। এই ভুল দর্শন মানুষকে হিংস্র করে তুলেছিল। মানুষকে রক্তলোলুপ শার্দুলের চেয়েও ভয়ংকর করে তুলেছিল। কারণ, শার্দুল জীবহত্যা করে বাঁচবার দায়ে, পেটের দায়ে। আর মানুষ অধিকাংশ সময়ে জীব হত্যা করে লালসার প্রেষণায়। অনেক সময় মানুষ নিজের লালাসাবৃত্তিকে ঢাকা দিতে গিয়ে কাপটাচরণের (hypocrisy) আশ্রয় নিয়েছে। দেবতাকে তুষ্ঠু করবার অজুহাত দেখিয়ে জীবহত্যা করেছে, আসলে নিজের রসনাকে তৃপ্ত করার জন্যে। এ সবই ত্রুটিপূর্ণ দর্শনের ফলশ্রুতি।

সূচীপত্র

কোন দর্শন বিশেষে কোন মানবগোষ্ঠীকে শিখিয়েছে–'এই মানবগোষ্ঠী পরমপুরুষের আশীর্বাদধন্য প্রিয় সন্তান–বাকীরা ঈশ্বরের অভিশাপবদ্ধ অবাঞ্ছিত ব্যষ্ঠি।' এই দার্শনিক ত্রুটিতে এক গোষ্ঠীর মানুষ অন্য গোষ্ঠীকে ধ্বংস করাও পুণ্য কাজ বলে মনে করেছে। সমাজের পাষাণকঠোর বেদী নিরীহ মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। ভুল দর্শনের স্তাবকেরা! নিরীহ মানুষের রক্তে মুক্তি স্নান করেছে। ওঃ কী বিভীষিকা! ভুল দর্শন মানুষকে শিখিয়েছে, বুদ্ধির বলে যদি অন্যকে শোষণ করি তাতে দোষ কীসের! বুদ্ধি প্রয়োগ করাও তো একটা পরিশ্রম। বুদ্ধি প্রয়োগ করারও তো একটা অধিকার আছে–এই যুক্তিতেই লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত মোক্ষণ করে কিছুসংখ্যক পরভোজী জীব স্ফীতোদর হয়েছে। আর অগুণতি মানুষ অস্থিচর্মসার জীবিত কঙ্কালে পরিণতি হয়েছে।

এই ধরণের ভুল দর্শন আবার অনেক মানুষকে নৈতিকতার পথ থেকে বিচ্যুত করে উদর–উপস্থজীবী ধর্মবিহীন নরকের কীটে পরিণত করেছে। মানুষকে ধর্ম সম্বন্ধীয় খাঁটি জ্ঞান থেকে দূরে রেখে ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা করে মানুষ জতির চরম শত্রুতা করেছে। সকল মানুষকে সন্দেহের চোখে দেখতে শিখিয়েছে। মানুষের কল্যাণের

কাজগুলি গোষ্ঠীবিশেষের হাতে সীমিত রেখে বাকী মানুষকে সত্যি কথাটা জানতে দেয়নি। জানতে দেয়নি তারা মানুষের সত্যিকারের কল্যাণকৃৎ না অকল্যাণকৃৎ। মানুষের সামনে এই লৌহ–যবনিকা, এক মসীকৃষ্ণ অজ্ঞতার পর্দা টাঙ্গিয়ে রেখে মানুষকে ছক্কাটা কতকগুলো বাঁধা কথা বলতে শিখিয়েছে। জীবনধারাকে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে রেখে তার দ্বার আর বাতায়নগুলিকে রুদ্ধ করে মানুষকে অন্ধকারের পেচকে পরিণত করেছে। এ সবই ত্রুটিপূর্ণ দর্শনের ফলশ্রুতি।

তাই একটু আগেই ৰললুম–আবারও বলছি, মানুষের মনের সংরচনাকে গড়ে দেয় সর্বস্পর্শী দর্শন যাতে রয়েছে বিশালতা। যে দর্শন তা করতে পারে না সে দর্শন মানুষকে ভাবজড়তার অন্ধকূপে নিমজ্জিত করে তার ঐহিক, পারত্রিক তথা সর্বলৌকিক বিকাশকে কষ্টিপাথরের কঠোরতায় অবরুদ্ধ করে দেয়। মানুষ ভুলে যায় প্রজ্ঞার অবাধপ্রসারী মানবাস্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্যটুকু খুইয়ে ফেলে কেবল উদর–উপস্থজীবী জীৰে পরিণত হলে মানুষের যা কিছুই থাকুক না কেন, মানুষ আর যা কিছুই পা'ক না কেন, মানুষের পরিচিতি বহনের যোগ্যতা সে হারিয়ে ফেলে। তাই মানুষের কর্তব্য এমন একটা সর্বস্পর্শী দর্শনকে অন্তর দিয়ে দু'বাহু

প্রসারিত করে গ্রহণ করা যা কোন অবস্থাতেই তাকে মানবতার বিরুদ্ধে যেতে বলৰে না, বা যেতে প্রত্যক্ষ তথা পরোক্ষ প্রোৎসাহন দেবে না।

একথা সর্বলৌকিক তথা সর্বদেশিক সত্য যে ধর্মই জীবনের স্রোতোধারা। ধর্ম থেকেই জীব পায় চলচ্ছক্তি, পায় তার পথের পাথেয়। আর পায় তার চলার পথের দিনির্দেশনা। ব্যাপকার্থে ধর্ম সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম সত্তাতেই রয়েছে। অর্থাৎ ধর্ম সকল সত্তার অস্তিত্বৰোধক। করণার্থে ধর্ম স্থাবরে কিছুটা অপ্রটক, জঙ্গমে বেশী প্রকট। জঙ্গমের মধ্যে মনুষ্যেতরের ধর্ম স্বাভাৱসিদ্ধ ও সহজাত। কিন্তু মানুষের ধর্ম এর চেয়ে অনেক বেশী। মানুষের জীবনধর্ম সর্বপ্রসারী-সর্বাভিকুপ্ত। তাই ধর্ম-জগতের দিশারী তথা প্রেষক তথা নিয়ন্ত্রক তথা অভিভাৱক হতে পারে একটি সুষ্ঠু সর্বকৌণিক-তত্ত্ব, যা মানুষের দিনচর্যা থেকে শুরু করে সমাজচর্যা, সমাজপ্রেরণা, ও ঈশ্বরসংলিপ্তি পর্যন্ত সৱ কিছুকেই ও সৱকিছুতেই সুনির্দিষ্ট ও ৱলিষ্ট ব্যবস্থা ও প্রত্যক্ষ সংকেত দেবে। যে তা নয় অধ্যাত্মজগতে তা শাস্ত্রপদৰাচ্য নয়। 'শাসনাৎ তারয়েৎ যস্তু সঃ শাস্ত্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ

--এই ব্যাখ্যার চেতনাদীপ্তি তার মধ্যে নেই।

সূচীপত্র

আরো মনে রাখতে হবে যে ধর্মজগতে বা অধ্যাত্মজগতে ধর্মশাস্ত্র নামক ৰাস্তৱ দেশনা বা উপসম্পদা তো থাকবেই, তার সঙ্গে থাকবে একজন দৃঢ় অভিভাবক যে অভিভাবক তাঁর জীবিতকালে উপসম্পদা অনুযায়ী চলবেন ও চলাবেন; আর তাঁর কালিক অনুপস্থিতিতে দেশনা বা উপসম্পদার সঙ্গে শাশ্বতী সমাচর্যায় এক হয়ে থাকবেন।

অধ্যাত্ম জগতের সংরচনা অস্তিত্বের সমস্ত সংবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক কর্মের উৎস ও আস্তিত্বিক সমস্ত চর্যায় প্রাণসঞ্জীবনী স্রোতস্বিনী। তাই এই অধ্যাত্মজীবনে এমন কোন কিছুই থাকা বা রাখা চলতে পারে না যা জীৰকে সংশ্লেষণের পথ থেকে বিচ্যুত করে বিশ্লেষণের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, যা মানুষের সামূহিক জীবনকে প্রকোষ্ঠীকৃত করে মানুষে মানুষে পৃথকতাৰোধ উস্কানি দেয়। অধ্যাত্মজীবনের সানান্যচর্যা থেকে শুরু করে সর্বব্যাপী তথা সর্বকালীন চর্যা পর্যন্ত কোন ভূমিতেই সে মানুষকে ক্ষুদ্রত্বের মায়াজালে বাঁধবার চেষ্ঠা করবে না, রাক্ষসীমায়ার দংষ্ট্রায় কবলিত করবে না। তাই এই অধ্যাত্মজগতের দেশনা বা উপসম্পদা সংক্রান্ত গ্রন্থশাস্ত্রকেও হতে হবে নির্মেঘ। আর যিনি সঞ্চালক অগ্রপুরুষ তাঁকে হতে হবে দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন শুভার্থী কঠোর অভিভাবক।

ৰাৱৰারই একটা কথাই ঘুরে ফিরে আসছে–'শাসনাৎ তারয়েৎ যস্ত সঃ শাস্ত্রঃ পরিকীর্তিতঃ'। মানুষের চতুর্বর্গের প্রতিটি ভূমিতেই শাস্ত্রের প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক ভূমিতে যে শাস্ত্রের প্রয়োজন তিনি হলেন সেই ধর্মশাস্ত্র বা উপসম্পদা–শাস্ত্র প্রবর্ত্তক ও শাস্ত্রনিয়ন্ত্রক ৰা চিৎসত্তা বা গুরুরূপী ব্রহ্ম। তৃতীয় শাস্ত্র হচ্ছে মনোজগতের শাস্ত্র ও তা' হচ্ছে দর্শনশাস্ত্র। এই দর্শনশাস্ত্রের সংগে যদি চতুর্থ শাস্ত্র অর্থাৎ দর্শনপ্রবক্তারূপী প্রশিক্ষক থাকেন তাহলে আরো ভাল কারণ, দর্শন শাস্ত্রের ভুল ব্যাখাও হতে পারে। শাস্ত্রে লেখা, 'বিধবা অগ্রে গমিষ্যতি'র পরিবর্তে শাস্ত্রগত ব্যাখ্যা ও পাঠের ত্রুটিতে 'বিধবা অগ্নে গমিষ্যতি' হয়ে গেছল, যার ফলে লক্ষ লক্ষ নিরীহ বিধবাকে জীবন্ত অবস্থায় চিতাগ্নিতে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। তাই দর্শনবেত্তা একজন সুপণ্ডিত প্রশিক্ষকেরও প্রয়োজন রয়েছে।

এই মানসিক ভূমির শাস্ত্র অর্থাৎ যাকে সাধারণ কথায় দর্শণশাস্ত্র বলি তাতে সামান্যতম ভাবজড়তার ..... ছিটেফোঁটাও, ভাবজড়তার পাঁচ ফোড়ন দেওয়া চলবে না, কারণ এই ধরণের দর্শনাশ্রয়ী ভাবজড়তা মানুষের মনোভূমিতে বিকৃতির মাত্রা পৌনঃ পুনিক ভাবে বাড়িয়ে দিতে থাকে। মনোজগতে এই ভাবজড়তা ছুঁচ হয়ে ঢুকে শেষ পর্যন্ত ফাল

হয়ে দাঁড়ায়। তখন তাকে নেড়ে ঝেড়ে ফেলে দিতে গেলে সমগ্র সত্তাটাই বিধ্বস্ত হয়ে যায়। একটি সুন্দর অট্টালিকার একটি কোণে একটি শিশু বটবৃক্ষ জন্মালো ও দীর্ঘকাল ধরে যদি সেই ৰটবৃক্ষের বৃদ্ধিকে উপেক্ষা করা হয়, তার পরে যখন সেই বটবৃক্ষ বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়, তখন সেই বটবৃক্ষকে উৎপাটন করতে গলে সমগ্র গৃহটিই ভূমিসাৎ হয়ে যায়।

জড়জাগতিক ক্ষেত্রে শাস্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে যা মানুষের মানসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি উহ ও অবোহকে বিধিসম্মতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যাবে। একটুও ছন্দপতন হলে চলবে না। একটুও বেসুরো গাইলে চলবে না। এই যে জড়জাগতিক শাস্ত্র এর সঙ্গেও দরকার উন্নতধী অনল-পুরুষের বলিষ্ঠহস্তসঞ্চালন। অন্যথায় মানবসম্পদের কষ্টপ্রস্তুত গুড় স্বার্থলোলুপ ভোগগৃধ্নু পিঁপড়ের দলই নিঃশেষে খেয়ে শেষ করে দেবে। মানুষের মনোজগতের শ্যামল শস্যকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে শিঙ গলিয়ে পশুরা উজাড় করে খেয়ে ফেলবে। এই শাস্ত্রই হ'ল সমাজশাস্ত্র (social Code)। আর এই সমাজশাস্ত্র মানুষের মনে যে সংবৃত্তির

উদ্বোধন ঘটাৰে তা হচ্ছে সমাজ–মানসিকতা (Social Sprit)।

কোন বিশেষ শ্লোক বা সূত্র বা অভিব্যক্তিকে যদি বিশেষ রূপে খ্যাতিসম্পন্ন করে জিজ্ঞাসুর সামনে তুলে ধরা হয়, তৰে তাকে ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যান বলা হয়ে থাকে। একটি সূত্রে বা একটি শ্লোকে অল্প কথায় যা বলা হয়ে থাকে অধিকাংশ সময়েই তার গূঢ়ার্থ শ্রোতা বা পাঠক যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাই শ্রোতা–পাঠকের অবগতির জন্যে যথাযথ অনন্বয় সহযোগে প্রয়োজনমত টিপ্পনীসহ টীকা করে দিতে হয়। যে শব্দ স্বাভাবিক অবস্থায় পড়েছিল তাকে বিশেষ গুরুত্ব মর্যাদা সহকারে শ্রোতা–পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়। এটাই হ'ল ব্যাখান কার্য বা ব্যাখ্যা করা।

এর আগেই ৰললুম, শাস্ত্র মানুষের জীবনের বিভিন্ন অধিক্ষেত্রভেদে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে; আর শাস্ত্রেতেও যা বলা হয় তা সংক্ষেপেই বলা হয়। খুব অল্প ক্ষেত্রেই তা বিস্তৃতভাবে বলা হয়ে থাকে। ধর্মশাস্ত্রকে, ধর্মগুরুকে, দর্শনশাস্ত্রকে, দর্শন প্রবক্তাকে, সমাজশাস্ত্রকে, সমাজনেতাকে ও সমাজদর্শকে মানুষের সামনে ঠিকভাবে তুলে ধরাটাই হ'ল শাস্ত্র ব্যাখ্যান। উপযুক্ত ব্যাখ্যান ব্যতিরেকে শাস্ত্র অধিকাংশ সময়ে

দুর্বোধ্য ও কোন কোন সময়ে অবোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই উপযুক্ত পণ্ডিত, উপযুক্ত দার্শনিক তথা মর্মজ্ঞ

এমনও কিছু লোক আছেন যাঁরা পণ্ডিত নন্, দার্শনিকও নন্, মর্মজ্ঞও নন্, কেবল জীবিকার খাতিরে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে বেড়ান। তাঁরা কিছুতেই ঠিক জিনিসটি ঠিকভাবে শ্রোতার সামনে উপস্থিত করতে পারেন না। এরকম লোকেরা শাস্ত্রব্যাখ্যানের নামে উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা হয়তো করতে পারেন, কিন্তু জনসাধারণের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই- করেন বেশী। আবার কিছু লোক পাণ্ডিত্য–জাহির করবার জন্যে বৈদুষ্যির প্রশংসাপত্র পাবার জন্যেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। তাঁরাও শাস্ত্রের প্রাণিন সত্তা বা প্রাণপুরুষ বা শাস্ত্রের তীর্থপতি থেকে অনেক দূরেই থেকে যান। সুতরাং শাস্ত্র ব্যাখ্যানে মুক্তি কী করে হতে পারে। বরং শাস্ত্র ব্যাখ্যানে অনেক সময় অহমিকায় স্ফীত ও বর্ধিত হয়ে তাঁরা জীবনের মূল লক্ষ্য থেকেই সরে যান। সাধারণ মানুষের চেয়েও তাঁরা নীচে নেৰে যান। এজন্যেই বলা হয়েছে'–"ন মুক্তিঃ শাস্ত্রব্যাখ্যানে।”

('নমঃ শিবায় শান্তায়', ২৩৮ পৃষ্ঠা)

সূচীপত্র

একাদশ খণ্ড

আনন্দমার্গ–এক বিপ্লব

কি আধ্যাত্মিক, কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক, কি মানসিক জীবনের সর্ববিধক্ষেত্রে আনন্দমার্গ এক বিপ্লববিশেষ। আনন্দমার্গের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক সংঘটন, মানসিক চিন্তাধারা তথা আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রভৃতি কেবল নূতনই নয়, বরং বহুলাংশে এগুলো প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র জিনিস।

আনন্দমার্গ কালের গতিপ্রবাহ প্রসূত এক পরিবর্তন মাত্র নয়। এ হচ্ছে এক বিপ্লব, যথার্থ বিচারে এক আমূল পরিবর্তন। জগতের ইতিহাসে কখনও সুসন্নিবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এমন দৃঢ় সংযোগ আর পরিলক্ষিত হয়নি। নিজের তথা পরিবারের জীবিকার্জনে তৎপর একজন সাধারণ গৃহীর ন্যায় আধ্যাত্মিক সাধকও এখানে সমাজের একজন আদর্শ সদস্য।

সূচীপত্র

জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো একে একে বিশ্লেষণ করলেই আমরা দেখতে পাই যে প্রচলিত চিন্তাধারা থেকে আনন্দমার্গের চিন্তাধারা কত তফাৎ ও কত উন্নত। পৃথিবীর আদিম অবস্থা থেকেই শাসন–ক্ষমতা কোন না কোন এক শ্রেণীর না হয় অপর শ্রেণীর হস্তগত ছিল। শুরুতে জন্তু–জানোয়ারের যুগে পশুশক্তি শ্রেণীবিশেষের যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক ইতিহাসে এমন এক যুগ দেখতে পাই যখন বিশালকায় সরীসৃপ তথা ডাইনোসেরাস প্রভৃতি জন্তুরা কেবল তাদের দৈহিক স্থূলতা ও ক্ষমতা ৰলেই পৃথিবীর ওপর রাজত্ব চালাত। এই দৈহিক শক্তির প্রভাব কেবল জন্তুদের যুগেই ছিল না, প্রাথমিক যুগের মানুষের ক্ষেত্রেও তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এমনকি মানব সভ্যতার এক উন্নত স্তরে নাইট–রাজা–মহারাজদের যুগেও তাঁরা দৈহিক শক্তির ওপর বহুলাংশে নির্ভর করতেন ও দৈহিক ৰলেই তাঁদের শাসন অব্যাহত রেখেছিলেন। কালের গতিতে ও মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শাসনের মানদণ্ড হিসেবে বিচারের সূক্ষ্মতা তথা চিন্তের দূরদর্শিতা ক্রমশঃ দৈহিক শক্তির স্থান দখল করে নিয়েছে। অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের গুরুত্ব বেড়ে গেল ও বিদ্বানের জ্ঞান তথা সাহসীর সাহস অর্থের দাসে পরিণত হ'ল অর্থাৎ শাসনক্ষমতা চলে গেল

বিত্তশালীদের বা পুঁজিপতিদের হাতে। পুঁজিপতিদের হাতেও ওই ক্ষমতা বেশীদিন থাকল না কেননা তাদের আয় নির্ভর করত শ্রমজীবীদের শ্রমের ওপর। শ্রমজীবীদের মধ্যে যাদের সাহস, শক্তি, মানসিক প্রগতি বা অর্থৰল কিছুই ছিল না তারা এতদিন তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে উপযুক্ত কোন না কোন শ্রেণীর দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করত। যারা দৈহিক ৰলের দ্বারা বা মনোৰলের দ্বারা নিজেদের শাসন অক্ষুণ্ণ রেখেছিল তাদের শ্রমজীবীর শ্রমের ওপরে নির্ভর করতে হ'ত না, আর তাই শ্রমজীবীরাও তৎকালে তাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেনি। কিন্তু পুঁজিপতিরা শ্রমিকের সাহায্য ব্যতিরেকে তাদের সম্পদ বাড়াতে পারেনি, তাই পুঁজিপতির শাসন-ব্যবস্থায় শাসকের নিকট শ্রমের মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। এইভাবে শ্রমিকেরাও তাদের গুরুত্ব বুঝতে শিখল। ফলতঃ শাসন ক্ষমতা অধিকার করবার জন্যে তাদের চেষ্টা বর্তমান যুগের সাম্যবাদ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করল।

একটু গভীর ভাবে দেখলেই বোঝা যাবে যে ওই আন্দোলন ব্যষ্টিগত দৈহিক ৰল, মানসিক প্রগতি অর্থাৎ যুক্তি-তর্ক বা বাগ্বিন্যাস অথবা পুঁজি এগুলোর কোনটার দ্বারাই সম্পৃষ্ট নয়-কেবলমাত্র শ্রমজীবীদের একটা একতার ওপরই এই

আন্দোলনের ভিত্তি। তাদের এই কর্মশক্তি পুঁজিপতিদের পুঁজি তথা অপরাপর শ্রেণীর আহৃত সম্পদ কেড়ে নেৰার জন্যে হিংসাত্মক রূপও পরিগ্রহ করতে পারে। কিন্তু তাদের ত্রুটি যা–ই থাকনা কেন, কালের গতিপ্রবাহে তথা ঘটনা–বৈচিত্র্যে শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে আসে। আনন্দমার্গও যদি এরূপ এক কালিক পরিবর্তন মাত্র হ'ত তাহলে এর ইচ্ছানুরূপ শাসন ব্যবস্থা এক বিশেষ শ্রেণীর হস্তে ন্যস্ত হ'ত। শ্রমিকের বা সাম্যবাদীদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরলে পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে শাসনক্ষমতা সাহসীদের বা বুদ্ধিজীবীদের হাতে যাওয়ার কথা ও আনন্দমার্গ এ সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করত। কিন্তু আনন্দমার্গ তা' চায় না। পুরাতন অর্থনৈতিক জীবনের কোন কাঠামোকেই আনন্দমার্গ সমর্থন করে না। এখানে কোন এক বিশেষ শ্রেণীর হাতে শাসন ক্ষমতা থাকবে না। বস্তুতঃ আমাদের মার্গে কোন পৃথক শ্রেণী নেই। বৃত্তি বা যোগ্যতা অনুসারে মানবজাতিকে শ্রেণীৰদ্ধ করার সুপ্রাচীন প্রথাকে আনন্দমার্গ মোটেই আমল দেয় না। যে চারি শ্রেণীর লোকেরা পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর বুকে নিজেদের শাসনক্ষমতা এতকাল চালিয়ে এসেছে তারা মানব ইতিহাসের শুরু থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে পরিচিত হয়ে এসেছে। বিশেষ বিশেষ কর্মে ব্যষ্টিবিশেষের দক্ষতার ওপর ভিত্তি করেই

এই বৃত্তিগত শ্রেণীভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে সংঘটিত শ্রেণীসমূহের মধ্যে শাসন ক্ষমতা অধিকারের জন্যে সংঘাত শুরু হ'ল আর তা থেকেই এক শ্রেণীর লোকেদের শাসন সমাজে অন্যান্য শ্রেণীর ওপর প্রবর্তিত হতে লাগল। এভাবে দেখা যায় যে বৃত্তিগত শ্রেণীভেদ ব্যবস্থা হচ্ছে একটা স্বাভাবিক ও বিচারসমর্থিত জিনিস। যদি তাই হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে আনন্দমার্গই বা কি–করে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে আনন্দমার্গকে যাঁরা ঠিক বোঝেন না বা জানেন না তাঁরা স্বভাবতই একথাই বলৰেন যে যৌক্তিকতাশ্রয়ী আনন্দমার্গ অযৌক্তিক জিনেসের প্রতিষ্ঠার গর্ব করতে পারে না, আর তাই অন্যান্য বহু আদর্শৰাদী বা নৈতিকৰাদী সমাজের ন্যায় আনন্দমার্গের পক্ষেও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, কেননা এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব জিনিস। আনন্দমার্গের শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কেবল মার্গীয় প্রচারক ও দর্শনের সমর্থকদের মধ্যেই সীমিত নয়, এখানকার যে কোন সদস্যেরই ব্যষ্টিগত জীবন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার এক অঙ্গ বিশেষ। ব্যষ্টিস্বার্থপ্রণোদিত শ্রেণীভেদ ব্যবস্থা যা গোটা মানব সমাজের পক্ষে একটা অভিশাপ বিশেষ ছিল তার উচ্ছেদ কল্পে আনন্দমার্গ যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে তা থেকেই এর বিপ্লবধর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সূচীপত্র

স্বাভাবিক নিয়মেই যোগ্যতার পূর্ণ উপযোগিতার জন্যে সাধারণ রুচির লোকেদের যে সংঘটন হয় তার ওপর ভিত্তি করেই এই কৃত্রিম শ্রেণীসমূহ টিকে থাকে। দৃষ্টান্ততঃ বুদ্ধিজীবীদের সমবায়ে বিপ্রের আর সাহসী ও শক্তিশালীদের সমবায়ে ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব হয়েছে। বৈশ্য ও শূদ্রের উদ্ভবও ঠিক এমনিভাবেই হয়েছে। আনন্দমার্গ কেবল বাগবিতণ্ডা ও সমালোচনার দ্বারাই এই শ্রেণীভেদ ব্যবস্থার উচ্ছেদ করতে চায়না–আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দ্বারা সমাজে প্রতিটি সদস্যের মধ্যে চতুর্বর্ণের গুণসমূহের সমাবেশ ঘটিয়েই এই মহান দায়িত্ব পালন করতে চায়। যেমন, শূদ্র–বৈশ্য অথবা যে কোন শ্রেণীর মানুষই হোক না কেন আনন্দমার্গে যোগদান করার পর প্রত্যেককেই বিপ্রের ন্যায় উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী হ'বার লক্ষ্য গ্রহণ করেত হয়; সবাইকেই মানসিক তথা দৈহিক উন্নতির জন্যে বিশেষ বিশেষ কার্যক্রমের অনুশীলন করতে হয়, জীবিকা অর্জনের জন্যে সবাইকে খাটতে হয়। এখানে স্বাবলম্বিতাকে এতই প্রাধান্য দেওয়া হয় যে পরপিণ্ডভোজীর চেয়ে মলাকর্ষীর জীবনকেও শ্রেয় বলে গণ্য করা হয়। শুধু অর্থোপার্জন ও সুসামঞ্জপূর্ণ তথা নির্ভরযোগ্য অর্থনৈতিক জীবনকেই এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, চির–উপেক্ষিত সর্বনিম্ন স্তরের মানুষদেরও এখানে পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা দেওয়া

হয়েছে। মার্গের প্রত্যেক সদস্যকেই দৈহিক শক্তি দিয়ে অপরের সেবা করতে হয় যা প্রচলিত প্রথা অনুসারে শ্রমজীবীদের বা শূদ্রদের কাজ। কিন্তু আনন্দমার্গী যদি এই শূদ্রোচিত সেবায় নিজের দক্ষতার পরিচয় না দিতে পারে তৰে সে সত্যিকারের মর্যাদা পায় না। সংক্ষেপে আমাদের মার্গের যে কোন সদস্যকেই চতুর্বর্ণের গুণাবলী আয়ত্ত করেতে হয়। এভাবে প্রতিটি সদস্যই সর্বতোভাবে পরিপূর্ণতা লাভের পথে অগ্রসর হয়। সে একাধারে শূদ্র থেকে বিপ্রের ভূমিকা গ্রহণ করে, যার ফলে তার পক্ষে অপরকে উপেক্ষা করার বা বিশেষ শ্রেণী ঘটন করার কোন অবকাশ থাকে না। শ্রেণীহীন সমাজ ঘটন যদিও আনন্দমার্গের মুখ্য উদ্দেশ্য নয় তবুও এর বাস্তব অনুশীলনের ফলে শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা স্বাভাবিক গতিতেই হয়ে পড়ে। বর্ণবৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থাকে এভাবে ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা ইতোপূর্বে আর কখনো হয়নি। শ্রেণীগত ভেদ এতকাল খুব স্বাভাবিক- ও যুক্তিপূর্ণ ৰলে বিবেচিত হত। তাকেও এক বৃহৎ শ্রেণীহীন সমাজ তৈরীর মহৎ প্রচেষ্টায় অধিকতর যুক্তিপূর্ণ উপায়ে ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারে।

অতএব আনন্দমার্গ শ্রেণীহীন সমাজের প্রচারক আদর্শবাদীদের বা নীতিবাদীদের এক সংস্থাবিশেষ নয়,–এ হচ্ছে শ্রেণীহীন সমাজের বাহক এক পদ্ধতি বা ধর্ম বা প্রণালী।

সাম্যবাদের উত্থানের ন্যায় আনন্দমার্গ পৃথিবীর অর্থনৈতিক ক্রমবিবর্তনসাপেক্ষ জিনিস নয়–এ হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের এক আমূল পরিবর্তন।

সামাজিক স্তরে আনন্দমার্গ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা এক বিপ্লব বিশেষ। এতে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা ইতোপূর্বে আর কখনও দৃষ্ট হয়নি। এই পরিবর্তন মানুষের যুগধর্মী সমাজ–চেতনাপ্রসূত পরিবর্তন নয়–এ হচ্ছে মানব মনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন আর তাই মানবমনের অস্তিত্ব–সাপেক্ষ এই পরিবর্তনও দীর্ঘস্থায়ী।

বৈয়ষ্টিক জীবনে মৌলিক অধিকার সমূহের সুরক্ষা তথা সামূহিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মানুষ অনাদিকাল থেকে শৃঙ্খলা সমন্বিত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে চলেছে। এই সকল আইন শাসকশ্রেণীই সময়ে সময়ে তৈরী করছে ও প্রতিটি আইন থেকে এ ভাবেই প্রকট হয় যে শাসক শ্রেণী আইন প্রণয়নকালে তাদের নিজেদের স্বার্থের দিকেই সব চেয়ে

সূচীপত্র

বেশী নজর রেখেছে। দৃষ্টান্ততঃ–মনুস্মৃতিতে মনু বিধান দিয়েছেন যে কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যার পাণিগ্রহণ করলে তাকে মাথা মুড়িয়ে গাধার পিঠে বসিয়ে শহর পরিক্রমণ করানো হবে, আর শূদ্র যদি কোন ব্রাহ্মণতনয়ার, পাণিগ্রহণ করে তবে সেক্ষেত্রে তার শাস্তি হৰে প্রাণদণ্ড। এ ধরণের আইনব্যবস্থা সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব থাকাকালেই গৃহীত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ–প্রভুত্ব খর্ব হৰার সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হ'ল। ব্রাহ্মণ–প্রভুত্বের পরেও আরও অনেকে নিজ নিজ স্বার্থের সুযোগ অব্যাহত রেখে বিবিধ আইন রচনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ রাজাকে সর্বাধিক মর্যাদা দিয়েছেন, কেউ বা দেশ বা রাজ্যকে রাজার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন, আবার কেউ তাঁদের ধর্মের মাহাত্ম্যকেই সবচেয়ে বড় করে দেখেছেন। এ সকল সমাজ ব্যবস্থায় কিন্তু একতার পরিপোষক কোন সাধারণ আদর্শ ছিল না। নিরাপত্তামূলক আইনেতেও সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের জন্যে নিরাপত্তার ধরণ–ধারণ ভিন্ন ভিন্ন রকম ছিল। এ যেন এদেশের ব্রাহ্মণ–শূদ্র বা শ্বেতকায়–কৃষ্ণকায় আমেরিকানদের মত। সাধারণ অধিকার ও দায়িত্ববর্জিত সমাজ–ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী কোন সমাজের প্রতিষ্ঠা করতে পারে না কিন্তু দুর্ভাগ্য–বশতঃ এ পর্যন্ত স্মার্ত্তরা সকলে এ নীতিই গ্রহণ

করে এসেছেন যার ফলে সামাজিক অনৈক্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। চিরস্থায়ী সমাজ প্রতিষ্ঠার ভাবনাই একটা বিপ্লব বিশেষ। যে সকল ব্যষ্টি আনন্দমার্গের সমাজ প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণ করে তারা শুধু আদর্শবাদী বা নীতিবাদীই নয় তারা হচ্ছে জাতি বর্ণহীন বাস্তববাবাদী লোকেদের এক দল বা গোষ্ঠী যারা শুধু শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠামূলক চিন্তা করেই বা প্রচার করেই ক্ষান্ত হয় না, উপরন্তু মানুষের ব্যষ্টিগত গুণ বা ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে যতগুলো শ্রেণী গড়ে উঠেছে তার প্রত্যেকটির সদস্য হবার মত যোগ্যতা অর্জনে তৎপর হয়ে ওঠে। এরই সঙ্গে তারা ব্রহ্মকে সাধারণ আদর্শরূপে গ্রহণ করে দৃঢ় একতার সূত্রে আবদ্ধ হয়। এই আদর্শ শাশ্বত, আর যে কোন শ্রেণীর লোকের পক্ষেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার সামাজিক আইন মানুষে মানুষে ভেদকে প্রশ্রয় দেয় না, এখানে স্ত্রী–পুরুষ উভয়কে জীবন–সংগ্রামে সমান দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। বৈধব্য প্রভৃতি সামাজিক কু–সংস্কারগুলোকে এখানে কোন মূল্য দেওয়া হয় না।

রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক আইনের প্রতি আনুগত্যকে এখানে ব্রহ্মের প্রতি আনুগত্যের পরে স্থান দেওয়া হয়। জাতিচ্যুত করা, বিধবা বা মেয়েদের কোন কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে

যোগদানে অনুমতি না দেওয়া–এ সকল জিনিসের এখানে কোন স্থান নেই। আনন্দমার্গ এমন সমাজেরই পত্তন করেছে যেখানে সাধারণ আদর্শ বা তৎসাপেক্ষ সমাজের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই আইন প্রণয়ন করা হয়। এই সমাজ অন্য যে কোন সমগ্র মানব সমাজের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কেননা এখানে জাতিবর্ণগত বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না; ব্যষ্টিবিশেষকে জাতিচ্যুত করে তার সংশোধনের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয় না ও মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থের কথা ভেবে আইন তৈরী করা হয় না; এ ধরণের সমাজে কেউই দুর্বল বা নিপীড়িত থাকবে না বা কেউই অন্যকে তার ওপর শোষণ চালিয়ে যাবার সুযোগ দেবে না। অনেক মনীষী ও অনেক স্মার্ত্তই ইতোপূর্বে এ ধরণের সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন বা তদুদ্দেশ্যে প্রচারও করেছিলেন কিন্তু আনন্দমার্গ যেমন ভাবে একাধারে চতুর্বর্ণের গুণসমন্বিত মানুষ তৈরী করার মহান ব্রত গ্রহণ করেছে এমন প্রয়াস আর কখনও কার মধ্যে দেখা যায়নি।

এভাবে আনন্দমার্গকে অর্থনৈতিক তথা সামাজিক ক্ষেত্রে যদি বিপ্লব আখ্যা দেওয়া যায় তাহলে মানসিক তথা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে একে বৃহত্তর বিপ্লব বলতে হবে।

এ যাবৎ দার্শনিকগণ বা চিন্তানায়কগণ পরিদৃশ্যমান জগৎকে নিজেদের তুলনায় নশ্বর বলে ঘোষণা করে এসেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আনন্দমার্গের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক। আনন্দমার্গের দর্শন অনুযায়ী মানুষের নিকট তার অস্তিত্বৰোধ যেমন বা যতটুকু সত্য পরিদৃশ্যমান জগৎও ঠিক তেমনি বা ততটুকু সত্য। চিন্তাধারার এরূপ প্রভাব যে কতখানি সুদূরপ্রসারী তা প্রাথমিক দৃষ্টিতে বোঝার কথা নয়। এতে জগতের নিকট মানুষের মর্যাদাই শুধু বেড়ে যায় না, মানুষের নিকট জগতের মূল্যও বেড়ে যায়। জগৎ বা যে কোন জাগতিক ক্রিয়ামাত্রই মানুষের ন্যায় সেই পরম শাশ্বত সত্তারই বিকাশ বিশেষ। তাই আনন্দমার্গ জগতকে পরিত্যাগ করার শিক্ষা দেয় না; বরং বলে প্রত্যেকের নিকটই জগতের প্রয়োজন অপরিহার্য। জীব ও জগৎকে এভাবে সমমর্যাদা দেওয়ার ভাবনা নিঃসন্দেহে এক বিপ্লবাত্মক ভাবনা। গৃহী ও সন্ন্যাসীকে আনন্দমার্গ একই নজরে দেখে। বিপ্লবাত্মক সাহস ছাড়া আনন্দমার্গ নিশ্চয়ই এমনটি বলতে পারে না।

বর্তমানের তথা অতীতের যে কোন ধর্মীয় মতবাদই আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পথে নানা প্রকার ৰাধা নিষেধ আরোপ করেছে। হিন্দু মতবাদেও রয়েছে এ ধরণের বাধা

নিষেধ। প্রায় সকল মতবাদই রয়েছে এ ধরণের ৰাধা-নিষেধের বেড়াজাল। কিন্তু আনন্দমার্গে তা নেই। আধ্যাত্মিক অনুশীলন যা এতকাল গৃহীদের অনধিকারের বস্তু ছিল তা আয়ত্ব করবার জন্যে এখানে কাউকে সন্ন্যাস নিতে হয় না। আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যাপারে আনন্দমার্গে জাতি, বর্ণ বা স্ত্রী-পুরুষগত কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। গৃহী তার পারিবারিক আবহাওয়ায় বাস করে, তথা জীবিকার্জনে তৎপর থেকেও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে-এ কথা ইতোপূর্বে আর কেউ ভাবতে পারেন নি। কিন্তু আনন্দমার্গের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় এ জিনিসও সম্ভব হ'ল।

আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয় সেই পরম শাশ্বত সত্তারই বিকাশ। তাই তৎ-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকেই ঈশ্বরারাধনা মনে করে সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হবে। ব্রহ্ম সর্ব-ব্যাপক, তাই তাঁর উপলব্ধির জন্যে কাউকে ঘর বাড়ী ছেড়ে হিমালয়ে যেতে হবে না। আমরা যা কিছু করি, দেখি, শুণি বা উপলব্ধি করি তা ব্রহ্মময়-এ একটা মহৎ ভাবনা। এ ধরণের বৈপ্লবিক দর্শন এ পর্যন্ত আর কোন মনীষী প্রচার করেননি।

প্রচলিত দার্শনিক, অর্থনৈতিক তথা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আনন্দমার্গ সম্পূর্ণতই একটা স্বতন্ত্র জিনিস। একে গণ-

জীবনের মানসিক, অর্থনৈতিক তথা সামাজিক মানের ক্রমোন্নয়ন–সঞ্জাত জিনিস বলা চলে না–এ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে এক নূতন ও বৈপ্লবিক জীবনাদর্শ যার সঙ্গে অতীতের বা বর্তমানের আর কোন আদর্শের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। এ পরিবর্তন কালিক পরিবর্তন–সাপেক্ষ জিনিসও নয়। এখানে যা কিছু বলা হয় বা অনুশীলন করা হয় তা সবই নূতন, এই বৈপ্লবিক আদর্শ মানব–জীবনকে বাস্তববাদী করে তোলে। গৃহ–সংসার ত্যাগ করে এক বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করা অপেক্ষা পারিবারিক জীবনে কী করে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয় তা মানুষ এখানে শেখে। জীবনের সর্বস্তরের উপযোগী তথা সামুহিক জীবনের সহায়ক আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার মহান প্রচেষ্টায় আনন্দমার্গ ব্রতী হয়েছে। নিম্নোক্ত শ্লোকের আবৃত্তি থেকেই বোঝা যায় যে গোটা মানব সমাজকে তথা জীব–সমাজকে একতাসূত্রে আৰদ্ধ করার ভূমিকায় আনন্দমার্গের দৃষ্টিভঙ্গী কত উদার ও বাস্তবধর্মী।

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।

দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ।।

সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।

সূচীপত্র

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ” ।

ধর্ম কী?

ক্রমবিবর্তনের চরম পরিণতি মানুষ অণুচৈতন্যের ব্যাপক স্ফূর্ত্তি–নিৰন্ধন অন্যান্য জীবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মানুষ তার এই স্ফূর্ত চৈতন্যের সাহায্যে ভাল–মন্দের পার্থক্য নির্ধারণে তথা বিপন্মুক্তির পথ অন্বেষণে সক্ষম। কোন জীবই দুঃখদুর্দশাক্লিষ্ট জীবন চায় না। বস্তুতঃ মানুষের স্বভাবই হচ্ছে আনন্দের অন্বেষণ করা। এখন দেখা যাক্ এই আনন্দ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মানুষ কী করে, আর তাতে তা' লব্ধ হয় কি না।

আনন্দের অন্বেষণে মানুষ প্রথমতঃ পার্থিব ভোগের দিকেই আকৃষ্ট হয়–এষণার নিবৃত্তির জন্যে সে ধন আহরণ করে, ক্ষমতা–প্রতিপত্তি অর্জনে তৎপর হয়; কিন্তু এ সকল জিনিস তাকে আনন্দ দিতে পারে না। যার আজ একশত টাকা আছে সে চায় লক্ষ টাকার মালিক হতে। চাহিদার এরূপ ক্রমবর্ধমান

গতি অব্যাহতই থেকে যায়। আবার যে আজ নিজের জেলায় প্রতিপত্তি অর্জন করেছে সে চায় প্রদেশজোড়া প্রতিপত্তি, অনুরূপভাবে প্রাদেশিক নেতারা চান রাষ্ট্রনেতা হতে, আর রাষ্ট্রনেতা হবার পরেও তাঁদের মনে বিশ্ব-নেতা হবার বাসনা জেগে বসে। অর্থাৎ সীমিত সম্পদ, মান-যশ, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি এগুলো মানুষের বাসনার নিবৃত্তি ঘটাতে পারে না, বরং ভোগের প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়েই দেয়, আর এতে করে মানুষের অনন্ত ক্ষুধা অতৃপ্তই থেকে যায়।

প্রাপ্তির ঐশ্বর্য যতই মহান হোক না কেন, অনন্ত সুখের পিয়াসী মানব-মনকে তা' পরিতৃপ্ত করতে পারে না। যারা ধন-মান, খ্যাতি-যশ প্রভৃতির পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হয় তারা এগুলো অনন্ত পরিমাণে না পাওয়া পর্যন্ত কখনও তৃপ্ত হতে পারে না। কিন্তু গোটা পৃথিবীটাই একটা সীমিত সত্তা, তাই তৎ-সাপেক্ষ পার্থিব জিনিস অবশ্যই সীমিত। এগুলো অনন্ত পরিমাণে আহরণ করাও সম্ভব নয়। সুতরাং পার্থিব মহান প্রাপ্তি তা' যদি ভূমণ্ডলও হয় তাহলেও অনন্ত ও শাশ্বত নয়। তাহলে সেই শাশ্বত সত্তাটি কী যা মানুষকে চিরন্তন সুখ দিতে পারে?

ভূমাসত্তাই কেবল অনন্ত ও শাশ্বত, আর তাঁর উপলব্ধিতেই মানুষের অনন্ত ক্ষুধার পরমা নিবৃত্তি সম্ভব। নশ্বর পার্থিব মানৈশ্বর্য, ক্ষমতাপ্রাপ্তি মানুষকে এই স্থির সিদ্ধান্তেই নিয়ে আসে যে সান্ত–সীমিত পৃথিবীর কোনো কিছুতেই তার অনন্ত সুখলাভের চিরন্তন স্পৃহার শাশ্বতী তৃপ্তি হতে পারে না–হতে পারে কেবল সেই বিভু সত্তা ব্রহ্মের উপলব্ধিতে। বস্তুতঃ মানুষের অনন্ত ভোগবাসনার পশ্চাতে এই ব্রহ্মোপলব্ধির বাসনাই প্রচ্ছন্নভাবে থেকে যায়। অতএব ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মানুষের ধর্ম, আর জীবমাত্রেরও তা–ই স্বভাব।

ধর্ম শব্দের অর্থ হ'ল সত্তাগত বৈশিষ্ট্য বা গুণ। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল 'নেচার', characteristic বা property। আগুনের ধর্ম বা স্বভাব দহন করা। আগুন ও তার ধর্ম এ দুটো জিনিস যেমন অবিচ্ছেদ্য, মানুষ ও তার ধর্ম ব্রহ্মানুসন্ধিৎসা–এও ঠিক তেমন ধারা জিনিস।

চৈতন্যের স্ফুটতর অভিব্যক্তিতেই মানুষের মধ্যেকার পশুত্বের মান সূচিত হয়ে থাকে, সৃষ্টির ক্রমোন্নতির ধারায় পশুজীবন থেকে মানব জীবনের বিকাশ ঘটে থাকে, আর তাই মানব জীবনে বৃত্তির দ্বিমুখী গতি পরিদৃষ্ট হয়। জড়াভিমুখী গতি তাকে পশুত্বের দিকে টেনে নিয়ে যায়, আর

তদ্বিপরীত সূক্ষ্মধর্মী গতিই তাকে পশুত্বের গ্লানি থেকে মুক্তি দেয়। পশুজীবনে পশুত্বের ব্যাপক বিকাশ দৃষ্ট হয়, আর চৈতন্যের স্ফুটতর অভিব্যক্তি-নিৰন্ধন মনুষ্য-জীবনে বিচার বিবেচনারও মহত্ব পরিলক্ষিত হয়। পশুত্বের প্রাবল্যে মানুষ পানাহারাদি যে সকল স্থূল ভোগের দিকে আকৃষ্ট হয় তারা কখনো তার অনন্ত ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটাতে পারে না। পশুদের ভোগ-স্পৃহা অনন্ত নয় বলে তারা এ সকল সীমিত ভোগ্যে পরিতৃপ্ত হয়-অপর্যাপ্ত ভোগোৎপাদান থেকেও পশুরা তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত গ্রহণ করে না। কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় মানুষ নিশ্চয় তা করে না। এ থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে পশুদের ভোগাকাঙ্ক্ষা সীমিত, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা' অনন্ত। উভয়ক্ষেত্রেই পশুত্বকে কেন্দ্র করেই ভোগাভিমুখী গতির অভিব্যক্তি হয়ে থাকে। মানুষের বিকশিত চৈতন্যই এতদুভয়ের মধ্যে এই বিভেদের সৃষ্টি করে। এই বিকশিত চৈতন্য-সাপেক্ষ অনন্ত-সুখ-প্রাপ্তির অনন্ত ক্ষুধা নশ্বর, সীমিত ও তা' পার্থিব সুখৈশ্বর্য-ক্ষমতা-প্রতিপত্তি প্রভৃতিতে নিবৃত্ত না হয়ে তাকে উত্তরোত্তর ব্রহ্মানন্দের দিকেই আকৃষ্ট করতে থাকে।

মানুষের মধ্যে পশুত্ব ও বিবেকের মধ্যে সর্বদাই সংঘর্ষ হয়ে চলেছে। পশুত্ব তাকে প্রপঞ্চাত্মক ভোগে উৎসাহিত করে আর অতৃপ্ত ও জাগ্রত বিবেক তার ব্রহ্মাভিমুখী গতি অব্যাহত রাখে। ক্ষমতা-প্রতিপত্তি দ্বারা আহৃত ভোগ্য-সামগ্রী যদি অসীম ও অনন্ত হত তাহলে তারা অবশ্যই আনন্দভিলাষী বিবেকের চিরন্তন অনুসন্ধিৎসার অবসান ঘটাতে সক্ষম হত কিন্তু তারা তা' নয় বলে নশ্বর পার্থিব ভোগের চরম মর্যাদাও মানুষের মনে শাশ্বতী শান্তির প্রতিষ্ঠা করে তাকে ভূমানন্দে অধিষ্ঠিত করতে পারে না।

চৈতন্যের স্ফুটতর অভিব্যক্তিই মানুষ ও পশুর পার্থক্য সূচিত করে। তাহলে এই চৈতন্যের সদ্ব্যবহার কি মানুষ মাত্রেরই একান্ত করণীয় নয়? তার চৈতন্য বা বিবেক যদি পশুত্বের আড়ালে প্রসুপ্তই থেকে যায় তাহলে তার আচরণ অবশ্যই পশুস্তরে নেৰে আসতে বাধ্য। বস্তুতঃ সে পশুরও অধম হয়ে পড়ে, কেননা অভিব্যক্ত চৈতন্যের অধিকারী হয়েও সে তার সুযোগ গ্রহণ করে না। এরূপ ব্যষ্টি নিশ্চয়ই মনুষ্য নামের অযোগ্য-এরা মানবাধারে এক একটি পশুবিশেষ।

চৈতন্যের ধর্মই হ'ল অখণ্ডসত্তা ব্রহ্মের পানে ধাবিত হওয়া। অভিব্যক্ত চৈতন্যের প্রেরণাকে কার্যান্বিত করে যারা

মনুষ্য নামের সার্থকতা বহন করে তারা অবশ্যই দেখৰে যে তাদের সকলের লক্ষ্যই সেই এক অদ্বিতীয় অনন্ত ব্রহ্ম। ব্রহ্মসম্প্রাপ্তির এই এষণাই হ'ল মানুষের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য, গুণ বা ধর্ম।

ইচ্ছার পরিপূর্তিই হ'ল আনন্দ। ঈপ্সিত বস্তু না পেলে দুঃখের গ্লানিতে মানুষের মন ভরে ওঠে। স্ফুটতর চৈতন্যই মানুষকে পশুজীবনের গ্লানি থেকে অব্যাহতি দেয় ও ব্রহ্মানুশীলনে তৎপর করে। তাই ব্রহ্মসম্প্রাপ্তিতে বা তৎপ্রচেষ্টায় সংলগ্ন হয়েই মানুষ. যথার্থ আনন্দ লাভ করে। এভাবে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে অনন্তকে বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করাই হ'ল বিশ্ব মতবাদ বা মানব-ধর্ম। কেবল এই ধর্মের অনুশীলনেই মানুষের শাশ্বত সুখ বা পরমা শান্তি লাভ সম্ভব।

অহিংসা ও সত্য

তোমরা জান যে যমের অঙ্গ পাঁচটি। "অহিংসাসত্যাস্তেয়ংব্রহ্মচর্যোহপরিগ্রহাঃ যমাঃ।" অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ–এই পাঁচটি অঙ্গই বিভিন্ন ভাবে সাধককে সংযম শিক্ষা দেয়। তোমরা নিশ্চয়ই জান, 'সংযম' শব্দের অর্থ হ'ল নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। এ কথা স্পষ্ট করে মনে রেখো সংযম মানে কোন কিছুকে হত্যা বা নষ্ট করা নয়। আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয় 'অহিংসা'।

অহিংসাঃ "মনোবাক্কায়ৈঃ সর্বভূতানামপীড়নমহিংসা।" মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা কারও ওপর পীড়ন না করার নামই অহিংসা।

এই 'অহিংসা' শব্দের অর্থ নিয়ে অনেকেই নানান রকমের ভুল করে বসে। কোন কোন পণ্ডিত 'অহিংসা' শব্দের এমন ধারা ব্যাখ্যা করে থাকেন যাকে যথাযথভাবে রূপ দিতে গেলে ঘর–সংসারে বাস করা তো দূরের কথা, বনে–জঙ্গলে পর্বত–কন্দরে বাস করাও অসম্ভব। এই জাতীয় অর্থ অনুযায়ী 'অহিংসা' মানে কাউকে হত্যা করা তো চলৰেই না, শত্রুকে আঘাত করাও চলবে না। ভূ–নিম্নস্থ কীটাদির মৃত্যু–সম্ভাবনা থাকায় হলাকর্ষণও চলবে না। এঁরা বিধান দেন, ধর্মজীবন যাপনেচ্ছু ব্যষ্টি প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকবার উদ্দেশ্যে নিজে

হলাকর্ষণ না করে শূদ্রকে দিয়ে কৃষিকার্য করাবে। মানুষ খেতে পাক বা না পাক, পিঁপড়ের গর্তে চীনী ঢেলে দিতে হবে অথবা মনুষ্যের জাতশত্রু মৎকুনকুলকে বাঁচাবার জন্যে সুস্থ দরিদ্রের দেহ থেকে রক্তমোক্ষণ করতে হবে।

তোমরা জেনে রেখে দাও, এটা অহিংসার ব্যাখ্যা নয়–অপব্যাখ্যা, এটা বাস্তব ধর্মবিরোধী–জৈব ধর্মবিরোধী। তোমার শ্বাস–প্রশ্বাস ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে অজস্র জীবাণুর আগমন–নির্গমন হচ্ছে তারাও সকলে জীবিত প্রাণী, তাদের বাঁচাবার স্বার্থে তাহলে তোমাকে শ্বাস–প্রশ্বাস ক্রিয়াও ছেড়ে দিতে হয়, রোগসঞ্জাত বিভিন্ন প্রকারের বিষবাহী অণুজীব সমূহকে শরীর থেকে তাড়াবার জন্যে ঔষধ সেবনও বন্ধ করে দিতে হয়। অহিংসার এই রকম অর্থটি নিতে গেলে এই তথাকথিত অহিংসার প্রবক্তারা দাঁড়াবেন কোথায় বল তো! বিশুদ্ধ জলপান ত্যাগ করতে হবে তাঁদের, কারণ জলের বিশুদ্ধীকরণের প্রক্রিয়ায় বহু দূষিত জীবাণুর মৃত্যু ঘটে থাকে। তাঁদের অবিশুদ্ধ জলও ত্যাগ করতে হবে, কারণ মানুষের উদরে গিয়ে অপরিচ্ছন্ন জলের কীটাণুসমূহের হয়তো মৃত্যু ঘটবে।

এই জাতীয় অহিংসা বৈদিকোত্তর যুগে ভারতবর্ষে বেশ কিছুদিন ধরে প্রচারিত হ'ত যার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। অহিংসাকেন্দ্রিক ধর্মকে জনসাধারণ বেশ ভয়ের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেছিল ও শেষ পর্যন্ত ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে নাস্তিকতাবাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। যারা নাস্তিক হয়েছিল সেই নীতিজ্ঞানবিবর্জিত ব্যষ্টিস্বার্থকেন্দ্রিক মানুষগুলো সমাজের তথা জগতের পক্ষে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর যারা এই তথাকথিত অহিংসাকেন্দ্রিক ধর্মকে জোর করে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছিল তারা বাস্তবতাবিমুখ ক্লীবোচিত স্বভাবযুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।' আজকের দিনে অতীতের এ ঐতিহাসিক তথ্যটুকুকে নতুন করে চিন্তা করে দেখবার প্রয়োজন অত্যন্ত উগ্রভাবে দেখা দিয়েছে।

এর পরে আরও একটা যুগ এসেছিল যখন জনসাধারণের মধ্যে অহিংসার আরও নূতন রকমের ব্যাখ্যা প্রচার করা হয়েছিল। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী জীবকে যে কোন প্রকারের ক্লেশ দেওয়াই হিংসা বটে কিন্তু খাদ্যার্থে পশুহত্যা হিংসা বলে গণ্য নয়। এখানেও বিচারে মস্ত বড় গলদ রয়ে গেছে। ক্লেশ দেওয়া মাত্রকেই যদি হিংসা ৰলি তাহলে খাদ্যার্থে পশুহত্যা

নিশ্চয়ই হিংসা পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে, কারণ সেক্ষেত্রে পশু নিশ্চয়ই হাসিমুখে যূপকাষ্ঠে মাথা গলিয়ে দেয় না।

আজকালকার দিনে অহিংসার আরও একটা নবতর ব্যাখ্যা শোণা যায় যা কতকটা দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিরই পর্যায়ভুক্ত। তবে দ্বিতীয়টিতে যে সরলতা বা নিষ্ঠার পরিচয় আছে এটিতে তাও নেই। এতেও অহিংসার মানে ধরা হয় শক্তির অপ্রয়োগ (non–violence)। এ জাতীয় ব্যাখ্যাতেই হয়তো 'অহিংসা' শব্দের সব চাইতে কদর্থ করা হয়েছে। জগতের ছোট–বড় প্রতিটি কাজেই জীবকে প্রতিকূল ভাবের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করেই এগিয়ে যেতে হয়। এই শক্তি–সম্প্রয়োগের মাধ্যমেই জীবনের আলোক প্রবাহ ঝলমলিয়ে এগিয়ে যায়। শক্তিসম্প্রয়োগ না থাকলে জড়তার অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান মানুষই তা পারে না, কারণ জিনিসটা তার গতিধর্মবিরোধী।

এর ফলে হয় কী! না, non–violence অর্থবাহী তথাকথিত অহিংসা মতবাদকে অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করবার খাতিরে এই সকল অহিংসাবাদীদের প্রতি পদে কপটাচরণ বা হিপোক্রিসির আশ্রয় নিতে হয়। কোন দেশের লোক যদি অপর একটা দেশকে জবরদখল করে সেক্ষেত্রে

বিজিত দেশের অধিবাসীরা শক্তি সম্প্রয়োগের দ্বারা স্বাধীনতা পুনরর্জন করবে। এই শক্তি–সম্প্রয়োগ স্থূলও হতে পারে সূক্ষ্মও হতে পারে, আর এর ফলে আক্রমণকারীর শরীর ও মন দুইই আহত হতে পারে। আঘাত এতে হবেই, আর আঘাতই যখন হ'ল তখন তাকে কিছুতেই অহিংসা বলতে পারি না। হাতে না মেরে ভাতে মারাটা কি হিংসা নয়? দেশবিশেষ বা জাতিবিশেষের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন কি হিংসা নয়? তাই বলি non–violence ও অহিংসাকে এক করে দেখতে গেলে সেই অহিংস নীতির সমর্থনে বার বার কপটাচরণের পরিচয় দিতে হয়। দেশ শাসন করতে গেলে পুলিশ বা সৈন্যৰলের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে। তারা যদি প্রয়োজনৰোধে শক্তি–সম্প্রয়োগে বিরত হয় তাহলে তাদের অস্তিত্বের সার্থকতা থাকে কি? বুলেটে অহিংসার ছাপ মেরে দিলেই তো আর বুলেট অহিংস হয়ে যায় না।

অত্যাচারকারীকে প্রতিহত করবার জন্যে যতটা শক্তি–সম্প্রয়োগের প্রয়োজন ততটা শক্তি যার নেই তার উচিত সর্বতোভাবে শক্তিসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হওয়া ও অর্জিত শক্তিকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা। শক্তি নেই, শক্তিসঞ্চয়ের সাধনা নেই, অথচ নিজেদের এই সকল দুর্বলতা প্রতিপক্ষের কাছে

স্বীকার না করার উদ্দেশ্যে নিজেকে অহিংস বলে জাহির করায় হয়তো কূটনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে, কিন্তু তাতে সাধুতার সম্মান রক্ষিত হয় না।

সাধনা–জগতে অহিংসার যা' প্রকৃত অর্থ তা' আগেই বলেছি। এই অর্থ অনুযায়ী তোমাকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে' চলতে হবে যে তোমার কাজ বা চিন্তার দ্বারা আর কেউ তো অত্যাচারিত বা পীড়িত হচ্ছে না। যেখানেই তোমার চিন্তা বা ক্রিয়া কাউকে পীড়ন করবার মতলবে সৃষ্ট বা পুষ্ট হচ্ছে তা–ই হিংসা পর্যায়ভুক্ত। জীবদেহ ধারণের জন্যে জীবহত্যা অনিবার্য্য, এখানে কোন পীড়নের মতলব থাক বা না থাক। তোমার শ্বাস–প্রশ্বাস ক্রিয়ায় হাজার হাজার জীবাণুর মৃত্যু হচ্ছে। তোমার স্থূল দেহ হাজার হাজার জীবকোষের সামবায়িক সৃষ্টি। তোমার শরীরের প্রতিটি কার্যের ফলে প্রতি মুহূর্তে তোমার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তারা মরে ঝরে পড়ছে। শরীরকে রোগমুক্ত করবার জন্যে ঔষধ প্রয়োগ করে তুমি লক্ষ লক্ষ রোগ–জীবাণুকে হত্যা করছ; পোকা–মাকড়কে, শস্যনষ্টকারী পশুকে, ছারপোকা–মশা–মাকড়সাকে কত ভাবে হত্যা করছ। এগুলোর প্রত্যেকটিই তোমার দেহাধরণ–যজ্ঞের অঙ্গমাত্র। এগুলোর কোনটাই পীড়নেচ্ছা–প্রণোদিত নয়। তাই এ

কাজগুলো হিংসাও নয়। দেহ রক্ষা করতে হলে এ কাজগুলো তো করতেই হবে।

জীবদেহের সৃষ্টি-স্থিতি-সংঘাতে প্রতি মুহূর্তে জীবদেহে সঞ্চয় ও অপচয় ঘটে চলেছে। তুমি যে ভাত খাও সেই ভাতের সম্ভাবনা যে ধানের মধ্যে ছিল- সেই ধানও কি জীব নয়? তার মধ্যেও কি অঙ্কুর সৃষ্টির মাধ্যমে বংশবৃদ্ধির সামর্থ্য ছিল না? কিন্তু দেহরক্ষার খাতিরে তুমি সেই ধানকে হত্যা করে চাল তৈরী কর। কিন্তু এই চাল তৈরী করবার সময়ে তোমার মনের মধ্যে কি কাউকে পীড়ন করবার মতলব থাকে? তাহলে দেখলে প্রাণীর খাদ্য প্রাণীই। সেখানে হিংসা-অহিংসার প্রশ্নই উঠতে পারে না। যদি ওঠে তাহলে জীবকে ইট, বালি, পাথর খেয়ে থাকতে হয়....... শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া ছেড়ে দিতে হয় অর্থাৎ আত্মহত্যা করতে হয়।

অবশ্য এ কথাটা খুবই ঠিক যে খাদ্যগ্রহণকালে দু'টি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। প্রথমটি হ'ল খাদ্য নির্বাচন যতদূর সম্ভব অবিকশিত চৈতন্য জীবের মধ্য থেকে (অর্থাৎ শাক-সব্জী পাওয়া গেলে পশুহত্যা না করে) করা উচিত, আর দ্বিতীয় কথা হ'ল যে কোন অবস্থাতে কোন জীবকে (তা বিকশিতচৈতন্যই হউক আর অবিকশিতচৈতন্যই হোক)

খাদ্যার্থে হত্যা করার আগে ভেবে দেখতে হবে যে একে হত্যা না করেও আমি সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে পারি কি না।

মানুষের শরীর অজস্র জীবকোষের সমবায়ে তৈরী। এই জীবকোষগুলি অনুরূপ 'জীবিত সত্তার সাহায্যেই পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়ে থাকে। তাই তুমি যেমনধারা খাদ্য গ্রহণ করবে তোমার শরীরস্থ জীবকোষসমূহ তদনুরূপ স্বভাব পেতে থাকবে, আর শেষ পর্যন্ত তাদের মিলিত প্রভাব তোমার মনের ওপরও নিশ্চয়ই কিছুটা পড়বে। তাই গলিত দুর্গন্ধযুক্ত জৈব বস্তু থেকে অথবা হীনবৃত্তি–প্রবন টাটকা পশুমাংস থেকে নিজের দেহকোষগুলি যদি তৈরী কর সেক্ষেত্রে তোমার মনে হীনবৃত্তির প্রাবল্য দেখা দেওয়াটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে হিংসা বা অহিংসার প্রশ্ন না থাকলেও বিচার–বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে "যা পাই তাই খাই" নীতি কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। "যা ইচ্ছা যায় তাই করি" নীতি তো তোমার নয়। তুমি বিচার খাটিয়ে নীতি নির্দ্ধারণ কর। তাই শরীর–ধর্মের অনুশীলনে খাদ্য গ্রহণকালে তোমাকে একটা নীতি মেনে চলতেই হবে। অন্যথায় কাজটা অপরিগ্রহবিরোধী হয়ে দাঁড়াবে।

হিংসা আর শক্তি–সম্প্রয়োগ দু'টো অবশ্যই এক জাতীয় নয়। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে শক্তি–সম্পয়োগের পরিণাম

হিংসাপূর্ণই হয়ে দাঁড়ায় যদিও সেই সম্প্রয়োগগুলো পীড়নের উদ্দেশ্যে করা হয় না। এই জাতীয় হিংসা পরিণামী শক্তি সম্প্রয়োগ যাদের বিরুদ্ধে অবস্থার চাপে পড়ে করতে হয় সংস্কৃত ভাষায় তাদের 'আততায়ী' বলা হয়।

"ক্ষেত্রদারাপহারীশ্চ শস্ত্রধারী ধনাপহাঃ।
অগ্নিদগরদশ্চৈব ষড়েতে হ্যাততায়িনঃ।।"

অর্থাৎ যে জবরদস্তি করে' তোমার ভূ-সম্পত্তি দখল করতে চায়, যে তোমার পত্নীকে অপহরণ করতে চায়, যে অস্ত্রের সাহায্যে তোমাকে হত্যা করতে এসেছে, যে তোমার ধনাপহারী, যে গৃহে অগ্নিসংযোগ করতে এসেছে অথবা বিষ প্রয়োগ করে তোমাকে হত্যা করতে চায়-এই ষড়বিধ দোষের যে কোন একটি দোষ থাকলেই তাকে 'আততায়ী' বলা হয়। তাহলে বুঝলে, যদি কোন ব্যষ্টি বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কেউ অপর কোন রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে জবরদখল করে সেক্ষেত্রে সেই আক্রমণকারী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া মোটেই অহিংসানীতি-বিরুদ্ধ নয়। বরং এরূপ ক্ষেত্রে অহিংসা নীতির ভুল ব্যাখ্যা করলে অর্থাৎ হিংসা আর শক্তি-সম্পয়োগকে এক করে ফেললে

জনসাধারণকে দীর্ঘকাল ধরে অর্থনাশ, মনস্তাপ ও অন্যান্য বহু প্রকার বিপর্যয়ে ভুগে মরতে হয়।

অনেক সময় দেখবে, কোন কুসংস্কারপন্থীকে যুক্তি দিয়ে না বুঝিয়েই অনেক লোক তার মনে আঘাত দিয়ে কথা বলে বা কাজ করে। যারা মূর্তিপূজাবিরোধী, ইতিহাসের পুরোণো পাতা উল্টালে দেখবে, অনেক সময় তারা কারুকার্যখচিত অপূর্ব শিল্পনিদর্শনমণ্ডিত সুন্দর সুন্দর মন্দির ধ্বংস করেছে। মানস সুষমার সুন্দর অভিব্যক্তি, কলাশিল্পের অপূর্ব সৃষ্টি সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি ভেঙ্গেচুরে নষ্ট করে দিয়েছে। এই রকমের প্রত্যেকটি কাজই গুরুতর রকমের হিংসামূলক কাজ, কারণ এতে করে মূর্তিপূজকের মনে বড় রকম চোট লাগে, যার ফলে তারা মনে মনে মূর্তিপূজা অর্থহীন জেনেও জেদের বশে মূর্তিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। এর ফলে শুধু তাদেরই আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হয় না, সমগ্র মানব সমাজেরই অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। মনে রেখো, কোন দেশ বিশেষের শতকরা একশ' জন লোকেও যদি নিরাকারবাদী হয় অর্থাৎ মূর্তিপূজক গোণা একজনও না থাকে সেক্ষেত্রেও বস্তুর উপযুক্ত ব্যবহারের খ্যাতিরে ব্রহ্মচর্য–সাধক সেই মূর্ত্তিকে সযত্নে প্রত্নতত্ত্বাগারে রক্ষা করবে, কিছুতেই তা' বিনষ্ট করবে না।

কলাকে ধ্বংস করতে গেলে মানব মনের সূক্ষ্ম রসবোধটুকু ধ্বংস করে দিতে হয় যা কিছুতেই করা চলবে না।

যার শিখা বা উপবীতের ওপর মোহ রয়েছে তার মন একটা জড় বস্তুতে আটকে থাকায় সাধনায় অগ্রগতি অবশ্যই ৰাধাপ্রাপ্ত হৰে। কেউ যদি জোর করে তার শিখা বা উপবীত সরিয়ে দিতে চায় তাতে কি বিশেষ কিছু লাভ হবে? –না, তাতে করে তার মন শিখা–উপবীতের চিন্তায় এত বেশী ব্যস্ত থাকৰে যে তার ফলে ব্রহ্মসাধনাই ঠিকভাবে করবার সময় পাৰে না। তার চাইতে বরং ব্রহ্মভাবনা নিতে নিতে মন যখন বৃহতের ভাবনায় ব্যস্ত হতে থাকৰে তখন আপনা থেকেই শিখা–সূত্রের সঙ্কীর্ণতা মন থেকে সরে যাবে আর সেই অবস্থাতেই তার পক্ষে শিখা–সূত্র সত্যিকারের ত্যাগ করা সম্ভব হবে।

যম–সাধনার 'অহিংসা' অঙ্গটা এবার নিশ্চয়ই ভাল করে বুঝেছ। এখন বলো দেখি, পিতা–মাতা যে পুত্রকে শাসন করেন সেটা হিংসা, না অহিংসা? না, সেটা হিংসা নয় কারণ সেখানে পীড়ন করা বা কষ্ট দেওয়ার ভাব একেবারেই নেই। ষোল আনা ভাবটাই হচ্ছে সংশোধন করার–কাঁদিয়ে কষ্ট দেবার নয়। চোর–ডাকাত, সাধু–মিত্র যেই হোক না কেন,

সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষা নিয়ে যার বিরুদ্ধে যে সংশোধনী ব্যবস্থাই- গ্রহণ করবে সেটা আপাতঃদৃষ্টিতে যতই কঠোর হোক না কেন, তা' হিংসা পদবাচ্য নয়। এবার বুঝলে, সত্যিকারের অহিংসা বাস্তব জীবনে মেনে চলা মোটেই কষ্টকর নয়।

খাদ্য হিসেৰে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, বিশেষ করে যে দেশে যথেষ্ট পরিমাণে শাক-সব্জী পাওয়া যায় সে দেশে আমিষ খাদ্য গ্রহণ করা অতিলোভের নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে শারীরিক প্রয়োজনে চিকিৎসকের বিশেষ নির্দেশে, রোগ মুক্তির পর পথ্য হিসেৰে যা ঔষধ-নির্মাণের উপকরণ হিসেৰে আমিষের ব্যবহার হিংসা বা লোভ বলে গণ্য হতে পারে না, কারণ সেক্ষেত্রে হিংসা-বৃত্তি বা লোভ-বৃত্তি কোনটাই কাজ করে না, কাজটা করা হয় নেহাৎই বেঁচে থাকবার তাগিদে, হিমপ্রধান দেশের মানুষ যে তাগিদে পশুমাংস ভক্ষণ করে, পশুচর্মে গাত্রাচ্ছাদন করে ও পশুমেদে প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকে।

আততায়ীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাতেই পৌরুষের পরিচয় মেলে। রামায়ণ মহাকাব্যের দিকে তাকাও, সেখানে রাম পত্নীহরণকারী রাবণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালিয়েছিলেন, প্রৰলভাবে শক্তি সম্প্রযোগ করেছিলেন। এতে করে তাঁর কাজ

কিছুতেই অহিংসানীতির বিরোধী হয় নি, কারণ তিনি তো পীড়নের উদ্দেশ্যে বা দেশ জয়ের উদ্দেশ্যে লঙ্কা আক্রমণ করেন নি।

মহাভারতের দিকে তাকাও। সেখানে মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে কৌরবদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে উৎসাহ দিয়েছিলেন কারণ কৌরবেরা ছিলেন ভূমি অপহরণকারী আততায়ী।

ধর্ম তথা সমাজ জগতের অন্যতম বিপ্লবী নেতা প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কেউই নিশ্চয়ই হিংসানীতি গ্রহণের অপবাদ দিতে সাহস করবে না। কিন্তু তিনিও অত্যাচারী কাজীর ওপর সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। হিংসা ও শক্তি-সম্প্রয়োগ যদি একই জিনিস হত তবে ক্ষমাঘনমূর্ত্তি মহাপ্রভু নিশ্চয়ই তা করতেন না।

আততায়ীর বিরুদ্ধে শক্তি-সম্প্রয়োগ করাতেই পৌরুষ, না করাই ক্লীবতা। তবে দুর্বল ব্যষ্টি নিজে সবল আততায়ীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করবার আগে নিজের সম্ভাব্য শক্তিটাও যেন যাচাই করে নেয়, অন্যথায় নিজের দুর্বলতা দূর না করে সংগ্রাম শুরু করলে অন্যায়েরই সাময়িক জয় হয়ে

থাকে। ইতিহাসে এ জাতীয় ভুলকে "রাজপুত নির্বুদ্ধিতা" (Rajput folly) বলা হয়। শক্তিশালী মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজপুতেরা সবসময়েই সাহসের সঙ্গে সংগ্রামে এগিয়ে এসেছে। তারা বীরোচিত ভাবে নিজেরা সংগ্রামে লড়ত বটে, কিন্তু নিজেদের শক্তি যাচাই করে নিয়ে লড়াইয়ে নাৰত না। তাদের নিজেদের মধ্যে ছিল অজস্র রকমের ভেদ, নানান রকমের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা। তাই লড়াইয়ে তারা হেরে যেত, বীরের মত মৃত্যুৰরণ করত।

আততায়ীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের আগে তাই উপযুক্ত শক্তিসঞ্চয় করা উচিত, কিন্তু আততায়ীর স্বভাব সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করার অর্থ জেনেশুণে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া। অবশ্য যেখানে দেখৰে তুমি শক্তি-সম্প্রয়োগ কর বা না কর, আততায়ী তোমাকে ধ্বংস করবেই, সেক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে সময়ের অপেক্ষা না করে অন্ততঃ একটাও মরণ-কামড় দিয়ে তারপরে মরাই বাঞ্ছনীয়।

সত্য: "পরহিতার্থং বামনসো যথার্থত্বং সত্যম্" অর্থাৎ পরহিতের উদ্দেশ্যে বাক্য ও মনের যে যথার্থ ভাব তারই নাম 'সত্য'। মনে রাখবে, 'সত্য' শব্দের কোন ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই। ইংরেজীতে যাকে true বা truth ৰলে তার

সংস্কৃত প্রতিশব্দ হ'ল 'ঋত'। সাধককে ঋতের অনুশীলন করতে বলা হচ্ছে না–ৰলা হচ্ছে সত্যের অনুসরণ করতে।

সত্যের বৈবহারিক অংশ হ'ল আপেক্ষিকতা–ভিত্তিক কিন্তু এর সম্যক্ প্রতিষ্ঠা পারমার্থিক তত্ত্বে........ সেই পরম ব্রহ্মে। তাই ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপ ৰলা হয়। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। সাধকের লক্ষ্য যদিও সেই পারমার্থিক তত্ত্ব তবুও সাধক–জীবনে তাকে অহরহই আপেক্ষিকতা নিয়ে কারবার করতে হয়। মানুষ বিচারশীল জীব। তাই যেখানে যেমনটি করা উচিত বা যেমনটি করলে মানুষের কল্যাণ হয় তেমন কিছু করবার সামর্থ্য কম আর বেশী প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছে। তেমন কিছু করা, বলা বা ভাবাকেই সাধনাজগতে 'সত্য' বলা হয়।

মনে কর, একজন মানুষ ভয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে তোমার কাছে এল। সে দোষী কি নির্দোষ তুমি জান না অথবা তুমি জান সে নির্দোষ। তার পেছনে আসছে এক শক্তিশালী দুর্দান্ত মানুষ তাকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে। এখন এই ভীত লোকটি যদি তোমার বাড়ীতে লুকোয় আর দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকটি এসে' যদি তোমাকে শুধোয়,"অমুক লোকটি কোথায় গেছে দেখেছ?” তুমি কী ৰলৰে? যদি ঋত বা

truth–কে মানতে হয় সেক্ষেত্রে তুমি বলৰে–দেখ, অমুক জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে। এর পরে দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকটি যদি তাকে হত্যা করে তাহলে তুমিও কি সেই হত্যাকাণ্ডের অংশভাগী হ'লে না? তোমার ভুলের ফলেই হয়তো একজন নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারাল। ঋত বা truth–কে মানতে গিয়ে তুমি হত্যাপরাধে পরোক্ষভাবে অপরাধী হয়ে রইলে। কিন্তু শাস্ত্রীয় অর্থে 'সত্য' শব্দকে মানতে গেলে এ জায়গায় তোমার কী কর্তব্য হবে? তোমার কর্ত্তব্য হবে, লোকটির সন্ধান না দেওয়া আর তার হিতার্থে আক্রমণকারী ব্যক্তিকে এমন একটা উল্টো পথ দেখিয়ে দেওয়া যার ফলে আশ্রিত ব্যক্তিটি নির্ভয়ে নিরাপদ স্থানে ফিরে যেতে পারে।

ধরো, তোমার মা খেতে বসেছেন। চিঠি এল, তোমার মাতামহের মৃত্যু হয়েছে। চিঠির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তোমার মা যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন সে অবস্থায় তুমি কি ৰলৰে? ঋতকে যদি মানতে হয় তাহলে মা হঠাৎ একটা প্রচণ্ড পিতৃশোক তো পাৰেনই, অধিকন্তু তাঁর আহারও নষ্ট হবে। এক্ষেত্রে তোমার উচিত হবে বলা যে মাতুলালয়ে সবাই সুস্থ আছেন। মায়ের আহারের পর প্রথমে মাতামহের অসুস্থতার কথা শুনিয়ে তাঁর মনকে সম্ভাব্য শোকবার্তা সম্বন্ধে কতকটা

সচেতন করে দিয়ে তারপরে মাতামহের মৃত্যুসংবাদ জানাৰে। এতে গোড়ার দিকে অনেকগুলো অনৃতের আশ্রয় নিতে হ'ল বটে কিন্তু এর ফলে সত্যেরই অনুশীলন করা হ'ল।

বৃহতের আকর্ষণ ও সাধনা

গত গোরক্ষপুর মহাচক্রে বলেছিলুম, জৈবী প্রগতির জন্যে অপরিহার্য্য তত্ত্ব হ'ল তিনটি–(১) জড় সংঘাত, (২) ভাব-সংঘাত ও (৩) বৃহতের আকর্ষণ।

তোমরা জান, যখনই সংঘাত বা সংঘর্ষ উৎপন্ন হয় তখনই সংঘর্ষিত বস্তুসমূহের সূক্ষ্মতা প্রাপ্তি ঘটে। একথা জড়-সংঘাতের ক্ষেত্রে যতখানি সত্য, ভাবসংঘাতের ক্ষেত্রেও ঠিক ততখানিই সত্য। সংঘর্ষের ফলে জড় মন যত বেশী সূক্ষ্মতা পেতে থাকে ততই তার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব বেশী জাগতে থাকে, ততই তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে থাকি।
চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে আছে–

"তুলা ধুনি ধুনি আঁসুরে আঁসু
আঁসু ধুনি ধুনি নিরবর সেসু।"

জড়-সংঘাতের ফলে তুলা ধুনতে ধুনতে শেষ পর্যন্ত তা আঁসে পরিণত হয় ও অধিকতর জড় সংঘাতের ফলে অর্থাৎ আঁসকেও যদি ধুনা যায় তা হলে শেষ পর্যন্ত তা তার সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়। মহাশক্তির লীলায় প্রপঞ্চ জড়-সংঘাতের ফলে মনে রূপান্তরিত হয় ও মন আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

(১) প্রতিসঞ্চর ক্রিয়ায় গোড়ার দিকে কেবল জড় সংঘাতই থাকে ও জড়-সংঘাতের অতিক্রিয়তায় মন উদ্ভূত হয়, যে মনে বহমানতা প্রাণক্রিয়ার দ্বারা জড়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। তাহ'লে আমরা দেখছি, এই পরিদৃশ্যমান জগতে সৃষ্টির প্রারম্ভিক কারণই হ'ল জড়-সংঘাত ও এর ফলে অচেতন বস্তু থেকে' চেতন বস্তু জন্মলাভ করে।

অবস্তু ৰলতে আত্মা, মহৎতত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব এই তিনকে বোঝালেও সূক্ষ্ম বিচারে একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মই অবস্তু পদবাচ্য।

সূচীপত্র

সংঘাত জড় বস্তুতে মানস বস্তুতে ও মানস বস্তুকে এই অবস্তুতে রূপান্তরিত করে দেয়। ভূমা মানসের কর্মভাব যখন বস্তু থেকে অবস্তুতে রূপান্তরিত হয় তখন সে আর কর্মভাব থাকে না, সে তখন ভূমার কর্তৃভাবে অথবা অকর্তা ভাবে স্থান লাভ করে। আপাতঃ দৃষ্টিতে অণুমানসের উদ্ভব জড় থেকে হলেও পারমার্থিক বিচারে অনুমানসের উদ্ভব ভূমামানস থেকে ই। কারণ আপাতঃ দৃষ্টিতে যে জড় থেকে তার সৃষ্টি সে জড়ও ভূমামানসের স্থূল তরঙ্গ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয় ও আপাতঃ দৃষ্টিতে আমরা যাকে জড় সংঘাত ৰলি ভূমার দৃষ্টিতে তা' ভূমার প্রত্যক্ষ ভাব সংঘাত ও অণুমাধ্যমে সৃষ্ট ভূমার পরোক্ষ ভাব-সংঘাত। তাই তথাকথিত জড়-সংঘাত যখন পুরুষভাবের নৈকট্য নিবন্ধন ভূমামানসের প্রত্যক্ষ ভাব-সংঘাতের দ্বারা অধিকতর অভিভূত হয়ে পড়ে জড়বস্তুর সেই অবস্থার নামই চেতন বস্তু। আর এই চেতন বস্তু ভূমার প্রত্যক্ষ তরঙ্গের দ্বারা আরও বেশী অভিভূত হয়ে পড়লে তখন সেই চেতন বস্তুকে বলতে পারি মানব-মন। লৌকিক জড়-সংঘাত, লৌকিক ভাব সংঘাত ও পারমার্থিক ভাব-সংঘাত তিনের প্রভাবে পড়ে যে মানব মন সৃষ্ট হয় তার জন্যে যে উপযুক্ত আধার ভূমার ভাব তরঙ্গ তথাকথিত প্রপঞ্চ থেকে

নির্বাচন করে' দেয় সেই আধারকেই ৰলি মানবীয় আধার বা মানব–দেহ।

তাহলে আমরা দেখছি মানবীয় আধারে তথা উন্নত চেতন বস্তু সমূহে জড়–সংঘাত ও ভাব–সংঘাত দুইই আছে। দুয়ের ফলেই তারা ক্রমশঃ প্রগতির পথে চলতে থাকে। কিন্তু অচেতন বস্তু (Inanimate object) সমূহে আছে কেবল জড়–সংঘাত, কারণ বস্তু মনের উদ্ধৃতির পূর্বে লৌকিক ভাব–সংঘাত উদ্ভব হওয়া সম্ভব নয়।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে আমরা দু'টো সংঘাতই দেখতে পাই। দুইই আমাদের এগিয়ে চলতে সাহায্য করে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও মানুষ জাতকে আমরা সাধরণতঃ দু'টো ভাগে বিভক্ত দেখি অন্ততঃ এখন দেখতে পাচ্ছি। এক ধরণের মানুষ যারা কেবল ভাব–সংঘাতকেই আহ্বান জানায় আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ যারা কেবল জড়–সংঘাতেই লিপ্ত হতে চায়। প্রথম শ্রেণীকে বলতে পারি ভাববাদী, দ্বিতীয়টিকে ভোগবাদী। জড়বাদী শব্দটির ব্যবহার ইচ্ছা করেই করলাম না। এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে ভাববাদী ও ভোগবাদী এরা উভয়েই সাধক, তফাৎ কেবল লক্ষ্যের। একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এ জগতে এদের উভয় পক্ষই

মানুষ সমাজের ক্ষতি করে' থাকে। মানুষকে এগোতে হবে দু'য়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রেখে, ভাবকে লক্ষ্য রেখে, জড়ের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে।

লৌকিক বিচারে সঞ্চর কালে আছে কেবল এক ধরণের জড় সংঘাত। কিন্তু প্রতিসঞ্চর কালে জড়–সংঘাত, ভাব–সংঘাত ও বৃহতের আকর্ষণ তিনই আছে। এই যে সংঘাতগুলো–এই সংঘাত কার সঙ্গে কার? বস্তুতঃ জড়–সংঘাত বা ভাব–সংঘাত যে নামই দিই না কেন, সংঘাত আসলে দু'টো মূলাশক্তির মধ্যে– একটা বিদ্যা, অপরটা অবিদ্যা, একটা ঋণাত্মিকা, অপরটা ধনাত্মিকা। সঞ্চরকালে ঋণাত্মিকাশক্তি বিদ্যার পরিমাপ যদি ৪০ ধরা হয় আর ধনাত্মিকা অবিদ্যাকে যদি ৬০ ধরা যায় তাহ'লে পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ ধনাত্মিকা–অবিদ্যা, অর্থাৎ সঞ্চরকালীন পরিণামভূতা শক্তি ২০ ধনাত্মিকা। সৃষ্টিলীলা ক্রমানুসারে সঞ্চরকালীন চিত্তাণু পুরুষোত্তমভাব থেকে' দূরে সরে' যেতে থাকে ও তার কারণ এই ২০ (ধরা যাক) ঋণাত্মিকা অবিদ্যাশক্তি। ঠিক তেমনি প্রতিসঞ্চরকালে ঋণাত্মিকা বিদ্যাকে যদি ৬০ ধরা যায়, ধনাত্মিক অবিদ্যাকে ধরা যায় ৪০, সেক্ষেত্রে পরিণামভূতা ঋণাত্মিকা বিদ্যার পরিমাপ দাঁড়ায় ২০

অর্থাৎ চিত্তাণু ক্রমশঃ পুরুষোত্তম ভাবের দিকে অর্থাৎ অবস্তু ভাবের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। বিরাটের চিত্তাণু লৌকিক জগতে জড়াণুরূপেই প্রতীয়মান হয় আর এই জড়াণুর অবস্তুর দিকে প্রত্যাগমনই জড়সংঘাত, ভাব–সংঘাত ও বৃহতের আকর্ষণ দ্বারা সংসাধিত হয়।

তাহলে আমরা দেখছি জড়–সংঘাতকে উৎসাহ দেওয়াও সাধনা। এই সাধনাকেই বলা হয় কর্মযোগ। এই কর্মযোগ মানুষকে তাই কেবল জড়বস্তুসমূহকে নিয়েই সাধনা করে যেতে হয়, যেমন জীব সেবা, জগৎসেবা ও জড়বিজ্ঞানের চর্চা (scientific research)। জড়–সংঘাতের দ্বারা বস্তুর আন্তর্পারমাণবিক দূরত্ব বেড়ে যায়। এর ফলে স্থূল জড়সত্তা মনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। জড়ের এই যে মনে রূপান্তরণ এটা সেই ২০ (ধরা যাক) ঋণাত্মিকা শক্তির সাহায্যেই ঘটে' থাকে আর তাই রূপান্তরণ কার্যে মানুষের বা জড় বিজ্ঞানের যত শক্তিই প্রযুক্ত হোক না কেন, তার কিছুতেই ওই ২০কে (ধরা যাক) ছাপিয়ে যেতে পারে না। যে সকল মানুষেরা কর্মযোগ বা জড়–সংঘাতের পথকেই বেছে' নিয়েছেন তাঁদের প্রতিসঞ্চরাকালীন পরিণামভূতা শক্তির প্রায় সবটুকুই জড়ের কাজে ব্যস্ত থাকে বলে' তাঁদের মনে জ্ঞানের স্থান তেমন

বিশেষ থাকে না কিন্তু ভক্তির স্থান অবশ্যই থাকে, কারণ যে পরিণামভূতা বিদ্যাশক্তির সাহায্যে যে জড়-সংঘাত করে' চলেছে সেই বিদ্যাশক্তির লক্ষ্য যে পুরুষোত্তম। তাই বিদ্যার স্রোতে যে চলেছে সে অবশ্যই ব্রহ্মভাবের দিকে চলেছে, আর এই ব্রহ্মভাবের দিকে চলাকে বা পুরুষোত্তমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়াটাকে ভক্তি আখ্যা অবশ্যই দিতে পারি। সংঘাতের ফলেই ৰোধ জেগে' ওঠে। শুধু মাত্র জড়-সংঘাতে যে ৰোধ জাগে সে ৰোধ জড়েতেই লিপ্ত হয়ে থাকে। তাই এই ৰোধকে জড়বুদ্ধি বলতে পারি। পশুসমাজে তথা অনগ্রসর মনুষ্য সমাজে এই জড় বুদ্ধিরই প্রভাব দেখা যায়। এমনকি প্রাগ্রসর মানুষ সমাজেও যারা নিরীশ্বরবাদী বা ভোগবাদী তাদের বুদ্ধিকেও জড়বুদ্ধি ছাড়া অন্য কিছু আখ্যা দিতে পারি না। এই ভোগবাদীরা নিজেদের বুদ্ধিগত দৈন্য লুকিয়ে' রাখবার জন্যেই আধ্যাত্মবাদকে অস্বীকার করতে চায়। এই অস্বীকৃতি তাদের দীনতারই প্রতীক। এতে তাদের গৌরব ফুটে ওঠে না। এতে অধ্যাত্মবাদেরও মর্যাদা কমে না। সংঘাতে ভক্তিরও স্থান রয়েছে।ভূমামানসে যত বস্তু উৎপন্ন হয়েছে তাদের মধ্যে যদি কোনও সামঞ্জস্যবিধায়কী শক্তি কাজ না করত তা হ'লে বিশ্বব্রাণ্ডের এই সংরচনা চুরমার হয়ে যেত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংরচনাকে ঠিকভাবে রাখবার জন্যেই প্রতিটি বস্তুর মধ্যে

পারস্পরিক আকর্ষণ রয়েছে, সকল অণু একে অন্যকে আকর্ষণ করে চলেছে। বৃহৎ প্রেমের দ্বারা তিনি প্রতিটি অণুসত্তাকে নিজের সঙ্গে বেঁধে রেখেছেন। যে বৃহৎ প্রেমের তরঙ্গে তাঁর রসসমুদ্র বয়ে চলেছে তাঁরই ক্ষুদ্র বিকাশ অণুরাও জন্মগত সূত্রে সেই প্রেমের অধিকারী হয়েছে। তাই আকর্ষণ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। জীবের এই আকর্ষণ যখন ক্ষুদ্র সত্তায় সীমিত থাকে তখনই তাকে তখনই তাকে 'কাম' বলি, আর যখন বৃহৎ সত্তার দিকে ছুটে' যায় তখন তাকে বলি 'প্রেম'। অবশ্যই একথা স্বীকার করতে হবে যে কাম প্রেমেরই ক্ষুদ্রতর রূপ। প্রেমের টানে জীব যখন বৃহতের পানে ছুটে যায় তখন এই ছুটে যাওয়াটার নামই ভক্তি। তাই বলছিলুম সংঘাতে যখন জীবের সূক্ষ্মত্বের দিকে যাওয়া সম্ভব তখন সংঘাত অবশ্যই ভক্তির পরিপোষক।

ভোগবাদীরা কামের সাধনায় রত। তারা জাতিবাদ (castism), জাতীয়তাবাদ (nationalism) সম্প্রদায়িকতাবাদ প্রভৃতিকে নিয়ে ব্যস্ত। তারা একটি বিশেষ সমাজের, বিশেষ রাষ্ট্রের, বা বিশেষ সম্প্রদায়ের লোককেই ভালবাসে। অন্য সমাজের অন্য রাষ্ট্রের বা অন্য সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি বিষোদ্গার করতে তাদের বিবেকে বাধবে না। তাহলে এটা

নিশ্চয় বুঝছ যে জাতিভক্তি, সমাজভক্তি বা দেশভক্তি জিনিসগুলোতে রয়েছে খণ্ড প্রেম বা কাম। এই ধরণের সীমিত প্রেমকে ভক্তি আখ্যা না দেওয়াই সঙ্গত। যিনি সত্যিকারের ভক্ত তিনি বিশ্বের প্রতিটি সত্তাকে সমানভাবেই ভালোবাসেন। ভোগবাদীরা বিশ্বপ্রেমের যে অভিনয় করে আসলে সেটা পরস্বাপহরণের ফন্দি ছাড়া আর কিছুই নয়।

(২) দ্বিতীয় তথ্যটি হ'ল struggle in intellectual plane–ভাব–সংঘাত। এই সংঘাতে মানুষ সম্পূর্ণভাবেই মানসিক তৃপ্তির (দেহ সম্পর্কিত নয়) জন্য কাজ করে যায়। জাগতিক স্থূল ভোগ্য বস্তু সে পেতে চায় না। সে মানসিক বস্তু চায়–নাম, যশ প্রাপ্তির আশায় সে কাজ করে যায়। তাই নিছক ভাব–সংঘাত হয়তো বা জড় সংঘাতের চেয়ে সূক্ষ্ম জিনিস কিন্তু এতেও মানুষ জাতের কতটা কল্যাণ হতে পারে? শিক্ষিত তথা বুদ্ধিমান লোককেও তাই দেখে থাকি টাকার লোভ না থাকলেও নাম–যশের লোভে অন্যের প্রতি অহরহঃ কর্দম নিক্ষেপ করে চলেছে। এই ধরণের ভাব–সংঘাত মানুষের মনকে সূক্ষ্মত্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে কি? সংঘাত বা সংঘর্ষের ফলে মনের অণু চূর্ণীকৃত হওয়ায় তাতে একদিকে যেমন মনের ব্যাপকতা আসে অন্যদিকে তেমনি লোভ রিপুর

অধীনে থেকে যাওয়ায় ধীরে ধীরে মন জড়ত্বের দিকে অর্থাৎ ঋণাত্মক প্রতিসঞ্চরের পথেই চলতে থাকে।

(৩) জড়-সংঘাত ও ভাব-সংঘাতের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করে অথবা অন্য কথায় জড়-সংঘাত ও ভাব-সংঘাতকে উৎসাহ দিয়েই চলতে হবে কিন্তু দেখতে হবে যেন 'বৃহৎ' আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়। এই ভাবে চলতে থাকলে যার মনে সূক্ষ্মত্ব তথা ব্যাপকত্ব অর্জিত হবে ক্ষুদ্র ভাবনায় সে অপরামৃষ্টই থাকবে। মানসাণু (চিত্তাণু) চূর্ণীকৃত হতে থাকবে আর সাধনাগ্নিতে সেই চূর্ণীভূত চিত্তাণু অদ্বৈততত্ত্বে স্থিতি লাভ করবে। তাই জড়-সংঘাত বা ভাব-সংঘাত বৃহতের আকর্ষণেই পরম চরিতার্থতা লাভ করতে পারে। বৃহতের আকর্ষণ ব্যতিরেকে জীবন-রসে কোন মাধুর্য থাকে না।

মন মানুষের সব চেয়ে বড় মিত্র, যদি সে সূক্ষ্মত্বের পানে এগিয়ে চলে। মন মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু যদি সে স্থূলত্বের দিকে পিছু হটে। ভাব-সংঘাতেই মানুষ আজকের দিনে এ্যাটম বম্ব তৈরী করেছে। তৈরী করেছে ভোগবাদী ভাবনা নিয়ে। তাই তার পরিণাম ভয়ঙ্কররূপে দেখা দিয়েছে। মনের ধ্যেয় যেমন হবে মনের সংরচনাও সেই ধরণের হতে থাকবে। মানস বিষয় যদি জড় হয় তা হলে তার ভাবনার

মনেরও আন্তরাণবিক দূরত্ব কমে গিয়ে মনও ক্রমশঃ জড় হতে থাকবে ও শেষ পর্যন্ত ধ্যেয় বিষয় ব্যতিরেকে অন্য কোন কিছুকেই সে মেনে নিতে চাইবে না। এই জন্যেই আমরা দেখে থাকি যে জড়াশ্রয়ী ইজমের সমর্থকেরা অন্যের যুক্তিপূর্ণ কথাও গ্রহণে অসমর্থ হয়ে পড়ে, আর নিজের যুক্তিহীন আচার অনুষ্ঠানকে চোখ–কাণ বুজে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। জড়ের ভাবনায় সংবেদন–সামর্থ্যও ধীরে ধীরে নষ্ট হতে বাধ্য। এই ধরে নেওয়া বিশ (২০) ঋণাত্মিকা শক্তির প্রয়োজন তার কাছে ক্রমশঃ ফুরিয়ে যেতে থাকে। সে বলতে থাকে অত সব সূক্ষ্ম জিনিস আমার জেনেই বা কী লাভ? ভেবেই বা কী লাভ? বেশ আছি। জড়ের ভাবনায় এই ধরণের মানুষকে বার বার জড় দেহ ধারণে বাধ্য করে।

ধ্যেয় যেখানে পরমাত্মা সেখানেই হ'তে থাকে জীবের নিরঙ্কুশ প্রগতি। বিষয় সূক্ষ্ম ও ব্যাপক থাকার জন্যে মনও ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক হতে থাকে ও শেষ পর্যন্ত তা নিখিল মানসে (Macrocosm) পর্যবসিত হয়। ভাব–সংঘাতকালে বা প্রতিসঞ্চর কালে যদি ধরে নেওয়া যায় যে জীব বিশ (২০– ধরা যাক) ঋণাত্মিকা শক্তির সাহায্যে এগোয় তাহলে বৃহতের ভাবনা নেওয়ার ফলে এই প্রতিসঞ্চরাত্মিকা গতিপ্রবাহের চেয়ে

তার গতিপ্রবাহ বেড়ে যাবে না কি? হ্যাঁ বেড়ে যায়, আর এটাকেই বলি বৃহতের আকর্ষণ। যে মানসিক মস্তিষ্ক তথা স্নায়ুপুঞ্জ যে ২০ (বিশ) ঋণাত্মিকা গতিপ্রবাহকে (ধরে নেওয়া যাক) স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিল তার পক্ষে তখন তাল সামলাতে কিছুটা অসুবিধা হয়। তাই অনেক সময়েই দেখা যায় যে সাধকের মধ্যে অশ্রু, পুলক-নর্ত্তনাদি স্পান্দনিক লক্ষণগুলো প্রকট হয়ে থাকে। এগুলো আর কিছুই নয়, বৃহতের আকর্ষণের পরিণাম। সে সকল সাধক এই দ্রুততর গতিকে মেনে নিতে সমর্থ তাদের মধ্যে এই ধরণের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় না।

বৃহতের আকর্ষণে এই চলা এটাই ভক্তি। কারণ এই চলাটা বৃহতের ভজনাতেই সম্ভব হয়। ভক্তি জড়-সংঘাতেও থাকতে পারে কিন্তু জড় সংঘাতের ভক্তি তামসিক ভক্তি। ভক্তি ভাব-সংঘাতেও থাকতে পারে কিন্তু ভাব-সংঘাতের ভক্তি রাজসিক ভক্তি। বস্তুতঃ এই ভাব-সংঘাতবাদী ভক্তের সঙ্গে নৈতিকতাবাদী ভক্তের তফাৎ অতি সামান্য। এই নৈতিকতাবাদী বা ভাব-সংঘাতবাদী সাত্ত্বিকী ভক্তির আস্বাদ পায় না কারণ তাদের মনে বৃহতের ভাবনা নেই, আছে ক্ষুদ্র ভাবনা বা এক ধরণের ব্যবসায়িক প্রয়াস। বৃহতের ভাবনাই

প্রকৃত শান্তির একমাত্র পথ। বৃহতের আকর্ষণই একমাত্র প্রেমপদবাচ্য। তিনি সকলকেই নিজের দিকে আকর্ষণ করে চলেছেন। কাউকেই ভুলে থাকেননি, ভুলে থাকতেও পারেন না। কিছু লোক অভিযোগ করেন যে পরমাত্মা হয়ত তাকে ভুলে গেছেন। কিন্তু এ ধরণের কথা বলাও অন্যায় কারণ কোন জীবই ব্রহ্মচক্রের বাইরে নয়। তিনি সকলকেই প্রেমের ডোরে আকর্ষণ করে চলেছেন। এই প্রেমের সূত্র কখনও মনে হয় সুখদায়ক, কখনও মনে হয় দুঃখদায়ক। কখনও তিনি নিয়ে আসেন সুখ, কখনও নিয়ে আসেন দুঃখ। কিন্তু আসেন তো তিনিই, আর আসেন তো তোমারই কাছে। তোমাকে দুঃখে–সুখের অতীতে অন্য কোনো লোকে তো তিনি রাখেন নি। আর যদি কখনও দেখ যে তুমি দুঃখ–সুখের অতীতে অন্য কোনো লোকে চলে গেছ তা হলে দেখৰে তোমাতে আর তুমি নেই–তোমার 'তুমি' হারিয়ে গেছে। তাই প্রকৃত সাধক সুখের সময় বলৰে–হে প্রভু, তুমি ধন্য কারণ আমার মত অভাগাকে তুমি মোটেই ভোে◌লনি। দুঃখের সময় বলৰে–হে প্রভু, তুমি ধন্য কারণ আর কেউ না আসুক তুমি দুঃখের রূপ নিয়েও আমার কাছে এসেছ। বিচারকের বিচারে নির্দোষ যখন রেহাই পাৰে তার বলা উচিত, হে প্রভু! তুমি ধন্য, তুমি আমাকে পরিত্রাণ দিলে। দোষী যখন শাস্তি পাবে তারও

বলা উচিত–হে প্রভু! তুমি ধন্য কারণ আমার দোষগুলোকে তুমি কঠোররূপে জড়–সংঘাতে তথা ভাব সংঘাতের দ্বারা আমাকে বুঝিয়ে দিলে। আর বিচারকেরও উচিত বলা–হে প্রভু! আমার মাধ্যমে তুমি ন্যায়াধিকারিকের কাজ করে আমাকে ধন্য করলে।

পরমাত্মার বিধানে প্রতিসঞ্চরে ঋণাত্মিকা শক্তির পরিমাণ যদি ধরা যায় ৬০ (ধরা যাক) আর ধনাত্মিকা ৪০ (ধরা যাক) তাহলে পরিণামভূতা ঋণাত্মিকা দাঁড়ায় ২০। এই কুড়ি ঋণাত্মিকা বা বিদ্যামায়ার দ্বারাই তিনি জীবকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে চলেছেন। জীব যদি এই বিদ্যামায়াতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তবে অনন্তকালে তার পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব। কিন্তু ব্যষ্টি যদি নিজ জীবনে সাধন দ্বারা ধনাত্মিকা অপেক্ষা ঋণাত্মিকাকে ৰাড়িয়ে দিতে পারে, অবিদ্যা অপেক্ষা বিদ্যাকে প্ৰৰলা করে দেয় সে ক্ষেত্রে ব্রহ্মের পরিণামভূতা বিদ্যার সঙ্গে তার পরিণামভূতা বিদ্যা সংযুক্তা হয়ে তার গতি তরান্বিত করে দেৰে। এই ব্যষ্টিজীবনে বিদ্যার সাধনাই সগুণের সাধনা, আর ব্যষ্টিজীবনে যদি অবিদ্যার অনুশীলন করা হয় তাহলে বৃহতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার এই প্রচেষ্টার ফল কিছুতেই ভাল হতে পারে না। এরই নাম

মহতী বিনষ্টি। তাই সগুণ সাধন কালে বিদ্যা প্রকৃতিকে উৎসাহ দিতেই হবে।

"সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে”।

বিদ্যা তাকেই ৰলি যা মুক্তির কারণ। এখন প্রশ্ন জাগে জীব কতখানি শক্তি নিয়ে অগ্রসর হতে পারে। মানুষ যতক্ষণ বৃহতের পরিণামভূতা ঋণাত্মিকা শক্তির প্রভাবে এগিয়ে চলে ততক্ষণই তাকে বলা হয় সাত্বিকী ভক্তির সাধক অর্থাৎ পরিণামভূতা শক্তিতরঙ্গই প্রতিসঞ্চারকালে সাত্বিকী ভক্তির তরঙ্গ। এতে সাধকের একটি কামনাই থাকে আর তা হচ্ছে মুক্তি কামনা। আর যখন সে নিজেকে কলুষমুক্ত করে সম্পূর্ণ ঋণাত্মিকা শক্তির সাহায্য নেয় ও পুরুষোত্তমের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তার ভক্তি যে গতিতে এগিয়ে ছিল তাকে বলা হয় রাগাত্মিকা ভক্তি। সে সাধনায় সে মুক্তিও চায়নি তখন তার লক্ষ্য ছিল, "আমি তোমাকে চাই"। এই ধরণের সাধকের মধ্যে পরিণামভূতা ২০ (ধর) ঋণাত্মিকা মূলীভূতা ৬০ (ধর) ঋণাত্মিকায় পরিণত হয়।

জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে, জন্ম-জন্মান্তর ধরে কর্ম-জ্ঞানের তপস্যা করে শেষে ভক্তির উদয় হয়। তাই অজ্ঞ

প্রাকৃত জনের মধ্যেও রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হতে দেখা যায়। আর সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতও মুর্খের মত চেয়ে দেখতে থাকে। ভক্তি সাধনায় সাধক যখন এগিয়ে চলেছে কিন্তু পরিণামভূতা ঋণাত্মিকা মূল্য রাগাত্মিকার শক্তি অর্জন করতে পারেনি, যত্নবান সাধকের সেই ভক্তির নাম রাগানুগা ভক্তি।

জড়–সংঘাতে অন্যান্য বিকাশ গৌণভাবে হয়, জড়ের বিকাশ ঘটে মুখ্যভাবে। ভাব–সংঘাতে অন্যান্য বিকাশ গৌণভাবে হয়, ৰৌদ্ধিক বিকাশ (Intellectual progress) হয় মুখ্যভাবে। বৃহতের আকর্ষণে আত্মার বিকাশ হয় মুখ্যভাবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে হতে থাকে জড়াত্মক বিকাশের সঙ্গে ৰৌদ্ধিক বিকাশ ও ৰৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে আত্মিক বিকাশের সন্তুলন।

বৃহতের আকর্ষণে যেখানে সর্বস্ব দানের সাধনা ছাড়া আর কোন কিছুই নেই সেখানে সেই চরম দানের সাধনাকে বলা হয় **কেবলা ভক্তি**, আর যাঁতে সব কিছু দিলুম তিনি **তারকব্রহ্ম**।

(রামনগর, ভাদ্র পূর্ণিমা, ১৯৫৮)

অভিপ্রকাশ ও প্রতীকীকরণ

আজকের আলোচ্য বিষয় হ'ল "অভিপ্রকাশ ও প্রতীকীকরণ” (Expression and Symbolisation)। এই ব্যক্ত জগতে যা' কিছুই হচ্ছে, অথবা যা' কিছুই দৈশিক–কালিক ও পাত্রিক লক্ষণের ভেতর, সেখানেই মানুষ তথা জীবকুল প্রতীকীকরণের (Symbolisation) সহায়তা নেয়। প্রতীকীকরণ না হলে ব্যক্তিকরণ সম্ভব হয় না। এ তত্ত্ব পাঞ্চভৌতিক জগতে যতদূর সত্য, ঠিক ততটাই সত্য মানসিক জগতেও। সেখানে তাকে প্রতীকীকরণের পরিধির ভেতরে কাজ করে চলতে হয়। আর যেখানে তার দ্বারা প্রতীকীকরণ সম্ভব হয় না, তখন তাকে বলা হয় অৰোধগম্য (inexplicable)। বস্তুতঃ একে অৰোধগম্য না ৰলে বরঞ্চ ৰলা উচিত যে এর প্রতীকীকরণ হওয়া সম্ভব নয়।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা কী? না, এ বিভিন্ন তরঙ্গমালার সমষ্টিমাত্র। কেবল মানুষেরই নয়, সমস্ত জীবেরই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সামর্থ্য, অত্যন্ত সীমিত। ইন্দ্রিয়গুলো এক বিশেষ রূপে এক

সূচীপত্র

বিশেষ প্রকারের তরঙ্গই গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু স্থূল বা সুক্ষ্ম কোন প্রকার তরঙ্গ গ্রহণের ক্ষমতাই তাদের মধ্যে নেই। ইন্দ্রিয়গুলো নিজের নিজের সীমিত শক্তি নিয়ে কাজ করে। অর্থাৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত শক্তি আছে, তার একশ ভাগ তো নয়ই–তারও চেয়ে বহু কম মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো গ্রহণ করতে পারে না। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত তরঙ্গমালা তরঙ্গায়িত হচ্ছে তার মধ্যে শুধু বেশীর ভাগই ৰলৰ না, বলতে পারি যত তরঙ্গ আছে সবই মানুষের গ্রহণ–সামর্থের বাইরে। বলা হয়ে থাকে যে, অব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপী সমুদ্রে এই ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড একটা খুব ছোট দ্বীপমাত্র। তাহলে এই ব্যক্ত জগৎ নিজেই যখন একটা খুব ছোট্ট দ্বীপ, তখন তো মানুষের সামর্থও তার চেয়ে অনেক অনেক ক্ষুদ্র। এ ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু ঘটে চলেছে তার খুব কমই মানুষের জানবার সৌভাগ্য হচ্ছে। তাহলে দেখো, কত সীমিত শক্তি ও সামর্থ নিয়ে মানুষকে অথবা অন্যান্য জীবকে কাজ করতে হয়। আর সেই সীমিত বুদ্ধি আর শক্তি নিয়ে মানুষ কতই না অহঙ্কারের চূড়ায় বসে থাকে। কোন বস্তুটা কোন ধরণের, কি ধরণের তা পুরোপুরি বোঝা কোন জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন না, জীবের গ্রহণ করার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। তোমারেই চোখের সামনে এই পাঞ্চভৌতিক জগতে এমন অনেক কিছুই হচ্ছে যার সবই

তোমার দৃষ্টিশক্তি দেখবার ক্ষমতা রাখে না। যাকে তোমার সামনে দেখে মনে করছ খুব একটা বড় জিনিস–মূলতঃ তা পরমপুরুষের বিকাশের এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। তাহলে পরমপুরুষের ব্যক্তিকরণ কত বিশাল। কেন না তাঁর একটা ছোট অংশতেই কত বিশালতা দেখতে পাও। তুমি এই মনুষ্যচিত সামান্য অনুভব শক্তি নিয়ে পরমপুরুষকে কত টুকুইবা বুঝতে পারবে। যখন ভাবের অধীন সত্তা সম্বন্ধেই এ হতে পারে তখন ভাবের অতীত সত্তা সেই পরমপুরুষ সম্বন্ধে কী বলা যেতে পারে। বায়ুতে, জলে, চারিদিকে কত পদার্থ রয়েছে–যা' তুমি জানোই না। কেন না তোমার জানবার সামর্থ নেই। কোন কোন বিশেষ জীবের এক একটা বিশেষ ধরণের তরঙ্গ গ্রহণের ক্ষমতা বেশী রয়েছে। সেই বিশেষ জন্তুটি হয়তো সেই বিশেষ তরঙ্গটিকেই গ্রহণ করতে সক্ষম। আমরা যে জিনিসকে দৃষ্টিশক্তি দিয়ে দেখতে পাই, বুঝতে হবে সে অভিপ্রকাশ মানুষের গ্রহণ সামর্থের ভেতরে। সেই অভিপ্রকাশের তরঙ্গ আসার আগে তারই সূক্ষ্ম তরঙ্গ প্রথমে এসে যায় যা মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু কিছু জীবজন্তু আছে–তারা সে তরঙ্গকে গ্রহণ করে নিতে পারে। সে সব জন্তু আগেই বুঝে নেয় যে, কোন বিশেষ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। কিছু কিছু মানুষও অনেক সময় এই রকম ক্ষমতার

অধিকারী হয়ে থাকে। এ ব্যাপারটা একটা সূক্ষ্ম তরঙ্গ গ্রহণ করবার ক্ষমতা মাত্র। একে "পূর্বাভাস বিজ্ঞান" বা Science of Premonition বলা হয়। এ শক্তি সাধনার দ্বারা অর্জিত হয়। চোখের কাজ কোন কিছু প্রকাশের তরঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া। তাকে চোখ গ্রহণ করতে সক্ষম হতেও পারে আবার নাও পারে। তুমি হয়তো কোন দিকে তাকিয়ে কোন বস্তুকে নাও দেখতে পারো। ঠিক সেই ভাবেই তুমি সেই সব শব্দ–তরঙ্গকে শুণতে পারবে না, যা' মানুষের শোণার পরিধির বাইরে।

তোমাদের চারিদিকে কত ভাষার তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে যা' তোমরা জানো না। ঠিক তেমনি ঘ্রাণ, স্পর্শ ও আস্বাদন শক্তির বেলাতেও। বাহ্যিক জগতে যে তরঙ্গমালা প্রবাহিত হচ্ছে তোমার ইন্দ্রিয়গুলি তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের সংস্পর্শে আসছে। তারপর তা' ভাবলোকে তোমার মনে আত্মসাৎ (assimilated) হয়ে যাচ্ছে। এরপর যে অনুভূতির উদ্ভব হচ্ছে তাই ব্যক্তিকরণ হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যক্তিকরণের বাইরে যত তরঙ্গমালা আছে তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র তোমার মনে আসছে। কেন না এখানে ইন্দ্রিয় অসামর্থ। যখন ব্যক্তিকরণ করবে তখন কেমন করে তা' করবে? ব্যক্তিকরণ

করার সময়ও তা'কে প্রতীকীকরণ করতে হবে আর প্রতীকীকরণ করতে দেরী হয়ে গেলে অনুভূতি থেকে যাবে মনেই–তা'র আর অভিব্যক্তিই হবে না। ধরো, একজন ভালো গাইয়ে গান করছেন। সমস্ত লোকই তাঁর সঙ্গীতের সুরতরঙ্গকে সমানভাবে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ গ্রহণ করার সামর্থ সকলের সমান নয়। সঙ্গীত উপলব্ধির জন্যে শ্রবণেন্দ্রিয়কেও তৈরী করতে হয় তবেই তার পক্ষে ব্যক্তিকরণ সম্ভব। চেষ্টা করার পর মানুষ পায় কি–না ঠিক যেমনটি সে শুণেছিল–তেমনটি সে গাইতে পারে না। একই গান বহুবার শোণার পর মানুষ গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ঠিক ওই রকম গাইবার চেষ্টা করে, কেননা, সে বার বার মনে করে যে, হয়তো তেমনটি ঠিক করতে পারছে না, মনে হচ্ছে হয়তো হুবহু প্রতীকীকরণ হচ্ছে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত ধ্বনি আছে ও যেমন ভাবে তা' শোণা যায়, ঠিক তেমন ভাবে তা' ব্যক্ত করা যায় না। এখন এর কারণ কী? এই নয় কী যে–এর প্রতীকীকরণ ঠিকমত হয় নি?

এখন দেখা যায় কতরকমের 'রাগ' আছে ও এগুলি কিভাবে ভাগ করা হয়েছে। স্পান্দনিক গীতিকলা অনুযায়ী আমরা নিজেদের 'সুরসপ্তক' তৈরী করে নিয়েছি। প্রাচ্য দেশে

সুরসপ্তক ও প্রতীচ্যে 'Octave' বা সুরঅক্টক বলা হয়। এই সুরসপ্তকের স্পন্দন মানব কন্ঠের সামর্থ অনুযায়ী নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। হয়তো এমনও হতে পারে যে, সুদূর ভবিষ্যতে মানুষের শোণার সামর্থ বা ব্যক্ত করার সামর্থ বেড়ে যাবে। তখন এর দ্বারা কাজ চলবে না ও একে বদলাতে হবে। এর পরিধিকে বাড়িয়ে দিতে হবে। যদি মানুষ আরও কয়েক লক্ষ বছর এই পৃথিবীর বুকে টিকে থাকে; তবে একদিন 'সুরঅক্টব' (octave)–এ পরিবর্তন সূচিত হৱে। কম্বিনেশন (combination) তথা প্যারমিউটেশন্ (permutation)–য়ের দ্বারা লোকে হাজার হাজার রাগ–রাগিনী তৈরী করে নেৱে। যুগের আবশ্যকতা অনুযায়ী আমাদের সঙ্গীতে এই পরিবর্তন হবে।

কোন মানুষ একটা গরম কিছু স্পর্শ করল। ছোঁয়ার পরেই সে 'ওহ্' করে উঠলো, আবার তার চেয়েও বেশী গরম কিছু ছোঁয়ার পরেও 'ওহ্' শব্দে প্রতীকীকরণ করল। এর মধ্যে প্রথমবারের 'ওহ্' আর দ্বিতীয়বারের 'ওহ্' আৱাজ এক নয়। প্রথমটায় হয়তো আঙ্গুল পুড়লো; আর দ্বিতীয়টায় হয়তো সমস্ত হাতটায় জ্বলে গেলো। তোমাদের ব্যক্তিকরণের সামর্থ অত্যন্ত

সীমিত। ওহ্, আহ্, উফ্ ইত্যাদি দু'চার শব্দ দিয়েই সব কিছু বলতে হয়।

হয়তো তুমি কোন এক সুন্দর দৃশ্য দেখছ। দৃশ্য যতটা সুন্দর অতটা সৌন্দর্য তোমার চোখ গ্রহণ করতে পারে না। তুমি কেবল এর এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই অনুভব করতে পারো। এবার যদি তুমি এটাও ব্যক্তিকরণ করতে চাও তবে তুমি যা' অনুভব করছো বা তোমার মন যা গ্রহণ করতে পেরেছে, তার শতকরা খুব নগন্য অংশই চেষ্টা করে ছবি এঁকে ব্যক্ত করতে পারবে। অর্থাৎ তোমার কোন দৃষ্টিই পূর্ণ নয়। মনে একটা অভাব সব সময়ে থেকেই যায়– যেমনটা চেয়েছিলুম–ঠিক তেমনটা করতে পারলুম না। যত বড় শিল্পীই হোন না কেন, তিনি যেমনটা চাইবেন ঠিক তেমনটি তৈরী করতে পারবেন না। ভাব ও অভিব্যক্তির মধ্যে ব্যবধান থাকবেই। যিনি 'টেকনিশিয়ান' তিনি সেই ফাঁককে ভরে দেবার চেষ্টা করেন–আর প্রতিভাশালী ব্যষ্টি (genius) ফাঁককে বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিভাবান যেমন দূরত্বকে কমাতে পারেন না তেমনি টেক্নিশিয়ানও ফাঁক পূরণ করতে সক্ষম হন না। ভাব ও অভিব্যক্তির দূরত্ব কখনই কম বা শেষ হতে পারে না। কিন্তু ভাব ও অভিব্যক্তির দূরত্বকে

কম করার বা শেষ করার যে চেষ্টা চলে তা' বুনিয়াদ সৃষ্টির লক্ষ্ণণ। এ লক্ষ্ণণ অবশ্যই মঙ্গলবাহী। এ চেষ্টা চলতেই থাকৰে কিন্তু কোনদিনই এর শেষ হবে না। শিল্পী সর্বদা নিজের টেক্সিকের দ্বারা এই ব্যবধানকে কমাতে চেষ্টা করবে; কিন্তু এ ব্যবধান কোন দিনই মিটবে না।

ঠিক তেমনি একই কথা রূপ, রস ও গন্ধ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তুমি হয়তো কোথাও কোন বীভৎসতার চিত্র দেখতে পেলে কিন্তু চিত্রকে ঠিক ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। তেমনিভাবে হয়তো তুমি কোন এক সুখদায়ক দৃশ্য দেখলে কিন্তু তুমি একেও পরিপূর্ণ ভাবে ব্যক্ত করতে পারবে না। তোমার অভিব্যক্তি তোমার ভাবের সফল নিরূপণ করতে সর্বদাই অসমর্থ থেকে যায়। তোমার প্রতীকীকরণ (Symbolisation) তত দূরই সফল হয়, যতদূর পর্যন্ত অনুভব–জ্ঞান হয়, কিন্তু এতে পুরোপুরি কাজ হয় না। এই ব্যক্ত জগতে সব ভাবই আপেক্ষিকতার ভেতরে আছে। প্রতীকীকরণের সীমাবদ্ধতার জন্যে আপেক্ষিকতার অভিব্যক্তিগুলোর প্রকাশ কত কঠিন হয়ে পড়ে, আর অসীমের সম্বন্ধে কোন অভিব্যক্তি করার ব্যাপারে তো কোন কথাই নেই। এ ব্যাপারে কিছু চিন্তা করাই যায় না। এমন কি

আপেক্ষিকতার ভেতর যে ভাবটুকু রয়েছে তাকেই ব্যক্ত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যা চরম ভাব তাকে কেমন করে প্রতীকীকরণ করবে। এতো একদম অসম্ভব। এ'র সম্বন্ধে পরে বলৰ।

এখন সাপেক্ষিকতার গণ্ডীর ভেতরে যে প্রতীকীকরণ ক্রিয়া তারই সম্বন্ধে আলোচনা করৰ। আপেক্ষিক প্রতীকীকরণের ক্ষেত্রে তিনটি মূল তত্ত্বকে জেনে নিতে হবে। যা প্রতীকীকরণ করা হয় তা' কোন দিনই পূর্ণ হয় না। আগেই বলেছি যে, ভাব ও অভিব্যক্তির মধ্যে কিছুটা অপূর্ণতা সব সময়েই থেকে যায়। যত করতে চাও তত করতে পারো না। যত আকাঙ্ক্ষা ছিল তত পূর্ণ হ'ল না। দ্বিতীয়তঃ প্রতীকীকরণ কখনও একই প্রকৃতির হয় না। একই প্রকারের মনোবেদনা দু'জন মানুষের ওপর যদি আসে, তবে একজন হয়তো দুঃখে পাগল হয়ে যাবে আর অন্যজন দু'চার মিনিট কান্নাকাটি করে এক পেয়ালা চায়ের সন্ধান করবে। এই পৃথিবীতে এই রকমই হয়। তাই দেখতে পাই যে ভাবের অভিব্যক্তি সমরূপের বা সমান প্রতীকীকরণের কখনই হয় না। এর কারণ পাত্রগত প্রভেদ। কারুর মধ্যে আত্মস্বীকরণের ক্ষমতা কম, আবার কারুর

মধ্যে সে শক্তি অধিক রয়েছে। প্রতীকীকরণের ক্ষমতাও কোন ব্যষ্টির বেশী, কোন ব্যষ্টির কম থাকে।

যার আত্মস্থীকরণের ক্ষমতা যত বেশী সে তত উন্নত। অর্থাৎ যার মধ্যে প্রতীকীকরণের সামর্থ যত বেশী, সে তত বড় সিদ্ধহস্ত শিল্পী (টেক্নিশিয়ান)। মনে রেখো, প্রতিভাধর (genius) জন্মগত মেধা নিয়ে আসে। আর টেক্নিশিয়ানরা (শিল্পী) কি? শিল্পী হচ্ছেন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ–আপন প্রচেষ্টা, সাধনা, অধ্যবসায়ের দ্বারা নিজের সাধারণ বুদ্ধিকে আসাধারণ কর্মশৈলীতে রূপান্তরিত করেন। শিল্পী হলেন বুদ্ধি ও কর্মকুশলতাসম্পন্ন ব্যষ্টি। শিল্পী ও প্রতিভাশালীর মধ্যে এটাই মূল পার্থক্য।

পাত্রগত প্রভেদের ন্যায় কালগত প্রভেদও আছে। দশহাজার বছর আগেকার মানুষ সুখ–দুঃখাদির যে ভাবে প্রতীকীকরণ করত; আজকের মানুষ ঠিক সেইভাবে করে না। মনে কর, আজ থেকে দু' তিন শ' বছর আগে নিজের অনবধানতাবশতঃ কাউকে আঘাত দিয়েছ। তখন তুমি কি করতে? তুমি সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যষ্টির হাত ধরে দুঃখ প্রকাশ করতে ও আঘাত লাগা জায়গায় মলম–পট্টি লাগিয়ে তার শুশ্রূষা করতে। আর, আজকের লোক ভাবে "ওঃ দুঃখিত” বললেই নিজেদের দায়

সারা হয়ে যায়। আজকাল অভিব্যক্তির ধাঁচই পাল্টে গেছে। আর প্রতীকও (Symbol) বদলে গেছে। আসলে যুগ বা কালানুযায়ী পরিবর্তন এসেছে। আবার দেশের পরিপ্রেক্ষিতেও পরিবর্তন দেখা যায়। দৃষ্টান্ততঃ কোনও এক ব্যষ্টি অপর ব্যষ্টিকে গুলি করে মেরে দিল। কোন দেশে হত্যাকারী ধিকৃত হৰে ও সে কৃত কর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করবে। আবার অন্যদেশে কোনও হত্যাকারী কেন গুলি করল জিজ্ঞাসা করলে সে বুক ফুলিয়ে ৰলৰে-"লোকটা মরে গেলো বলে তার প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে, আর আমার যে বুলেট খরচ হ'ল তার জন্যে সমবেদনা জানাচ্ছে না।" লক্ষ্য করছ-দেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীকীকরণের কেমন পরিবর্তন এল। তাই বলছিলুম-দেশ ও কাল অনুযায়ী প্রতীকীকরণ এক রকমের হয় না।

"ভেতরে এসো" কথাটা কোন একটি ভাবের প্রতীকীকরণ। আবার ওই "এসো" শব্দটাই অন্যভাবে বললে অন্যপ্রকার ভাবের প্রতীকীকরণ হতে পারে। ঠিক তেমনি সংস্কৃতে "আগচ্ছ" শব্দ দিয়ে একই ভাবের আলাদা প্রতীকীকরণ করা যেতে পারে; একই "come in" শব্দটিকে বিভিন্নরূপে বলা যেতে পারে। যেমন কেউ নম্র স্বরে বলতে পারে-"come in"

আবার কেউ হুকুম দেবার স্বরেও বলতে পারে "come in" অথবা কেউ সাধারণ ভাবেও বলতে পারে।

তৃতীয় তত্ত্বটি হচ্ছে, প্রতীকীকরণ কখনও স্থায়ী হতে পারে না, এর মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন এসে যায়। আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে মানুষ যখন পর্বতকন্দরে বাস করত– তখন তার ভাব প্রকাশ পদ্ধতি যেমন ছিল আজকে ঠিক তেমনটি নেই। এতে পরিবর্তন এসে গেছে। এই রীতির পরিবর্তনের ধারায় শিল্পকলা, স্থাপত্য তথা মানুষের সমস্ত সূক্ষ্ম মানবীয় সংবেদনের অভিব্যক্তিতে পরিবর্তন আসছে ও ভবিষ্যতেও আসবে। অভিব্যক্তির স্বভাবই এই। যদি কেউ বলে, প্রাচীনকালের রীতি অনুযায়ী আজকের সাহিত্য, শিল্প, কলা ইত্যাদি রচিত হবে, তবে ৰলৰ সে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। এই সব মানবীয় সংবেদনের অভিব্যক্তিগুলোকে আজকের যুগ অনুযায়ী প্রকাশ করতে হবে। আপেক্ষিকতার প্রশ্ন যেখানে রয়েছে তা শুধু ভৌতিক অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেই নয় মনোলোকের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মনোলোকেও তুমি সব বস্তুর প্রতীকীকরণ করতে পারবে না। যদি মনে কোন ভাবের প্রতীকীকরণ করেও থাকো, তবুও বাইরে তা' চোখের দ্বারা, মুখের দ্বারা, পায়ের দ্বারা বা হাতের দ্বারা প্রতীকীকরণ

করতে পারবে না। তুমি অনেক সময় স্বীকার করেও থাক যে, "ব্যাপারটা বুঝতে পারছি; কিন্তু প্রকাশ করতে পারছি না"। চীনী মিষ্টি, রসগোল্লাও মিষ্টি কিন্তু তুমি এই দুই মিষ্টত্বের ব্যবধান ব্যক্ত করতে পারবে না। তুমি কেবল এতটুকুই বলতে পারো.....এটা অত মিষ্টি, আর ওটা রসগোল্লা বা আঁৰের মত। তুমি এখানে নিজের ভাবকে পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে অসমর্থ। ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। যা ভাবে আসে তা' ব্যক্ত করা যায় না। আংশিক ব্যক্তীকরণ হয়, শতকরা নিরানব্বই ভাগই থাকে অব্যক্ত। পরমপুরুষ অর্থাৎ যিনি পরম সত্তা তাঁকে ব্যক্ত করা একেবারে অসম্ভব। অনুভূতি হচ্ছে কিন্তু ভাব প্রকাশে অসমর্থ। সে অবস্থায় মনও বিকল হয়ে পড়ে, আর সেই অবস্থাকেই বলা হয় সমাধি। মানুষ পরমপুরুষকে পরমাত্মা, ভগবান ইত্যাদি নানা নামে সম্বোধন করে থাকে। পরমপুরুষতো পরমসত্তা (absolute)। এমন কি, যে ভাব মনোগোচর তাকেও আমরা ব্যক্ত করতে পারি না। তাই যেখানে আমরা চরম (Su- preme) নয় এই রকম ভাবকেই প্রকাশ করতে পারি না, সেখানে যিনি মনোবৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ভাবাত্মক রূপের পরপারে তাঁকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যক্ত করা তো দূরের কথা, মন পর্যন্তও তাকে প্রতীকীকরণ (Symbolisation)

করতে পারে না। মনও অসমর্থ হয়ে যায়। এই জন্যে বলা হয়েছে–

"যতো বাচো নিবর্তন্তে আপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান মা বিভেতি কুতশ্চন"।।

পরমপুরুষ সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে বাক্‌–ইন্দ্রিয়ের হার হবে। বাক্‌ যেখানে অপারগ, মনও সেখানে প্রতীকীকরণে অসমর্থ। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এই যে, পরমপুরুষ, পরমপুরুষ বলে আহ্বান তা তাঁকে পাবারই সূক্ষ্ম প্রয়াস। তাহলে এ কিসের জন্যে? এতো ভাষারই প্রতীকীকরণ। হ্যাঁ, এ ভাষার প্রতীকীকরণ অবশ্যই–কিন্তু 'পরমপুরুষ' শব্দ পরমপুরুষের জন্যে ভাষার প্রতীকীকরণ নয়। এখন দেখো, এই যে প্রতীকীকরণের অভিব্যক্তি ও অভিব্যক্তির প্রতীকীকরণের দ্বারা আমরা কী করি? আমি বলতে চাই যে "পরমপুরুষ" প্রতীকীকৃত হতে পারেন না। এই প্রতীকীকৃত ভাবের অভিব্যক্তি আমরা পরমপুরুষের সঙ্গে জুড়ে দিই। বলা হয়েছে যে পরমপুরুষ সম্পর্কে কাউকে কিছু বোঝাতে গেলে সেখানে না হয় ভাষার প্রতীকীকরণ, আর না হয় শ্রোতার শ্রুতি বা শব্দের প্রতীকীকরণ। অর্থাৎ শোণার জন্যে বা

ৰলৰার জন্যে দু'পক্ষেই শব্দের প্রতীকীকরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে "গুরু গুংগা, শিষ্য বহিরা," হয়ে যায়। আবার গুরু তখন ৰোৰা হয়ে যাবেন না-তো করবেন কি? তিনি তো ব্যক্ত করতে পারবেন না, ভাষার গণ্ডী তো সীমিত। যদি ভাষায় ব্যক্ত হয়েও যায় তবে কাণ গ্রহণ করবে কী করে? সামর্থ্যে তো সীমিত। এই জন্যেই কৃষ্ণাচার্য বলেছেন-গুরুর দশা কেমন! না, গুরু হলেন ৰোৰা আর শিষ্য হলেন কালা।

যাই তুমি ৰলো বা ব্যক্ত করো, তা' সবই আপেক্ষিকতার গণ্ডীতে পড়ে। তা চরম হতে পারে না। এই অবস্থায় পরমপুরুষ সম্বন্ধে কথক গুরু সেই পরমসত্তাকে কেমন করে বলতে পারবেন! অতএব গুরুকে তো ৰোৰা হতেই হবে আর শিষ্যকে বধির। তখন সাধক কী করবে? যদিও সম্ভব নয় তবুও চেষ্টা করবে। কৃষ্ণাচার্য স্বয়ং উত্তর দিচ্ছেন যে ওই অবস্থায় কী করা যায়? কালা আর ৰোৰা নিজেদের মধ্যে যেমন করে কথা ৰলে সেইভাবে মূক ও বধিরের ইশারা ক্রিয়া ও কথাও এক ধরণের প্রতীকীকরণ-এটা সূক্ষ্মতর ধরণের প্রতীকীকরণ। যখন ওরা কথা বলে তখন সূক্ষ্ম প্রতীকের ব্যবহারের দ্বারা চুপ করে থেকেও কথাবার্তা সম্পন্ন করে নেয়। উপায়হীন অবস্থায় এ ছাড়া আর কী করা যেতে

পারে। আর এক ধরণের সূক্ষ্মপ্রতীকীকরণ রয়েছে। আমরা যখন জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ভাব গ্রহণ করি তখন সেই ভাবের স্পষ্টীকরণের পরেই তা' কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা ব্যক্ত হয়। আবার এও জেনে রেখো, পূর্বার্জিত প্রারব্ধ সংস্কারের প্রতীকীকরণ বাহ্যিক প্রতীকীকরণ হওয়ার আগেই মনের মধ্যে প্রথমে ব্যক্ত হয়ে যায়। বাইরে যখন ব্যক্ত করতে পারি না বা করৰার চেষ্টা করিনা তখন তা' অব্যক্ত প্রতীক (latent symbol) সংস্কার অথবা relative momenta হয়ে থেকে যায়। তা প্রতীকের রূপে মনের মধ্যে থেকে যায়। মনের ভেতরে হ'ল এর প্রতীকীকরণ। কিন্তু এই মানসিক প্রতীককে একদিন স্থূল প্রতীকে আসতেই হবে। আর এই অব্যক্তপ্রতীক মানসিক স্তর থেকে যতক্ষণ না ভৌতিক স্তরে পরিণত হচ্ছে, ততক্ষণ তুমি এই মানস প্রতীককে জন্ম জন্মান্তর ধরে বয়ে নিয়ে চলতে থাকৰে। এই কারণেই যতক্ষণ না মনোলোকের প্রতীক ভৌতিক প্রতীকে রূপান্তরিত হয় ততক্ষণ মানুষের পুনর্জন্ম হতেই থাকে।

এই ব্যক্ত জগৎও পূর্ণ প্রতীকীকরণের এক ছোট অংশ বিশেষ। আর এর চেয়েও অতি ছোট অংশ মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো গ্রহণ করতে পারে। আবার তার চেয়ে কম তুমি

মন দিয়ে গ্রহণ করতে পার ও আরও কম অংশ প্রতীকীকরণ করতে পার। তাহলে তোমার নিজের শিল্পকৃতি অত্যন্ত কম। মানুষ যে বস্তু পেল তাকে হাত দিয়ে ব্যক্ত করতে পারে চিত্রের মাধ্যমে, আর কণ্ঠ দিয়ে ব্যক্ত করতে পারে সঙ্গীতের মাধ্যমে। যে ভালো গান করে তাকে শিল্পী ৰলৰ না; যে হাতের কাজ করে তাকে ৰলৰ শিল্পী, যেমন চিত্রশিল্পী।

অব্যক্ত জগতে সব কিছুই বিধৃত হয়ে রয়েছে। মানসিক স্তরে ইন্দ্রিয়েরা যা গ্রহণ করতে পারে তা' ব্যক্ত জগতের খুবই নগণ্য অংশ। আর এর যে অংশ মনে গৃহীত হয়েছে বা যা আত্মস্বীকৃত বা সংগৃহীত হয়েছে তা' সবই অব্যক্ত জগতে অথবা ভূমা মনে বিধৃত হয়ে রয়েছে। অতএব তা' ভূমামনের ওপর নির্ভরশীল। একে আধ্যাত্মিক ধারা বা ভূমাচৈত্তিক ধারাও বলতে পার। তাই বলছিলুম, তোমার যে প্রতীকীকরণ তা' করে ভৌতিক প্রতীকীকরণের রূপান্তরিত হবে তার প্রতীক্ষায় কেন পড়ে থাকৰে? নিজের মানসিক প্রতীকীকরণকে সূক্ষ্ম উপায়ে সূক্ষ্ম ধারা পাইয়ে দাও যাতে তাঁর ভূমা তরঙ্গে আশ্রয় প্রাপ্তি হয়। এতে তোমার প্রতীক মানসাধ্যাত্মিক তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে যাবে, তাতে মানসিক প্রতীককে আর জাগতিক স্তরে ব্যক্ত হৰার জন্যে বসে থাকতে হবে না। তখন

তা মানসাধ্যাত্মিক তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তারপর তাকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে রূপান্তরিত হতে হবে। আর যেহেতু আত্মিকসত্তা প্রতীকীকরণের বাইরে অবস্থান করছে তাই সেখানে প্রতীকীকরণের ঝঞ্ঝাট আর থাকে না। এই হ'ল মানুষের বিমুক্তি। এটাই হ'ল মোক্ষ যা'র প্রতীক্ষা মানুষ জন্ম জন্মান্তর ধরে করছে। এ বোধ যার মধ্যে এসে গেছে তাকে বুঝতে হবে যে আর জন্ম–জন্মান্তর ধরে প্রতীক্ষা করতে হবে না। এই জীবনেই মানসিক প্রতীকীকরণকে মানাসাধ্যাত্মিক (Psycho- spiritual symbolisation) প্রতীকীকরণে রূপান্তরিত করে দাও। মুক্ত পুরুষ হয়ে যাও।

(২২শে মে, ১৯৭৯, রাঁচী)

সংগচ্ছধ্বম্

একটা জনপ্রিয় বৈদিক শ্লোকে বলা হয়েছে:

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাম্।

দেবাভাগং যথাপূর্বে সংজানানা উপাসতে।
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনঃ যথা বঃ সুসহাসতি।।"

'সংগচ্ছধ্বং'।। এখানে উপসর্গ 'সং' মানে হচ্ছে সম্যরূপে, সম্যক্ পদ্ধতিতে, সম্যভাবে, সম্যক ছন্দে। এ বিশ্বের সব কিছুই এককভাবে এগিয়ে চলেছে, আবার সামগ্রিকভাবেও এগিয়ে চলেছে। এখন এই এগিয়ে চলা বা গতি ৰলতে কি বোঝায়? গতি মানে হচ্ছে বস্তুর স্থান পরিবর্তন। গতির অর্থই দ্রুতি। সংস্কৃতে 'গম্' ধাতুর অর্থ হ'ল চলা। এটা জীবনেরই দ্যোতক। সুতরাং প্রত্যেক জীবিত সত্তাকেই এগিয়ে চলতে হবে। এর অন্যথা হতে পারে না।

কিন্তু সকল 'গতি'ই তো আর 'সংগচ্ছধ্বং' নয়। 'সমাজটা' কী? এটা তৈরীই বা হয় কী করে? "সমানম্ এজতি ইতি সমাজঃ।” 'এজতি' মানে 'গচ্ছতি' অর্থাৎ যা চলছে। গতির জন্যে বা চলার জন্যে সংস্কৃতে কয়েকটিই ক্রিয়া রয়েছে– 'গচ্ছতি', 'চলতি', 'চরতি', 'ব্রজতি', 'এজতি'–এগুলির বিভিন্ন অন্তর্নিহিত অর্থও রয়েছে। সমাজে রয়েছে অনেক মানুষ যারা একসঙ্গে এগিয়ে চলেছে। এখানে 'একসঙ্গে চলেছে' অর্থ কেবল

এগিয়ে চলা বা দ্রুততালে এগিয়ে যাওয়াই নয়। 'একসঙ্গে চলেছে' মানে হচ্ছে সমাজের সকল অংশের লোকই সমষ্টিগত জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এক সঙ্গে এগিয়ে চলার ভাব নিয়ে চলেছে। ধর, তুমি অনেক টাকা সঞ্চয় করছ। তোমার বাড়ীতে কোন খাদ্যাভাব নেই। কিন্তু সমাজের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ তোমার প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবেরা অর্থাভাবে, খাদ্যাভাবে, বস্ত্রের অভাবে রয়েছে। এর অর্থ তুমি 'সংগচ্ছধ্বং'–এর প্রকৃত তাৎপর্য মেনে চলছ না। 'সংগচ্ছধ্বং' মানেই হচ্ছে একটা মজবুৎ, দৃঢ়নিৰদ্ধ সমাজ তৈরী করা যেখানে কোন শোষণ নেই, কোন মহামন্যতা বা হীনম্মন্যতা ৰোধ নেই।

'সংগচ্ছধ্বং'–এর প্রকৃত তাৎপর্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই আমি 'প্রাউট' তত্ত্বকে দিয়েছি। সুতরাং পুরো 'প্রাউট' তত্ত্বটাই এই বৈদিক 'সংগচ্ছধ্বং' মন্ত্রের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'সংবদধ্বং'। সংস্কৃত 'বদ' ধাতুর অর্থ হচ্ছে বলা। কথা তো সবাই ৰলে, তাহলে সংবদধ্বম্–এর মূল ভাবটা কী? 'সংবদধ্বম্' মানে তুমি সেই পরম ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হৰে যা তোমাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে কথা বলতে শেখাৰে। অর্থাৎ তোমার ভাষা কোন মতেই দ্ব্যর্থৰোধক হবে না। একে অবশ্যই স্পষ্ট, চূড়ান্ত ও নিশ্চিত হতে হবে।

'সংবো মনাংসি জানতাম্'। বহুবচনাত্মক 'বঃ' শব্দের মানে হচ্ছে 'তোমাদের'।'বঃ' বহু পুরোণো বৈদিক সংস্কৃত। লৌকিক সংস্কৃতে অর্থাৎ অর্বাচীন সংস্কৃতে 'তোমাদের' জন্যে শব্দ হচ্ছে 'যুষ্মাকম্' কিন্তু পুরোণো বৈদিক সংস্কৃতে 'বঃ' চলত। মূল শব্দ হচ্ছে 'বঃ'; এরূপ 'অহ্' ও 'অঃ' একই পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং এটি 'বঃ'। 'সংবো মনাংসি জানতাম্'–একে গদ্যে রূপান্তরিত করলে দাঁড়াৰে "বোঃ মনাংসি সংজানতাম্”।

তোমাদের জানা উচিত যে সমস্ত সৃষ্টির উৎস ও সমস্ত অণুজীবের উৎস হচ্ছেন পরমপিতা। সেই পরমপিতা থেকেই সমস্ত অণুজীব এসেছে। তোমাদের কখনই এই মূল সত্যকে ভোলা উচিত নয়। বিভিন্ন অণুজীবের মধ্যে পার্থক্য তার কারণ হচ্ছে অণুজীবেদের মধ্যেকার সংস্কারগত তারতম্য। কিন্তু তোমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে সমস্ত অণুসত্তারই উৎস হচ্ছে এক চরম সত্তা–এক ও অদ্বিতীয় ভূমা সত্তা। এরূপ চেতনা থেকেই মানুষে মানুষে সম্পর্কটা আরও নিবিড় ভাবে গড়ে উঠৰে। "সংবো মনাংসি জানতাম্”–এ সত্যকে তোমাদের জানা উচিত। এ তথ্যকে তোমরা কখনো ভুলো না।

“দেবাভাগং যথাপূর্বে সংজানানা উপাসতে"। এখানে 'দেব' শব্দটি সংস্কৃতে 'দিক্' ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন। 'দিক্' ধাতুর মানে হচ্ছে দৈবিক অস্তিত্ব। সুতরাং 'দেব' মানেও তাই, দৈব অস্তিত্বকেই বোঝায়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন–

"দ্যোততে ক্রীড়তে যস্মাদুদ্যতে দ্যোততে দিবি।
তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূয়তে সর্বদেবতৈঃ।।”

পরমপুরুষ থেকে উৎসারিত সমস্ত তরঙ্গরাজিই, সমস্ত স্পন্দনধারাই দেব নামে আখ্যাত। 'দেবাভাগং যথাপূর্বে'–অর্থ হচ্ছে অতীতের সমস্ত রকম দৈবী তরঙ্গরাজি। কেন 'অতীত' শব্দটা ব্যবহার করলুম? কারণ মানব সভ্যতার সেই ঊষা কাল থেকেই অজস্র তরঙ্গরাজি উৎসারিত হয়ে চলেছে। কর্মগত ক্ষেত্রে এই তরঙ্গরাজির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সাম্য ও ঐক্য সবসময়ই বজায় থেকেছে। আলো–জল–শ্বাস–প্রশ্বাস বা অন্য যে কোন জিনিসের কথাই ধরা যাক। এগুলির কোন তারতম্যই ছিল না বা নেই। যে তারতম্য বা বৈষম্য আজকের সামাজে আমরা দেখছি তা সুবিধাবাদীদের সৃষ্টি, যারা নীচ, হীন, দুর্নীতিপরায়ণ, এসব তাদের সৃষ্টি। সুতরাং দুর্নীতিপরায়ণ মানুষদের এই ধরণের কর্মগত ত্রুটিগুলিকে তোমাদের সমর্থন করা উচিত নয়। এই মানুষে

মানুষে যে আপাতঃপার্থক্য সেগুলোকে তোমরা খুঁজে বের করবার চেষ্টা কোরো না।

“দেবাভাগং যথাপূর্বে সংজানানা উপাসতে"। দিব্য দ্যোতনার স্বভাব হচ্ছে এই যে তাতে কোন ভেদভাব থাকে না। কোন শোষক–শোষিতের সীমারেখা থাকে না। কাজেই এই ধরণের কোন ভেদভাব সৃষ্টি না করাটাই ছিল তাদের কর্তব্য, তাদের উপাসনা, তাদের আস্তিত্বিক প্রগতির মৌল লক্ষ্য।

"সমানী ব আকুতিঃ”। এই বিশ্বের সবকিছু যখন একই উৎস থেকে, একই সৃষ্টি কর্তা থেকে উৎসারিত হচ্ছে আর শেষ পর্যন্ত যখন সব কিছু সেই চরম বিন্দুতেই ফিরে যাচ্ছে তখন সকল ব্যষ্টি সত্তার হৃদয়ের আশা–আকাঙ্ক্ষা, এষণা–আকুতি এক হতেই হবে। কিন্তু কিছু দুর্নীতিপরায়ণ মানুষের হীন অপকর্মের ফলে যারা শোষিত, যারা অবহেলিত তারা সেই মূল লক্ষ্যকে ভুলে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। তারা তাদের জীবনের লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছে। এটা হতে দেওয়া ঠিক নয়। পরমপুরুষের জন্যে প্রত্যেকের আশা–আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তির পূরো সুযোগ সকলেরই থাকা উচিত।

"সমানা হৃদয়ানি বঃ”। এই বিশ্বের সব কিছুই যখন এক পরম সত্তা থেকে উদ্ভূত হয়ে একই পথ ধরে চরম ও পরম পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে তখন মানুষে মানুষে কি কোন প্রকারভেদ ভাব থাকা ঠিক? না, তা থাকা কখনও উচিত নয়। সকলকেই এমন সুযোগ দিতে হৰে বা এমন অনুকূল পরিবেশ তৈরী করতে হবে যাতে কেউ যেন ভাববার সুযোগ না পায় যে তার ভাগ্য চিরকালের জন্যে অবরুদ্ধ হয়ে গেল। তাই সকলেই যেন অনুভব করে যে এ পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সকলে এক বৃহত্তর মানব পরিবারের সদস্য।

"এক চৌকা, এক চুল্লা, এক হ্যায় মানব সমাজ"–

"সমানমস্তু বো মনঃ”। এক ভূমা সত্তা থেকে সব অণু সত্তা উদ্ভূত হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা সবাই সেই এক ও অদ্বিতীয় ভূমা সত্তায় মিলে মিশে এক হয়ে যাবে। তাই অণুসত্তা যতদিন সমাজের বুকে রয়েছে বা খণ্ড ব্যক্ত জগতে রয়েছে ততদিন তাদের এই চরম সত্যটা মনে রাখা উচিত যে বস্তুতঃ তারা এক ও অভিন্ন–একই সত্তা ভিন্ন ভিন্ন আধারে নিজেকে ব্যক্ত করে চলেছে। আর যতদিন এটা মনে থাকৰে, আর এই মনে রাখাটা এমন কোন শক্ত ব্যাপার নয়, তখন হবে কি, না, তখন একটা সত্যিকারের সমাজ তৈরী

হবে। মানুষ মাত্রেরই এই তত্ত্বটিকে মানতে চায় না, যারা এই তত্ত্বটাকে ভুলে থাকতে চায় তারা আসলে মানব সমাজের শত্রু। যারা জাতপাত, জাতিবাদ, প্রাদেশিকতাবাদ, সঙ্কীর্ণতাবাদ, জাতীয়তাবাদ এমনকি আন্তর্জাতিকতাবাদকে সমর্থ জানায় তারা বৃহত্তর মানব সমাজের শত্রু। মানুষের সমাজ কেবল মাত্র একটি 'ইজম্'–এর ওপরেই আধারিত হওয়া উচিত আর সেই 'ইজম্' হ'ল ইয়ুনিবাস্যালিজম্ বা বিশ্বৈকতাবাদ।

(১২ ই অক্টোবর, ১৯৭৮, পটনা)

অর্থ ও পরমার্থ

শাস্ত্রে বলা হয়েছে,–

'পাশৰদ্ধঃ ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তো ভবেচ্ছিবঃ'।

Pa'shabaddhah bhavejjiivah pa shamukto bhavecchivah.

সূচীপত্র

ব্যষ্টিসত্তা যখন মায়াজালে আৰদ্ধ থাকে তখন তাকে ৰলে জীব বা অণুমন; অর্থাৎ জীবের বৈশিষ্ট্য হ'ল ৰন্ধন। ব্রহ্মকৃপায় সাধনা দ্বারা যারা এই বন্ধন ছিন্ন করে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন তখনি তারা শিবত্বে উন্নীত হন। তহলে দেখা যাচ্ছে শিব ও জীবের মধ্যে মূলগত পার্থক্য মাত্র একটি বিষয়ে–শিব হ'ল ৰন্ধনমুক্ত আর জীব ৰন্ধনযুক্ত। ৰন্ধনের মধ্যে কে থাকতে চায়? কেউ না। সব মানুষই চায় স্বাধীনতা–মুক্তি, সকলরকম ৰন্ধন থেকে মুক্তি। মানুষ সাময়িকভাবে বিশেষ বিশেষ ৰন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, কিন্তু কিছুকাল পরে তার সেই ৰন্ধন আবার ফিরে আসে। এই অবস্থাটাকে একটা পাখীর অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে যেতে পারে। খাঁচায় আৰদ্ধ একটা পাখীকে খাঁচা থেকে বার করে এনে কিছুক্ষণের জন্যে একটা বড় ঘরে রাখা হ'ল, কিছুক্ষণ পরেই আবার তাকে আগের খাঁচার মধ্যেই পুরে ফেলা হ'ল। অল্পক্ষণের জন্যে এই মুক্তিতে জীবের কিছু লাভ হ'ল কী? এই ধরণের সাময়িক ৰন্ধন–মুক্তিকেই বলা হয়েছে 'অর্থ'। যেমন, একজনের খুব ক্ষিদে পেয়েছে। ক্ষুধার তাগিদে সে খাদ্য সংগ্রহে বাধ্য হবে। খাদ্য যোগাড় করতে পারলে সাময়িকভাবে ক্ষুধার নিবৃত্তি; অর্থাৎ ক্ষুধার প্রভাব বা ৰন্ধন থেকে সাময়িকভাবে তার মুক্তি। এখন এই খাদ্য এলো কোথা

থেকে? কী করে ওই ব্যষ্টিটি খাদ্য সংগ্রহ করলো?–টাকার সাহায্যে। এই টাকাই অন্য কথায় হ'ল 'অর্থ'। 'অর্থ' শব্দটির মানে করলে দু'টি শব্দ পাওয়া যায়–একটি হ'ল 'মানে', অন্যটি হ'ল 'টাকা'। টাকা সাময়িকভাবে ৰন্ধনমুক্তি এনে দেয়। আজ যে মানুষটি ক্ষুধার্ত সে টাকার সাহায্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলো, কিন্তু আগামীকাল আবার তার ক্ষুধার উদ্রেক হৰে, ওই মানুষটিরই আবার খাদ্যের প্রয়োজন হবে। সুতরাং টাকার সাহায্যে যে মুক্তি সে কখনোই স্থায়ী হতে পারে না। তবু এই ক্ষণস্থায়ী জগতে ক্ষণস্থায়ী বস্তুরই আমাদের প্রয়োজন হয়। এই আপেক্ষিক জগতে আপেক্ষিক বস্তু ও সত্তার পরিবেশেই আমাদের বাস করতে হয় আর সেই কারণেই আমাদের জিজ্ঞাসা, "জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কী হওয়া উচিত?" জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া উচিত 'আপেক্ষিক জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে' পরমসত্তার দিকে অগ্রসর হওয়া'। বহির্বিশ্বকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা; 'অর্থ' বা টাকাকেও অস্বীকার করতে পারিনা। সাময়িক দুঃখ–যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাৰার জন্যে অর্থের প্রয়োজন আছে ঠিকই; কিন্তু দুঃখ যন্ত্রণার হাত থেকে স্থায়ীমুক্তি যার সাহায্যে সম্ভব হয় তাই হ'ল 'পরমার্থ'। 'অর্থ' ও 'পরমার্থ'র মধ্যে এইটাই

হ'ল তফাৎ। মানুষের যোগ্যতা খুবই সীমিত। এই কথাকে অস্বীকার করা যায় না।

মানুষের ক্লেশ ত্রিবিধ–১) আধিভৌতিক, ২) আধিদৈবিক, ৩) আধ্যাত্মিক। আধিভৌতিক দুঃখ হ'ল সেগুলি যার কারণ হ'ল বস্তুজগৎ। আধিদৈবিক দুঃখ হ'ল সেইগুলি যার উৎস হ'ল অমূর্ত্ত জগৎ অর্থাৎ মানুষের মনোরাজ্য। এমন দেশও আছে যেখানে লোকেরা ভাল খায়–দায়, পরে। কিন্তু তারা কি সুখী? তারা সুখী নয়। দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, রোগ সবই তাদের আছে। প্রিয়জনকে হারিয়ে তারা চোখের জলে বুক ভাসায়। সুতরাং দুঃখ তাদেরও আছে। এই সব দুঃখ হ'ল আধিদৈবিক। এরপর হ'ল আধ্যাত্মিক দুঃখ। মানুষের মনের পরিধি খুবই ছোট। তাও আবার সীমিত বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত থাকে। এই সীমিত আভোগগুলি থেকে মনকে ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, সীমিত সুখ থেকে মনকে অসীম আনন্দময় সত্তায় রূপান্তরিত করতে হবে। সীমিত মানসিক সম্পদই হ'ল আধ্যাত্মিক ক্লেশের কারণ। সীমার বন্ধন ছিন্ন হলে সেই অবস্থাকে বলা হয় 'আধ্যাত্মিক মুক্তি'। 'আধ্যাত্মিক মুক্তি' স্থায়ী হলে তাকে ৰলৰ 'মোক্ষ'। মানুষের ক্ষমতা সীমিত। যে অর্থ মানুষকে ক্লেশ থেকে সাময়িক মুক্তির কাজে সহায়তা করে

সেই অর্থও সংসারে সীমিত। যদি একজনের হাতে কিয়ৎ পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হয় তবে সমপরিমাণ অর্থ থেকে অন্যজনকে বঞ্চিত হতে হয়। সুতরাং ইচ্ছামত প্রচুর অর্থ কারও হাতে সঞ্চিত হওয়া উচিত নয়। যাইহোক মানুষের ক্লেশকে দূর করার উপায় অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। অন্যান্য ক্লেশের সঙ্গে এই ক্লেশকে দূর করার জন্যে আমাকে এই নোতুন 'সামাজিক–অর্থনৈতিক–তত্ব' আবিষ্কার করতে হয়েছে। সেই সামাজিক–অর্থনৈতিক তত্ব হ'ল 'প্রাউট'। প্রাউট ছাড়া এই ক্লেশ দূর করে মানবতাকে রক্ষা করার অন্য কোন উপায় নেই। অন্নহীনকে পরমার্থের কথা শুনিয়ে লাভ নেই। বাস্তবজগতে ৰাঁচতে হলে অর্থের দরকার। অস্তিত্ব রক্ষার মাধ্যম হ'ল 'অর্থ'। আর সেইসঙ্গে দরকার হ'ল 'পরমার্থ'।

পরমার্থ হ'ল সেই তত্ব যা আমাদের ত্রিবিধ দুঃখ–ক্লেশের স্থায়ী নিবৃত্তি সাধন করে। 'স্থায়ী নিবৃত্তি' বলতে যে দুঃখ যন্ত্রণাগুলির অবসান হয়েছে আর ফিরে আসেনা সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। যদি এমন হয়ে থাকে যে ক্ষুধা ক্লেশের নিবৃত্তি হয়েছে আর ফিরে আসবে না তবে অর্থকে সেই নিবৃত্তির কারণ হিসেবে 'পরমার্থ' বলৰ। এখানে 'পরমার্থ' কথাটা তোমাদের বোঝানোর জন্যেই বললুম। আজ নোতুন

এক তত্ত্বের প্রয়োজন যাকে বৈবহারিক ক্ষেত্রে এখনই প্রয়োগ করা দরকার। নোতুন তত্ত্ব কোন সংকীর্ণ পরিসরের মন থেকে উদ্ভূত হতে পারেনা, যিনি উন্নত প্রবুদ্ধ মন নিয়ে বিশ্ব সংসারকে নিরীক্ষণ করছেন একমাত্র তিনিই নোতুন তত্ত্বের আবিষ্কর্তা হতে পারেন। অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। পরমার্থ হ'ল এক তত্ত্ব ও পরমার্থ সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে।

একদিকে আছে মানুষের দোষ, ত্রুটি, অপূর্ণতা যার থেকে সে নানাবিধ কষ্ট পাচ্ছে অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে কাজ করছে শক্তি স্বরূপিনী মায়া। এই মায়া হলেন প্রচণ্ড শক্তিময়ী। প্রতিনিয়তই মানুষকে বহুমুখী প্রবৃত্তি ও স্বার্থপরতার অধীনে এনে মায়া তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইছেন। যতদিন মানুষ অসহায়ভাবে বিশ্বমায়ার প্রভাবাধীন থাকে ততদিনই তার ওপর বিশ্বমায়ার জারিজুরি চলতে থাকে। আর যখন দেখেন তাঁর ৰন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে তখনই তাঁর বিভিন্ন শক্তির সাহায্যে তিনি সেই মানুষকে বিপথগামী করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন যাতে সে তাঁর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। এই দাসত্বের পরিবেশে মানুষ কখনও পরমার্থ লাভ করতে পারেনা। স্বামী অথবা স্ত্রীর কাছ থেকে ৰাধা আসে। কতকগুলো ক্ষেত্রে পিতামাতা এমনকি সমাজ থেকেও ৰাধা

আসে। এইভাবে বিভিন্ন দিক থেকে ৰাধা আসতে থাকে। এই সব বিভিন্ন ধরণের বাধা বিশ্বমায়ারই সৃষ্টি। এই সব ৰাধাকে অতিক্রম করতেই হবে। এখন বিশ্বমায়া যদি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষমতাশালিনী হয়ে ওঠেন তাহলে মানুষের পক্ষে করণীয় কী? মানুষের পক্ষে তার জন্যে দুশ্চিন্তার কারণ নেই, কারণ পরমপুরুষের আশীর্বাদ তার আছে। দু'টি শ্লোক আছে:–

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।।"
Daeviihyeśá guńamayii mama máyá duratyayá.
Mámeva ye prapadyante máyámetáí tarantite.

"ত্বম্ বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাহসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতদ্ ত্বংবৈ প্রসন্না ভূবি মুক্তি হেতুঃ।।"

Tvam vaeśńavii shaktiranantaviiryyá
vishvasya biijm paramási ma'ya'.

Sammohitam devii samastametad

সূচীপত্র

tvanívae prasanná bhúvi mukti hetuh.

এই অসীম ক্ষমতাময়ী মায়া হলেন ঐশীশক্তি। ও এই শক্তি ও ক্ষমতা সবই আমার। এখন যে ব্যষ্টি আমাতেই আশ্রয় করেছে, মায়া তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। কারণ মায়া তো পরমপুরুষেরই অংশ। পরমপুরুষ হলেন মায়া শক্তির নিয়ন্ত্রক। সুতরাং যে ব্যষ্টি পরমপুরুষকে আশ্রয় করতে পেরেছে মায়া তার কিছুই করতে পারে না–যতই তার শক্তি থাক না কেন। মানুষ কেবল সেই অবস্থাতেই মায়াকে প্রতিহত করতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি মায়াশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রয়োজন যে সর্বক্ষেত্রেই আছে তা নয়। মায়া নিজেই পরাজিত ও আত্মসর্মপণ করেন। সুতরাং বুদ্ধিমান মানুষের কী করণীয়? গতদিন আমি বলেছিলাম, "মানুষ মাত্রেরই উচিত –পুরুষ অথবা স্ত্রী সে যেই হোক না কেন–তাকে অহমিকা ত্যাগ করতে হবে।" মানুষ শুধু ভাববে, "আমি শিশু, পরমপুরুষের কোলে বসে আছি। মায়া আমার কী করতে পারে?" সত্যি মায়া তার কিছুই করতে পারে না। দ্বিতীয় আর একটা জিনিস এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যেটা এর আগেও আমি বলেছি। অনেকে ভাবে, "আমি পাপী, আমি অন্যায় করেছি" ইত্যাদি। এটাও ঠিক নয়। মানুষ যা চিন্তা

করে সে তাই হয়। তাই যে মানুষ সর্বদাই চিন্তা করেছে, "আমি পাপী, আমি পাপী।" সে শেষ পর্যন্ত পাপীই হয়ে যায়, যদিও সে প্রকৃত পাপী নয় তবুও। সুতরাং ওই ধরণের চিন্তা করে লাভ কী? ওটা হ'ল বিকৃত চিন্তা।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।”

Yádrshii bhávaná yasya siddhirbhavati tádrshii.

দস্যু, তস্কর ও দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে। যেমন একজন পকেটমার আর একজন সিঁধেল চোর। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব সমাজ ও বিশেষ ধরণের সামাজিক মান–মর্যাদা আছে। যেমন একজন পাকাচোর একজন পকেটমারকে তেমন আমল দেবেনা। সেই রকম পাপীদেরও বিভিন্ন স্তর আছে। পাপীরাও যে লোককে পাপী ৰলে উল্লেখ করে; দুকৃতকারীরা যাকে তাদের চেয়েও অধিকতর দুষ্কৃতকারী মনে করে–সেই লোক হ'ল সব পাপীদের চেয়েও পাপী। এই ধরণের পাপী যাকে অন্য পাপীরাও ঘৃণা করে, সেও যদি পরমপুরুষের কথা একাগ্র চিত্তে স্মরণ করে; যদি সে আমাতে আশ্রয় করে, ভাবে যে সে আমার কোলে বসে আছে আর বলে, "হে ঈশ্বর, আমি তোমার সন্তান, আমাকে রক্ষা কর–" এই

পাপীকেও আমি সর্বপাপ থেকে উদ্ধার করৰ। এ ব্যাপারে কারোর মাথাব্যাথার কিছু নেই। এই ধরণের মানুষ, তার অতীত জীবন যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হোক না কেন, যদি পরমপুরুষের আশ্রয়প্রার্থী হয় তবে অবশ্যই সে পাপমুক্ত হৰে। এ বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। "আমি পাপী, আমি পাপী" এই ধরণের চিন্তা তোমরা কখনই করবে না। এ ধরণের চিন্তাকে তোমরা কখনই প্রশ্রয় দেবে না। এই প্রসঙ্গে তোমরা মাদালসার গল্পটাও মনে রাখৰে।

(সকালবেলা, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭৮ কলিকাতা)

সমাজ ব্যবস্থা ও মহামান্যতা-হীনম্মন্যতা রোগ

অধিকাংশ মানুষই এই ধরণের মনের রোগে ভোগে-কেউ মহামান্যতা রোগে ভোগে কেউ বা ভোগে হীনম্মন্যতা রোগে। মানুষের যতগুলি অপরিহার্য গুণ থাকা উচিত তার অন্যতম

হ'ল এক সুসন্তুলিত মানসিক অবস্থা। অর্থাৎ মনের এমন একটা অবস্থা যেখানে মানুষ কোন প্রকার 'কমপ্লেক্স' বা মনের রোগে ভোগে না, এক কথায় মহামান্যতা, হীনম্মন্যতা, ভীতম্মন্যতা বা কোন ঘৃণার ভাব কোন কিছুই তার মনকে কলুষিত করতে পারে না। মানুষকে সর্বদাই সবরকমের কমপ্লেক্স-এর ঊর্ধ্বে থাকতে হবে। কোন কমপ্লেক্সকেই মনের মধ্যে জেঁকে বসতে দিলে চলবে না।

দোষ-গুণ মিলেই মানুষ। মানুষের অনেক গুণের একটি হ'ল এই কমপ্লেক্স-এর ঊর্ধ্বে থাকা। এখন প্রশ্ন হ'ল দোষ বলতে কী বোঝায়?

"নিদ্রা-তন্দ্রা-ভয়ং-ক্রোধ-আলস্যং-দীর্ঘসূত্রতা।
এতে হাতব্যাঃ ষড়দোষাঃ ভূতিমিচ্ছতা।।"

নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা এগুলি হ'ল ৰড় রকমের দোষ।যারা জীবনে উন্নতি চায় তাদের এই দোষগুলিকে ত্যাগ করতে হবে।'নিদ্রা'-মানে ঘুম। কেউ যেন নিদ্রারূপী কু-অভ্যাসের কৰলে বা খপ্পরে না পড়ে। আবার ধর কেউ কিছু ৰলছেন, তুমি সেটা শুণছো কিন্তু সেই সময়টার জন্যে তোমার মন পড়ে রয়েছে অন্যত্র এটা হ'ল 'তন্দ্রা'। এ প্রসঙ্গে আমি রামায়ণ থেকে একটা তন্দ্রার গল্প

শোণাচ্ছি। তোমরা জানতো রামায়ণ হ'ল একটা পুরাণ। পুরাণ ৰলৰ এই জন্যে যে এতে নানান গল্পের সন্নিবেশ ঘটেছে, আর সেই গল্পগুলো বিশেষ শিক্ষণীয়। যে গ্রন্থের বর্ণিত ঘটনা সত্য নয় কিন্তু তার শিক্ষাগত মূল্য আছে তাকে বলে পুরাণ। সেই রামায়ণে একটা ঘটনা আছে। রাম–লক্ষ্মণ তখন বনবাসে। লক্ষ্মণের ছিল নিরাপত্তা বিভাগের দায়িত্ব। তাঁর বড্ড ঘুম পাচ্ছিল। এতে তিনি অত্যন্ত অপ্রস্তুত ৰোধ করছিলেন। তাই রেগে গিয়ে নিদ্রাদেবীকে তাড়া করবার জন্যে তীর ধনুক তুলে নিলেন। তাই দেখে নিদ্রাদেবী লক্ষ্মণকে বললেন, তোমার মত একজন সাহসী বীর যোদ্ধার পক্ষে তীর–ধনুক নিয়ে একজন মহিলার উপর হামলা করা মোটেই শোভা পায় না। লক্ষ্মণ বললেন যে তাঁর দায়িত্বই যে নিরাপত্তা বিভাগের। তখন উভয়ের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসা হ'ল এই শর্তে যে আগামী চউদ্দ বছরের জন্যে লক্ষণের চোখের পাতায় নিদ্রাদেবী ক্ষণেকের জন্যেও বসবেন না। চউদ্দ বছরের জন্যে, রাম–লক্ষ্মণ–সীতা বনবাসে থাকবেন।

চউদ্দ বছর পরে অতিক্রান্ত হবার পর অযোধ্যায় রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে প্রকাণ্ড উৎসব চলছে। চউদ্দ বছর পার হওয়ার পর আবার লক্ষণের চোখ ঘুমে জড়িয়ে

এল। এবারও তিনি তীর-ধনুক নিয়ে নিদ্রাদেবীকে তাড়া করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু নিদ্রাদেবী প্ৰৱল প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন। কেন, আমি তো সন্ধির শর্ত অনুযায়ী চউদ্দ বছর পরে ফিরে আসছি। তাই হে লক্ষ্মণ! তীর-ধনুক নিয়ে আক্রমণ করার তোমার কোন অধিকারই নেই। লক্ষণ নরম সুরে নিদ্রাদেবীকে অনুরোধ জানিয়ে বললেন-দেখুন আমি এখন খুব ব্যস্ত রয়েছি। যুবরাজ রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক চলছে, আমাকে চামর ব্যজন করতে হচ্ছে। অন্ততঃ এই সময়টুকুর জন্যে যেন আমি নিদ্রাগ্রস্ত হয়ে না পড়ি।

নিদ্রাদেবী বললেন-তাহলে আমি এখন যাই কোথায়। আমি তো আমার পুরো শক্তি নিয়েই পৌঁছে গেছি। লক্ষ্মণ জানালেন-তাহলে এক কাজ করুন, ধর্ম সভায় গিয়ে খোঁজ করুন কোন্ কোন্ অধার্মিক মানুষ সভায় বসে রয়েছে। তাদের চোখের পাতার উপর গিয়ে বসুন।

তাই আমি তোমাদের সবাইকে ৰলি, সাবধান থেকো। তোমরা ধর্মসভায় যোগ দিতে এসেছো। তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ো না।

এবার আসছি 'ভয়ে'র কথায়। ভীতম্মন্যতা মানুষের একটা মস্তবড় দোষ। আর অবশিষ্ট দোষগুলো হ'ল ক্রোধ, আলস্য ও

দীর্ঘসূত্রতা। 'দীর্ঘসূত্রতা' মানে হ'ল হাতের কাজকে না সেরে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু এমন ঢিলেমি করা।

আগেই বলেছি মনের সাম্যাবস্থা বজায় রাখা মানুষের একটা মস্ত বড় গুণ। সাম্যবস্থা–প্রাপ্ত মনে কোন কমপ্লেক্স বাসা বাঁধতে পারে না। সে অবস্থায় মানুষ নিজেকে কারো চেয়ে বড়ও মনে করে না, ছোটও মনে করে না। কাউকে ভয়ও করে না, কোন কিছুতেই বিচলিতও হয় না। সর্বাবস্থাতেই একটা সুন্দর মানসিক ভারসাম্য বজায় রেখে চলে।

ত্রুটিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার ফলেই মানুষের মনে হীনম্মন্যতা ও মহামান্যতা রোগ শিকড় গাড়বার সুযোগ পায়। ভীতম্মন্যতা রোগটা ঠিক সে কারণে জন্মায় না। এটা একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের রোগ। আবার এমন কিছু লোক আছে যাদের সমাজে ক্রীতদাসের জীবনযাপন করতে হয়। আর তাই তারা জবরদস্ত হীনম্মন্যতা রোগে ভোগে। তাদের মাথা বরাবরই হেঁট হয়ে থাকে। আবার এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা জন্মসূত্রেই বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়ে যায়। ভূসম্পত্তি তথা বংশ কৌলিন্যের উত্তরাধিকার পেয়ে যায়। সেই প্রাপ্ত ঐশ্বর্যের গর্বে তাদের মাথা এতখানি উঁচু হয় যে মনে

সূচীপত্র

হয় যেন তাদের মাথা পিছনদিকে ঝুলে পড়েছে। এই যে কমপ্লেক্স এদের জন্ম হয়, ত্রুটিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায়। কমপ্লেক্স জিনিসটাই হ'ল ভৌতিক–জগৎ তথা সামাজিক অর্থনৈতিক স্তরের জিনিস। আধ্যাত্মিক স্তরে বা আধ্যাত্মিক আস্তিত্বিক স্তরে কমপ্লেক্স ৰলে কোন জিনিস থাকে না বা থাকতে পারে না।

আধ্যাত্মিক জগতে কোন কমপ্লেক্স জাগতেই পারে না এই কারণে যে, প্রতিটি মানুষের পরমপুরুষের সঙ্গে একটা একান্ত বৈয়ক্তিক সম্পর্ক রয়ে গেছে। তাই পরমপুরুষ ও ভক্তের মধ্যে মাঝখানটিতে কোন তৃতীয় সত্তার অস্তিত্বই নেই। রয়েছে কেবল দু'টি সত্তা সাধক ও পরমপিতা। সাধক পরমপিতার দিকে এগিয়ে চলে ও শেষ পর্যন্ত তাঁর স্নেহময় কোলটিতে উঠে বসে। প্রতিটি জীবেরই এটা জন্মগত অধিকার। তথাকথিত নীচজাতি, বর্ণ, শিক্ষা, দারিদ্র্য কোন একটি অজুহাতেই কাউকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলবে না, যেহেতু এ ব্যাপারে সকলের জন্মগত অধিকার রয়েছে।

তাই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কোন প্রকার কমপ্লেক্সের স্থান নেই। ত্রুটিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থাই মানুষের মনে হীনম্মন্যতা রোগ ঢুকিয়ে দেয়। এমন কি মানুষ যখন আধ্যাত্মিক জগতেও পদার্পণ করে তখনও এই রোগ তার মন থেকে দূর হতে চায়

না। তারা ভাবে যে যেহেতু পরমপুরুষ এত বিরাট, এত মহান তাই নীচ কুলজাত দরিদ্র ও অশিক্ষিত অতি সাধারণ মানুষ হয়ে তারা পরমপুরুষের কাছটিতে কী করে যেতে পারে? শাস্ত্রীয় ভাষায় একেই বলে মহিম্নৰোধ। কিন্তু এ কথাটা ভুলে গেলে চলবে না যে ভক্ত ও পরমপুরুষের মধ্যে যে সম্পর্ক তা হ'ল পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। এমনকি পিতা যদি বিরাট পণ্ডিতও হন, অশিক্ষিত শিশু পুত্র তাঁর কাছেই যায়, আর তার যা দরকার তা পাৰার জন্যে তাঁরই কাছে বায়নাক্কা করে, কারণ শিশুর প্রতি তার বাপ-মায়ের যে গভীর মমতা থাকে।

একটু আগেই ৰললুম যে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কোন কমপ্লেক্সের স্থান নেই। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক কাঠামোর জন্যেই মানুষের মনে কমপ্লেক্স তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে। আমাদের এই সামাজিক সংরচনায় যেখানে যেখানে ফাঁক রয়েছে, ত্রুটি রয়েছে, আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে আমাদের করণীয় হ'ল সেগুলি সংশোধন করা। যদি তা করতে না পারি সমাজে বড় বড় সাধক জন্মাবে না। যাদের মধ্যে বড় বড় আধ্যাত্মিক সাধক হবার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের পক্ষেও উন্নতি লাভ করা সম্ভব নাও হতে পারে। - তাদের অবস্থাটা

হ'ল ঠিক সেই ধরণের ফুলের মত যা প্রস্ফুটিত হৰার আগেই বৃত্ত থেকে ঝড়ে পড়ে।

আমরা এমনটা হতে দিতে পারি না। এই জনেই 'প্রাউট' তত্ত্বের উদ্ভাবন করা হয়েছে যাতে করে মানুষ দ্রুততার সঙ্গে উন্নতির পথ ধরে এগিয়ে চলে। যদি কারও মধ্যে মহামান্যতাৰোধ থেকে থাকেও তাহলে সেটা থাকৰে এই কারণে যে মানুষ মাত্রেই বিশ্বপিতার সন্তান, যে বিশ্বপিতা এই সুমহান এত শক্তিমান। মানুষের উচিত কেবল এই ধরণের মহামান্যতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া। মানুষের যা কিছু সম্পদ তা সবই এই বিশ্বপিতার দান। আর তাই কোন একক মানুষের মহামান্যতাকে প্রশ্রয় দেবার অধিকার নেই। তাই অস্তিত্বিক ক্ষেত্রে কোন প্রকার কমপ্লেক্সেই টিকিয়ে রাখার কোন সঙ্গত কারণ নেই। অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সকলের মধ্যে একটা সাধারণ কমপ্লেক্স থাকলেও থাকতে পারে। তাই কেউ কারও চেয়ে হীন বা নীচ নয়। আবার কেউ কারও চেয়ে বড়ও নয়।

পরমপুরুষ জীবের কাছ থেকে খুব দূরেও না, খুব কাছেও না। কারণ তাঁর কর্ত্তব্যই হ'ল সবাইকার দেখাশুনা করা। আর যেহেতু সকলকেই দেখাশুনা করাটাই তাঁর কর্ত্তব্য, তাই

তিনি সকলের দেখাশুনা করবেনও। তিনি সকলের যথাযোগ্য যত্ন নেবেন। সকলকেই ঠিকমত দেখাশুনা করবেন। এটা তাঁকে করতে হবেই, কেন না তিনি যে সকলকে ভালবাসেন। আর এটা তাঁর কর্তব্যও। ধর কোন একটি যুবক অসৎ সঙ্গে পড়ে বিশ বছর বয়সেই সিগারেট খাওয়ার কুঅভ্যাস ধরেছে। সে চায় না যে তার বাবা তার এই ধূমপানের কদভ্যাসের কথা জেনে ফেলুন। কিন্তু পরমপিতা তো তা জানছেন, তা দেখছেন। হয়তো তিনি কিছু বলছেন না। কেননা তাতে হয়তো ছেলে লজ্জা পাৰে। তাঁকে প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে হয় কি না (কারণ কে কী করছে তা তো জানতে হৰে, তবেই না সকলের যত্ন নেওয়া সম্ভব হবে)। তাই তাকে প্রতিটি একক সত্তার সঙ্গে মিলেমিশে থেকে যেতে হয়। আর একেই বলা হয় পরমপুরুষের ওতঃ যোগ। তিনি সামগ্রিকভাবে সকলের সঙ্গে যুক্ত। আর একে বলা হয় প্রোতযোগ। এই পৃথিবীতে যেই তাঁর আস্তিত্বিক সংরচনা নিয়ে হাজির হয়েছে পরমপুরুষ তাঁকেই দেখাশোনা করবেন। এমনকি যাঁরা মানবদেহ ছেড়ে আগেই চলে গেছেন কিন্তু এখনও কোন নতুন জৈব আধার পাননি কিন্তু তবু আস্তিত্বিক জগতে তাঁর উপস্থিতি রয়েছে, তিনি তাদেরও দেখেন। বস্তুতঃ তিনি সকলের সঙ্গে আছেন। আর এ বিচারে তাই কেউই ছোট বা

বড় হতে পারে না। এই কারণে আস্তিত্বিক ক্ষেত্রে কোন প্রকার কমপ্লেক্সই মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটাকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হৰে যাতে মানব মনে কোন কমপ্লেক্সই ঢুকুতে না পারে। আমাদের এমন ধারা সমাজ ব্যবস্থাগড়ে তুলতে হবে........ আর গড়ে তুলতে হৰে এই মুহূর্তেই, অবিলম্বে।

চতুর্বর্গ ও ভক্তি

রামায়ণে একটা ছোট্ট গল্প আছে। একবার রাম–লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র গঙ্গা পার হয়ে মিথিলায় যাচ্ছিলেন। তোমরা সবাই জান যে সংস্কৃত সাহিত্যে চারটে বিশেষ ধরণের শব্দ আছে। একটা হ'ল 'কাব্য', দ্বিতীয়টা 'পুরাণ', তৃতীয়টা 'ইতিকথা' আর চতুর্থটা হ'ল 'ইতিহাস'। কাব্য বলা হয়– 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। কোনো কথাকে যদি খুব সরস করে (in a lucid way), বেশ গুছিয়ে বলা হয়, তখন তাকে বলা হয় 'কাব্য'। তা সেটা সত্য ঘটনা

সূচীপত্র

হতেও পারে, নাও হতে পারে, শিক্ষাপ্রদ হতেও পারে, নাও পারে। কেবল খুব সরস করে বলা হলেই হ'ল কাব্য।

দ্বিতীয়টা হ'ল পুরাণ। পুরাণ হ'ল কী? ঘটনটা সত্য নয় কিন্তু তার শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে, educative value রয়েছে। শিক্ষাগত মূল্য থাকলেই তখন সেটাকে পুরাণ ৰলৰো। যেমন ব্যাসদেব আঠারটা পুরাণ লিখেছিলেন। পুরাণগুলো সবই গল্প, কোনটাই সত্য নয়। কিন্তু লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে গল্পগুলো তিনি তৈরী করেছিলেন। পুরাণে নানান দেবদেবীর বর্ণনা করা হয়েছে, নানান কিছু বলা হয়েছে। অবশ্য যেহেতু জিনিসগুলো সত্য নয়, সেইহেতু পুরাণগুলো লেখার পরে ব্যাসদেবের মনে গ্লানিও হ'ল। আত্মগ্লানি হ'ল এই জন্যে তিনি পরমপুরুষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষাও করেছিলেন।

'রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো যদ্ধ্যানেন কল্পিতম্
স্তত্যাহনির্বচনীয়তাহখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।।
ব্যাপিত্বং চ নিরাকৃতং ভগবতো যৎ তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশো তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্।।'

Rupam rúpavivarjjitasya bhavato
yaddhyanena kalpitam.
Stutyánirvacaniitákhilaguro

duriikrta yanmayá.
Vyápitvam ca nirákrtmbhagavato
yat tiirthayátrádiná.
Kśantavyam jagadiishotadvikalatá
dośatrayamí matkrtam.

"হে পরমপুরুষ, তোমার কোনো রূপ নেই, তুমি অরূপ, তবু আমি নানান দেবীদেবতার কারো দশ হাত, কারো চার হাত–অমুক–তমুক নানান কিছু বলেছি। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লোকশিক্ষা দেওয়া। কিন্তু তা করতে গিয়ে, হে অরূপ–তোমাকে আমি রূপের ৰন্ধনে আবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছি। এটা আমার এক নম্বর অপরাধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় অপরাধ হ'ল, তুমি গুণাতীত, গুণগুলোই তোমার অধীনে। তাই তোমাকে গুণেতে বাঁধা যাবে কী করে? অথচ তোমার নানান গুণের বর্ণনা করে স্তুতি–গাথা তৈরী করে দিয়েছি। তাতে তোমাকেই ছোট করা হয়েছে। আর তৃতীয় অপরাধ হ'ল–তুমি সর্বব্যাপী, তবু বলেছি অমুক তীর্থে ভগবান এই কাজটা করেছিলেন, তমুক তীর্থে ওই কাজটা করেছিলেন। এই বলে তোমাকে বিশেষ বিশেষ স্থানে ৰদ্ধ করৰার, বেঁধে ফেলৰার

চেষ্টা করে ফেলেছি। এটাও একটা অন্যায় হয়েছে। কারণ গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তো তীর্থ। তুমি সব জায়গাতেই রয়েছো। তথাপি আমি বিশেষ বিশেষ জায়গায় তোমাকে সীমিত করবার চেষ্টা করে এই তিন নম্বর অপরাধটা করে ফেলেছি। তা তুমিই আমাকে ক্ষমা করো। আমার এই চিত্তবিকলতার ফলে, মানসবৈকল্যের ফলে, মনের দুর্বলতার ফলে আমি যে এই তিনটি ভুল করে ফেলেছি– এই তিনটে ভুলের জন্যে, তিনটে দোষের জন্যে তুমি আমায় ক্ষমা করো। এই হ'ল পুরাণ। পুরাণ হ'ল–ঘটনা সত্য নয় কিন্তু তাতে শিক্ষাগত মূল্য খুব বেশী। রামায়ণ তেমনিই একটা পুরাণ। সত্য ঘটনা নয় কিন্তু রামায়ণের শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে।

বাকী দু'টোর একটা হ'ল ইতিকথা, আর একটা হ'ল ইতিহাস। ইতিকথা হ'ল ঘটনার যথার্থ পঞ্জীকরণ। যেটা যেমন ঘটে গেছে ঠিক তেমনটি লিপিবদ্ধ করে যাওয়া ও লোকের অবগতির জন্যে তা প্রচার করা। এই হ'ল ইতিকথা। ইতিকথাকে সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় পুরাকথা। ইতিবৃত্ত বা পুরাবৃত্তও বলা চলে ও ইংরেজীতে তা হ'ল History ।

এবার ইতিহাস। ইতিহাস হ'ল ইতিকথার সেই সামান্য অংশটুকু যা পাঠ করে মানুষের কল্যাণ হয়। অর্থাৎ যার

educative value আছে, শিক্ষাগত মূল্য আছে। গোটা ইতিকথা পড়ে, গোটা History পড়ে যদি তাতে মানুষের বিশেষ লাভ নাও হয় কিন্তু যে অংশটুকু পড়লে বা জানলে মানুষের লাভ হয় কেবল ততটুকু অংশের নাম হ'ল ইতিহাস। ইতিহাসের কোন ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই। ভুল করে History of India কে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলা হয়। ওটা ভুল। বলা উচিত–ভারতবর্ষের ইতিকথা। তাহলে চতুর্থটা হ'ল ইতিহাস যার educative value রয়েছে। শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে। ইতিহাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে–

'ধর্মার্থকামমোক্ষার্থং নীতিবাক্যসমন্বিতম্
পুরাবৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসঃ প্রচক্ষতে'।।
Dharmarthakamamoksártham
niitivakyasamanvitam.
Purávrttakatháyuktamitihash pracaksate.

যার থেকে মানুষের ধর্ম–অর্থ–কাম–মোক্ষ–এই চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তি ঘটে, যাতে নীতিকথা রয়েছে–এই ধরণের যে ইতিকথা তাকে বলা হয় ইতিহাস। যেমন, মহাভারত হ'ল একটা ইতিহাস। স্কুল–কলেজে যা পড়ানো হয় তা মুখ্যতঃ ইতিকথা অর্থাৎ History। তা এই যে ইতিহাস, এই ইতিহাস

পড়ে মানুষ কী পায়?–না, ধর্মার্থকামমোক্ষার্থং অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ–এই চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তি হচ্ছে। তার সঙ্গে নীতিকথাও শিখছে।

চতুর্বর্গ কী হ'ল?–না, কাম মানে জাগতিক প্রয়োজনগুলোর পূর্ত্তি অর্থাৎ fulfilment of physical necessities। অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচৰার মত বাঁচতে চাই, চিকিৎসা চাই, নিবাস চাই। এই যে জাগতিক প্রয়োজনগুলো, এই গুলোর পূর্ত্তি হচ্ছে যার দ্বারা সেটা হ'ল কাম–এই চতুর্বর্গের প্রথম বর্গ। এখন, এটাও পাচ্ছি কার থেকে?–না, ইতিহাস থেকে। এই যে জাগতিক প্রয়োজনগুলো, চতুর্বর্গের প্রথম বর্গ, এই জাগতিক প্রয়োজনগুলোর পূর্ত্তি ঘটাতে হবে কার দ্বারা? সেও দর্শনের দ্বারা। সেও ইতিহাসের দ্বারা। আর এই প্রয়োজন মেটাৰার জন্যেই একদিন আমি অবস্থার চাপে পড়ে 'প্রাউট' দর্শন তৈরী করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ, যে মানুষটা খেতে পাচ্ছে না, আগে আমি তাকে অন্ন দোব, তারপর তাকে শেখাৰো অধ্যাত্ম দর্শন। তারপর তাকে সাধনায় বসাৰো। হ্যাঁ, খাইয়ে তারপরে তাকে গাছে গাছে নাচতে লাফাতে দোৰ না, তাকে সাধনাতেই বসাবো কিন্তু তার পেট ভরাৰার ব্যবস্থাটা করতে হবে তো। শীতের সময়

তার বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে, তার আবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলো প্রাথমিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজন পূর্ত্তি না হলে কখনো সামগ্রিক ভাবে মানুষ জাতের উন্নতি সম্ভব নয়। সুতরাং এই physical practicality, এই বাস্তব জগতের যে বাস্তকিতা, যে সম্বন্ধে শিব তন্ত্রে বলেছেন–'বর্তমানেসু বর্তেত'। বর্তমানকে উপেক্ষা করে কেউ এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবে না–এইটিই শিবের সোজা নির্দেশ। তো সেই নির্দেশ আমরাও আনন্দমার্গে উপেক্ষা করিনি ও করিনি বলেই প্রাউট দর্শনের সৃষ্টি করা হয়েছে যাকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না। যে অস্বীকার করে সে আত্মপ্রবঞ্চনায় রত রয়েছে, সে কপটাচার। এটা চতুর্বর্গের প্রথম বর্গ।

দ্বিতীয় বর্গটা হচ্ছে কী?–না, 'অর্থ'। অর্থটা হচ্ছে কী? না, অভাবনিবৃত্তি। এই – অভাবনিবৃত্তিটা কেবল physical sphere–য়ে, জাগতিক স্তরেই নয়। এটা দেহগত ও মনোগতও (physico–psychic) বটে। যার দ্বারা এইসব অভাবের নিবৃত্তি ঘটে তাকে বলা হয় 'অর্থ' ও যার দ্বারা অভাবের স্থায়ী নিবৃত্তি ঘটে তাকে বলা হয় 'পরমার্থ'। অর্থ, পরমার্থ–একটা হ'ল নিবৃত্তি আর অন্যটা হ'ল আত্যান্তিকী নিবৃত্তি। অর্থ হ'ল যার দ্বারা শারীরিক–মানসিক প্রয়োজনের পূর্ত্তি ঘটে

(fulfilment of physico-psychic ne- cessities are effected)। সেটা হ'ল দ্বিতীয় বর্গ। এখানে অর্থ মানে টাকা-পয়সা নয়। তবে টাকা-পয়সাকেও অর্থ বলা হয় কারণ টাকা-পয়সার দ্বারাও সাময়িকভাবে অভাবের নিবৃত্তি ঘটে। তাই টাকা-পয়সাকে সংস্কৃতে 'অর্থ' ৰলে। আবার কোনো জিনিসের মানে কেউ জানতে পারলো না, যেমন কদলী মানে কী?-জানলে না। সুতরাং মনের মধ্যে একট অভাব তৈরী হচ্ছে তো? 'কদলী' মানে কী-জানি না। মানসিক একটা অভাব তৈরী হচ্ছে। তারপরে যেই মানুষ জানলো, কদলী মানে রম্ভা তখন অভাবটা দূর হয়ে গেল। তো এই meaning-কেও তাই সংস্কৃতে 'অর্থ' বলা হয়। অর্থাৎ যেটা পাৰার পর মনের অভাবটা দূর হয়ে গেল। তাই 'অর্থ' মানে টাকাও, অর্থ মানে 'মানে'ও ও অর্থের আসল মানে হ'ল যার দ্বারা অভাবের নিবৃত্তি ঘটছে। এটা হ'ল দ্বিতীয় বর্গ।

তৃতীয় হ'ল 'ধর্ম'। ধর্ম মানে যার দ্বারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক (psycho- spiritual) স্তরের প্রয়োজন মিটছে। psycho-spiritual মানে কেবল জাগতিক অভাব নয়-তার ঊর্ধ্বতর অভাবও রয়েছে, সূক্ষ্মতর অভাবও রয়েছে। যার টাকা-পয়সা ঘর-দোর কোন কিছুরই অভাব নেই সেও ঘর

ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কেন বেরিয়ে পড়লো? কেন রাজার ছেলে সন্ন্যাস নেয়? কিসের অভাবে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়েছিলেন? কী প্রয়োজনে বুদ্ধ ৰাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছিলেন? তাঁদের জাগতিক অভাব তো কোনো কিছুই ছিল না। অর্থাৎ কাম ও অর্থ–এ দুটোর প্রয়োজন তো ছিলই না। কেন বেরুলেন?–না, মনের কোণে কোথায় যেন একটা অভাব লুকিয়েছিল। সূক্ষ্মতর জগতে উঠেই মানুষ সেটা বুঝতে পারে যে এ জগতের কিছুই তো জানি না। ঢুকেছে সেই জগৎটায় অথচ সেই জগৎটাকে মানুষ চিনতে বা বুঝতে পারছেনা। এই হ'ল ধর্মীয় অভাব বা ধর্মীয় প্রয়োজন। এইটা হ'ল তৃতীয় বর্গ। ধর্ম হ'ল, সাইকো–স্পিরিচুয়্যাল অর্থাৎ মানসাধ্যাত্মিক প্রয়োজনের পূর্ত্তি ঘটে সেইটা হ'ল ধর্ম। এটা হ'ল তৃতীয় বর্গ।

শেষের বর্গটা হ'ল মোক্ষ। মোক্ষ হ'ল মানুষের যখন পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে যখন সেই পূর্ণ অভিব্যক্তিটা তার বোঝা হয়ে দাঁড়ায় তখন সে চায়, যার থেকে এই অভিব্যক্তির সূত্রপাত, পূর্ত্তি তাকেই ফিরিয়ে দিই তার জিনিস।

'তব দ্রব্যং, গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।

সূচীপত্র

Tava dravayam, Govinda
tubhyameva samarpaye.
Nivedayami catmanam
tvam gatih parameshvara.

এই শেষ স্তর। এটাকে বলা হয় মোক্ষ। যে পুস্তকের ঘটনাবলী পড়ে ও জেনে এই চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তির পথ সুগম হয় তাই হ'ল ইতিহাস। সুতরাং স্কুলে কলেজে ইতিহাস পড়ানো হয় না। রামায়ণ হ'ল আসলে একটা পুরাণ ও তার গল্পগুলো সবই শিক্ষামূলক। যাক আসল কথাটায় ফিরে আসি। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। যেহেতু রামায়ণ পুরাণ, তাই তার সঙ্গে বাস্তবিক সংগতি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা বৃথা, সেটা শিক্ষামূলক কিন্তু সত্য নয়। তারপরে নৌকায় যেতে যেতে অন্যপারে মিথিলায় গিয়ে দেখা গেল- শ্রীরামের চরণের স্পর্শে নৌকাটা সোণা হয়ে গেছে। তখন নৌকার যে মাঝি, কর্ণধার সে দেখল, "আরে ৰাৰা, এ কি হয়েছে! তবে এ তো সাধারণ মানুষ নয়”। সে তাড়াতাড়ি দৌড়ে তার বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীকে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা বললে। তখন তার স্ত্রী বাড়ীতে যত কাঠের জিনিস ছিল-চাকী

বেলুন.....ইত্যাদি যা কিছু–সব নিয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এলো আর রামের চরণে স্পর্শ করিয়ে সেগুলোকে সোণা করে নিলো। এখন কাঠের জিনিস ৰাড়ীতে অনেক কিছুই তো থাকে। অতোশত জিনিস আনা আর সোণা করে নিয়ে যাওয়া, আৰার সোণা হয়ে গেলে সে তো ভারীও হয়ে যায় অনেক বেশী। সুতরাং মাঝির স্ত্রী'র তো পিঠে ব্যথা হয়ে গেল। হাতে, পিঠে, গায়ে ব্যথা, দারুণ ব্যথা আর বইতে পারছে না। তবু মোহ শেষ হচ্ছে না। আরো সোণা চাই......আরো সোণা চাই। অর্থাৎ নিজেকে আরো ভালভাবে জাগতিক ৰন্ধনে ৰদ্ধ করতে চাই। মানুষের ওই রকমই হয়। পিঠে ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, তবু ছাড়তে পারছে না। যেমন পেটুক লোকের নেমন্তন্ন ৰাড়ীতে, ভোজৰাড়ীতে গিয়ে খেতে খেতে এমন হয় যে আর খেতে পারছে না, কষ্ট হচ্ছে, তবু আরো দু'টো রসগোল্লা খাবে। পরের পয়সায় পাই তো টিংচার আয়োডিন খাই। সুতরাং মাঝির স্ত্রীরও সেই অবস্থা হ'ল।

বইতে পারছে না, তবু ছাড়তেও পারছে না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন না–

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।

সূচীপত্র

মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই
চাহিতে গেলে মরি লাজে"।

মানুষেরও এই অবস্থা। তখন মাঝি তার স্ত্রীকে বললে– "দেখ, তুই ভীষণ বোকা। তুই কত বোঝা বইৰি। বোঝা বওয়া তোর শেষ হবে না। তুই বোঝা বইতে বইতে মরে যাবি, তোর সোণার লোভ শেষ হবে না। লোভের সতৃপ্তি হবে না। তুই ৰোকা"। তখন মাঝির স্ত্রী বললে, "আমি হয়তো বোকা। কিন্তু কি করৰো ৰল"। মাঝি বললে, "যে চরণের এত গুণ, যে চরণস্পর্শে সব সোণা হয়ে যাচ্ছে, সেই চরণ দু'টোকে নিজের ঘরে নিয়ে যা। তাহলে বোঝা বওয়ার প্রয়োজন হবে না"। তখন মাঝির স্ত্রী রামের কাছে গিয়ে বললে, "তোমাকে চলতে হবে"। আর রাম যেতে রাজী নন। তখন চাপে পড়ে রাম গেলেন ও গিয়ে বসলেন। তখন হ'ল কী? মাঝির স্ত্রী ভুলে গেল যে ৰাড়ীর সবকিছুকে সোণা করতে হবে। তখন সে সেই চরণ দু'টো নিয়ে ব্যস্ত। মানে, আসল জিনিস পেয়ে গেছি আর সোণা করে লাভ কি? যখন ইচ্ছে যাৰে, করে নেৰ। এখন তো পেয়ে গেছি আসল জিনিসটা। তখন মাঝির স্ত্রী বললে, "রাম, তুমি যে এসেছিলে তার প্রমাণ স্বরূপ আমায় কিছু দিয়ে যাও"। তখন রাম ওকে চারটে সুস্বাদু ফল দিলেন। মাঝির স্ত্রী বললে, "ফলগুলো কি

গো? কোন দেশী ফল, কিসের ফল, এর নাম কী"? তখন লক্ষ্মণ ঠাকুর বলে দিলেন ঐ চারটে ফলের নাম হ'ল–ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ–এই চতুর্বর্গ। এ চরণ পেয়ে গেলে আর চতুর্বর্গ খুঁজতে হয় না। আপনা থেকে এসে যায়। ওদিকে মাথা ঘামাবার দরকার হয় না। যে ভক্ত, তাকে এসব নিয়ে ভাবতে হয় না, তাকে চতুর্বর্গ নিয়ে ভাবতে হয় না। তার ভাববার কোন প্রয়োজনই নেই। যাতে ভাবতে না হয় সেই জন্যেই জাগতিক স্তরে যা একটু অসঙ্গিত বা ত্রুটি ছিল সেটাকে পূর্ণ করবার জন্যে আমি 'প্রাউট' তৈরী করে দিয়েছি। ও বাকীগুলো নিয়ে ভাববার কোনো প্রয়োজন অতীতেও ছিল না, আজও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। তবে জাগতিক একটু আধটু অসঙ্গতি দেখা দিতো বলেই 'প্রাউট' তৈরী করে দিয়ে জিনিসটাকে আমি সম্পূর্ণ করে দিয়েছি।

তখন সবাই বললে, “লক্ষ্মণ ঠাকুর, তোমার দাদা তো চারটে ফল দিলেন, তুমিও কিছু দাও”। তখন লক্ষ্মণ ঠাকুর বললে, "আমি তো গরীব মানুষ, আমি কি দেবো। তা আমার কাছে একটা ফলই আছে, সেইটাই তুমি নাও। তখন সবাই বললে "ফলটার নাম কী, এই ফলটার নাম কী"? তখন লক্ষ্মণ বলল 'এই ফলটি না পেলে ওই চারটে ফল

পাবে না'। তখন সবাই বললে, লক্ষ্মণ ঠাকুর, ফলটার নাম বল তাড়াতাড়ি। কারণ ওই চারটে ফলের গুণ এই ফলটায় আছে, এইটে পেলে তবে না চারটে পাব"। লক্ষ্ম ণ ঠাকুর বললে, 'আমি তো গরীব মানুষ। এই ফলটার নাম হ'ল 'ভক্তি'।

কলিকাতা ১১/১২/1৭৭৮

আধ্যাত্মিক, মানসিক ও জাগতিক ভূমি

মানুষের জীবন তিনটি স্তরে বিভক্ত, তিনটি ভূমিতে মানুষ কাজ করে যায়। একটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক ভূমি, একটা হচ্ছে মানসিক ভূমি, আর একটা হচ্ছে স্থূল জাগতিক ভূমি। আজকেই একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল যে, আধ্যাত্মিক ভূমিতে মানুষের যা দুঃ খ সেটা দূর করে মানুষ ব্যষ্টিগত প্রয়াসে।

তৎসহ 'মহৎ কৃপয়ৈব ভগবতকৃপালেশাদ্বা'। মানুষকে নিজে চেষ্টা করে যেতেই হবে। মানুষ চেষ্টা করবে। আর তার সঙ্গে সে যদি মহান মানুষের কৃপা–আর্শীবাদ পায়, ও তার সঙ্গে পায় পরমপুরুষের সামান্য একটুখানি কৃপা, অনেকখানি দরকার নেই, একটুতেই হয়ে যাবে। এই হ'ল আধ্যাত্মভূমির ব্যাপার। এ সম্বন্ধে কোনো মানুষের চিন্তা করবার কোনো কিছুই নেই। কোনো কিছুই চিন্তা করৰার নেই এই কারণে পরমপুরুষের অস্তিত্বটা, পরমপুরুষ যে আছেন তাঁর এই থাকাটাই তো জীবের কল্যাণের জন্যে। জীবের যদি কল্যাণ না থাকতো তাহলে পরমপুরুষ নির্গুণ হয়েই থেকে যেতেন। সগুণেও নামতেন না, তারক ব্রহ্মক্ষও হতেন না। তার মানেই তাঁর উদ্দেশ্য রয়েছে জনসেবা, মানুষের ভাল করা। তাই তিনি ৰলেছেন–

'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'।।

Paritránáya Sadhunám
Vináshává ca duskrtám.
Dharmasamsthápanártháya

সূচীপত্র

sambhavámi yuge yuge.

পরমপুরুষের ৰারৰার পৃথিবীতে আসবার দরকারটাই বা কী? লোকের ভাল করবার জন্যেই তো। লোকের ভাল বলতে এখানে মুখ্যতঃ আধ্যাত্মিক ভূমিতে কিন্তু গৌণতঃ মানসিক ও স্থূল জগতেও। কারণ তিনি মানুষের কল্যাণস্বরূপ। সমস্ত জীব তাঁর সন্তান। মানুষের কল্যাণ তিনি করবেন কেবল আধ্যাত্মভূমিতে কিন্তু মানসিক ভূমিতে ও স্থূল জগতে করবেন না এমনটি তো আর হতে পারে না। সর্বক্ষেত্রেই করতে হবে। তো, আধ্যাত্মভূমিতে বলাই হচ্ছে যে 'মহৎ কৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা'–মানুষ নিজের ব্যষ্টিগত প্রচেষ্টায় কতটুকু করতে পারে? অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া;

সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালিনী মায়ার বিরুদ্ধে ব্যষ্টিগত প্রচেষ্টায় মানুষ কতটুকু কী করতে পারে? সুতরাং এক্ষেত্রে স্বীকার করাই হচ্ছে যে 'মহৎ কৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা'। মহৎ মানে মহান ব্যষ্টির কৃপা চাই অথবা চাই পরমপুরুষের একবিন্দু কৃপা–লেশমাত্র কৃপা, বেশী কৃপা নয় ও তাতেই হয়ে যাবে, হয়েছে, হচ্ছে, হৰে।

আর মানসভূমিতে? মানসিক ভূমিতে হয় কী–মানুষ যেমন কর্ম করে, কর্মের ফলভোগটা, প্রারব্ধের ফলভোগটা তেমন মানসিক ভূমিতেই মুখ্যতঃ হয়। ও সেই মানসিক ভূমিতেও সে মহৎ কৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা–সে যদি কৃপা পায় তাতেই হয়ে যায়। দুঃখ কষ্ট প্রারব্ধ অনুযায়ী আসৱেই। ক্লেশ ভোগ সে করবেই, কিন্তু সেই ক্লেশটা তখন আর ক্লেশ ৰলে মনে হবে না। অর্থাৎ সেই মানসিক ক্লেশটাও তার দূর হয়ে যাবে। কারণ কষ্ট যেখানে হচ্ছে কিন্তু কষ্টকে কষ্ট ৰলে মনে হচ্ছে না তাহলে সেটা আর কী কষ্ট হ'ল? সুতরাং মানসিক ভূমিতেও সে আনন্দেই থেকে যাৰে। কষ্টটা যদি কষ্টই না হয় তাহলে আর কী কষ্ট হয়? তেমন কষ্ট যদি হয় হোক না, কি আসে যায়। সে তো হ'ল। এখন এই স্থূল জাগতিক ভূমিতে ব্যাপারটা কী রকম হবে? জাগতিক ভূমিতে মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, এগুলোর প্রয়োজন রয়েছে। এখন পরমপুরুষ করছেন কী–না, এই জগতে মানুষের জন্যে সম্পদ ছিটিয়ে দিয়েছেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অজস্র সম্পদ। মানুষকে বুদ্ধিও দিয়েছেন যে এইভাবে সবাই মিলে বেঁচে থাক, খাও দাও, বেঁচে থাক। মানসিক শান্তির জন্যে সাধনা কর। আধ্যাত্মিক বিমুক্তির জন্যে সাধনা কর। মানুসিক দুঃখ ক্লেশ দূর হয়ে যাবে।

আমার কৃপা রয়েছে। আধ্যাত্মিক কষ্ট দূর হবে কারণ ৰলেই দেওয়া হয়েছে যে কৃপা তিনি করবেনই। সেইজন্যেই তিনি বলেছেন–'সম্ভবামি যুগে যুগে'। সুতরাং ভাবৰার কিছু নেই। এখন সমস্যাটা থেকেই যায় কেবল স্থূল জাগতিক ক্ষেত্রে। এখন জাগতিক ক্ষেত্রে এর আগেও শিবের সময়ই বল, কৃষ্ণের সময়ই ৰল, ৰাৱৰার মানুষকে ৰলে দেওয়া হয়েছে যে মিলেমিশে থাক, খাও–'দেবাভাগং যথাপূর্বে সংজানানা উপাসতে'। কিন্তু মানুষ তা করেনি। করেনি বলেই জাগতিক ক্ষেত্রে দুঃখ ভোগ করছে, করেছে, করে চলেছে। এখন এই জাগতিক ক্ষেত্রে দুঃখ ভোগটা দূর করতে গেলে এর পেছনে একটা Common sense–একটা সাধারণ বুদ্ধি কাজ করে থাকে যে জগতের যা কিছু সম্পদ এতো সবাইকার জন্যে। যাতে সবাই খেয়ে পরে থাকতে পারে, তার জন্যে। একটা মানুষ অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে, এটা তো উচিত নয়। সুতরাং মানুষ যাতে একটা বিধিসম্মতভাবে তার সমস্ত সম্পদ নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে ভাগ করে কাজে লাগাতে পারে তার একটা ব্যবস্থার দরকার ছিল যা এর আগে কোনো মহান পুরুষ করেননি অথবা হয়তো তারক ব্রহ্মও এর আগে করেননি। এই না করার জন্যে যে সমাজ জীবনে অনুপপত্তি থেকে গিয়েছিল, সেই অনুপপত্তির জন্যেই মানুষের যত দুঃখ

সূচীপত্র

কষ্টভোগ চলছি। এটাও তো ৰন্ধ করতে হবে। এটাই বা কেন চলবে? মানুষ যখন বুদ্ধিপ্রধান জীব তখন তার মধ্যে এই ধরণের একটা বড় ত্রুটি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী কেন চলতে থাকৰে? এ তো চলা উচিত নয়। অথচ মজা হচ্ছে–জাগতিক ক্ষেত্রে এই যে একটা অনুপপত্তি ও তার ফলে এই যে সৃষ্ট ভিন্নতাৰোধ (Disparity) এগুলোই যত অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই অনর্থের ফলেই মানসিক ভূমির শান্তিও ৰাৰবার বিঘ্নিত হয়ে যাচ্ছে। যাতে এটা না হয়–যাতে মানুষ তার মহত্তর লক্ষ্যকে চোখের সামনে রেখে জাগতিক দুঃখ–ক্লেশগুলোকেও দূর করৰার চেষ্টা করে সেইজন্যেই প্রাউট দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। Prout দর্শনকে সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। তা যদি না করা হতো আরো হয়তো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের দুঃখ–কষ্ট–ক্লেশ চলতেই থাকত। ও সুবিধাবাদী নীচাশয় ব্যষ্টিরা সহজ সরল মানুষের ৰৌদ্ধিক সরলতার অথবা ৰৌদ্ধিক অভাবের সুযোগ নিয়ে তাদের শোষণ করতো। এই শোষণটা বিশেষ করে চলে আসছিলো তিন রূপে। একটা নিপীড়ন (oppression), একটা দমন (suppression), আর একটা শোষণ (exploitation)। আমি repression–টা বললাম না কারণ তা exploitation–এর সঙ্গে

সূচীপত্র

অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এখন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে এই নিপীড়ন, এই দমন ও শোষণ থেকে বাঁচাতেই হৰে–যেন তেন প্রকারেণ। তাহলে হৰে কী? এই স্থূল জগতে মানুষের দুঃ খটা দূর হবে। তখন মানসিক জগতে যে সন্তুলন (adjustment) নেই তাকে কাটাতে হৰে। আধ্যাত্মিক জগতে তার কোনো অভাব থাকেনি, থাকবে না। এ ব্যাপারে মানুষ নিশ্চিন্ত। কেবল মানসিক জগতে তাকে শক্তি অর্জনের দ্বারা কী করতে হবে? না, নিজের প্রারব্ধগত কারণে যে ক্লেশটুকু ভোগ হচ্ছে, শক্তি অর্জন করে যাতে সে ক্লেশটাকেও ক্লেশ বলে মনে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ প্রাউটের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক স্তরে (physical sphere) আর আধ্যাত্মিক স্তরে (spiritual sphere) সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। আর মানসিক স্তরে কী হচ্ছে? –না, প্রারব্ধজনিত যে ক্লেশ ভোগটা মনের মধ্য দিয়ে এসে যাবার সেটা হৰে বটে কিন্তু সেটার সঙ্গে যুঝবার সামর্থ মানুষের এসে যাবে। এ কথাটা মনে রেখে তোমরা দ্রুত নূতন একটা মানব সমাজ গড়ে তোল। যারা ৰাধা দেবে দিক। তোমরা মনে রাখবে যে সমাজে যারা পথিকৃৎ (pioneer) হয়, যারা অগ্রদূত (vanguard) হয়– তারা সংখ্যায় বেশী থাকে না, কিন্তু তারাই জয়ী হয়। আর যারা এককালে বিরোধিতা করেছিল বা করছে বা করবে,

তারা পরবর্তীকালে ৰলৱে হ্যাঁ, ওই অগ্রবর্তী (vanguard)–রা যে জঙ্গল কেটে পথ তৈরী করে দিয়েছিল ওই পথ দিয়েই আজকে আমরা আরামে গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে চলেছি–অর্থাৎ পরে স্বীকৃতি দেৰে। সেই সময়টায় দেয় না। এই হচ্ছে নিয়ম। তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও তোমরা জেনে রাখৰে এই সহজ সত্যটাকে যে, জঙ্গলেতে বাঘ সিংহ কমই থাকে। শিয়ালই বেশী থাকে। জঙ্গলেতে বাঘ সিংহের রাজত্বই চলে, শিয়ালের নয়। কিন্তু শিয়াল তার স্বভাবগত ভাবে হুক্কা হুয়া ৰলৰেই। তাতে বাঘ সিংহ ঘাবড়াৰে না।

কলিকাতা ১২/১২/৭৮